ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি নং- ৯৭/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

465923

গবেষক

আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজি নং- ৯৭/২০০৯-২০১০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Library

465923

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী** কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

22.7.12

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

465923

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন"** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-৯৭/২০০৯-১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

465923

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্মটি (**ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন**) সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রুহুল আমিন। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম ও মরহুমা বাবা ও মা কে। তাঁরা আজ আমার মাঝে নেই। কিন্তু তাঁদের দোয়া আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। আমার সুখ সমৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও নেক দোয়ার বদৌলতে আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের পবিত্র রুহের শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি যেন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আলা মাকাম দান করেন।

আমি বিশেষভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় মেঝ ভাই জনাব বজলুল হক হারুন-মাননীয় সংসদ সদস্য, ঝালকাঠি-১; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ-সৌদি এরাবিয়া পার্লামেন্টারী ফ্রেন্ডশীপ গ্রুপ; মেম্বার, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকেন; মেম্বার, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অব রিলিজিয়াস এফ্যায়ার্স; গভর্ণর, বোর্ড অব গভর্ণরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; সেক্রেটারী জেনারেল, পার্লামেন্টস মেম্বারস ফোরাম অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ বাংলাদেশ-এর প্রতি। বাল্যকাল হতে অদ্যাবধি আমার জীবনে শিক্ষা, ব্যবসা ও সামাজিক কর্মকান্ডের সর্বস্তরে যতটুকু অর্জিত সাফল্য লাভ করেছি, তার পেছনে রয়েছে তাঁরই অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর জীবনের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার এই গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান, সুধিজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুস্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-৯৭/২০০৯-১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	=	আরবী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আব্দুল
ইং	=	ইংরেজী
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রীষ্টাব্দে
খ্রি.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃ. পূ	=	খৃষ্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন. পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বাং	=	বাংলা
মৃ	=	মৃত, মৃত্যু
মাও.	=	মাওলানা
রহ.	=	রাহমাতুলাহি আলায়হি
রেজি.	=	রেজিষ্টার্ড
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
স./সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম
হি.	=	হিজরী
A.H	=	হিজরী সন
A.D	=	খ্রীষ্টাব্দ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
P.	=	Page.
Opcit	=	Open Cito.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
Vol	=	Volume

Dhaka University Institutional Repository

এক

ভূমিকা

সম্পদ উপার্জন ও সুষম ব্যয়-বন্টনের উপর একটি জাতি বা দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন বিপুল পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জিভূত না হতে পারে তা মূলত রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। মানুষের আয় উপার্জন ও ব্যয়ে কি নীতি অবলম্বিত হবে তাও নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার উপর। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। এ দুই অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারাম প্রসঙ্গটি তেমন জোরালো নয় বিধায় উপার্জনে অসততা এবং ব্যয়ে অনৈতিকতার সুযোগ থেকে যায়। অন্যদিকে এই দুই অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। এতে সীমিত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত বিধায় সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা হচ্ছে আমানতি মালিকানা এবং সম্পদের মূল মালিকানা হচ্ছে আল্লাহর। তাই ব্যক্তিকে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল মালিকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে বিধায় সচেতন থাকতে হয়। ইসলামে সম্পদের অপব্যয় নিষিদ্ধ, পক্ষান্তরে মানবতার কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ের প্রতি রয়েছে বিপুল অনুপ্রেরণা। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। তাই এতে শাসন ও শোষণের অবকাশ থাকে না।

কুরআন মাজিদে সালাত আদায়ের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে একারণে যে, ইবাদতের সাথে অর্থ সম্পদ উপার্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুসারে সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করবে-এটাই ইসলামের দাবি। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর তার নিজের ও পরিবারের জন্য সম্পদ উপার্জনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা, আয় উপার্জন করা, ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, চাকুরী করা ইত্যাদি আল্লাহর নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। যেমন-আল্লাহ বলেন, "সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) সন্ধান করবে।" (৬২:১০) "সেই আল্লাহ, যিনি যমিনকে তোমাদের (জীবিকা উপার্জনের জন্য) অধীন অনুকূল ও বিনয়ী, নম্র, মসৃন করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর ক্ষেত্রসমূহে শ্রম সাধনা করে জীবিকা উপার্জন কর এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ কর।" (৬৭ : ১৫)

মানব জীবনে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই বলে ইসলাম যেন তেন প্রকারে সম্পদ উপার্জন করা সমর্থন করে না। সম্পদ যেমন আল্লাহর নিয়ামত তদ্রুপ আমানতও বটে। তাই সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈধ ও অবৈধতার ব্যাপারটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একদিকে যেমন দৃঢ় নিষ্ঠার সাথে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে, তেমনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, আয়ের সুষম বন্টনের কথাও বলে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার সম্পর্কে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকার পর সমাজে মানুষের আয় ও সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য থাকতে পারে না। সুতরাং ইসলাম বন্টনমূলক সুবিচারের পক্ষপাতি এতে সম্পদ ও আয়ের পুনঃবন্টন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী এ ব্যবস্থায় মানুষের জন্মগত মর্যাদার সাথে সংগতিশীল জীবন যাপনের নিশ্চয়তা রয়েছে। যা সমাজের প্রতিটি লোকের জন্য কাম্য ও সম্মানজনক। যে সমাজ এ মান অনুযায়ী জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনা, সে সমাজের কোন মূল্য নেই। কারণ মহানবী (স.) বলেছেন, "যে লোক তার নিকট প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে পেট পুরে খায়, সে প্রকৃত মুসলিম নয়।"

Dhaka University Institutional Repository

দুই

এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "বিত্তশালীদের নিকট যা পর্যাপ্ত রয়েছে, তা থেকে দরিদ্রদেরকে প্রদান করা বিত্তবানদের জন্য অপরিহার্য। কোন দরিদ্র যদি ক্ষুধার্থ, নগ্ন বা দূর্দশাগ্রস্ত হয় ধনী কর্তৃক বঞ্চনার কারণে .... তবে এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।" হযরত ওমর (রা.) বলেন, "জাতির সম্পদে সবার সমান অধিকার রয়েছে। তিনির যদি বেঁচে থাকেন তবে দেখে যেতে চান যে, সুদূর সানা পর্বতের রাখালও তার সম্পদ থেকে ভাগ পেয়েছে।"

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষেই আবর্তিত হয়েছে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে দারিদ্রদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দেয়া, যাতে যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তন না করে। যাকাত আদায়ের পরও ধনসম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কি খরচ করবে, বলে দাও যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় কর।"

ইসলামের মতে, সম্পদ শুধুমাত্র দু'টি কাজে ব্যবহৃত হবে। এর একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরদিকে শিল্প কিংবা ব্যবসায় ব্যয় করা। দারিদ্র বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কমবেশী ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহপাক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ আছে তারা তা হতে সমাজের কল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অস্বাচ্ছন্দ এবং অনটনের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করুক। অস্বাচ্ছন্দের পর আল্লাহ পুনঃ তাদেরকে সম্পদ দান করবেন।" (৬৫:৭)

আল-কুরআনে মওজুদদারদের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, "তারা অভিশপ্ত যারা ধন-সম্পদ মওজুদ করে আর গুনে গুনে রাখে..........।" ইসলাম মানুষকে সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। আর এভাবেই ইসলামের সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

মূলত: ইসলাম মানব জাতির কল্যাণের জন্য এমন এক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে যা মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। এতে রয়েছে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের অনিন্দ্য সুন্দর এক সুষ্ঠু নীতিমালা। ইসলামী নীতি দর্শনের আলোকে যদি সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় নিশ্চিত করা যায় তাহলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামই হবে সুখী-সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি গঠনে অগ্রপথিক। ফলে ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার টেকসই ভিত যেমন রচিত হবে তেমনি মানুষের মাঝে জবাবদিহিতার অনুভূতি ও দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হবে। তাই সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কিত ইসলামী ক্ষেত্র ও নীতিমালা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বাস্ত বায়ন প্রক্রিয়াকে সাবলীল ও সহজবোধ্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এর বিষয়বস্তুকে মোট সাতটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে: ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, ইসলামী সমাজ ও তার প্রকৃতি, ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি তাওহীদ, রিসালাতে বিশ্বাস ও নবুওয়াতের সমাপ্তি, তাকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ, পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস, ঈমান-আমল ও উপলব্ধির সমন্বয়, ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে ভারসাম্য, আখলাক বা চরিত্র, স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়েঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনায় অর্থনীতি কী?, ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি, ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ও ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়েঃ ইসলামে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ, মালিকানা ও এর গুরুত্ব আলোচনায় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তা হল- সম্পদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য, সম্পদের শ্রেণীবিভাগ, ইসলামে সম্পদের মালিকানা ও ইসলামে সম্পদের মালিকানার ধরণ ও প্রকৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়েঃ ইসলামে সম্পদ আহরণ ও উপার্জনের উপায় ও ক্ষেত্র নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব, সম্পাদ উপার্জনের হালাল উপায়, শ্রম বিনিয়োগ , ব্যবসা-বাণিজ্য, ধার কর্জ, দান দক্ষিণা, উত্তরাধিকার সূত্র, সম্পদ উপার্জনের অবৈধ উপায়, সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া ও ভেজাল মেশানো, অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন, হারাম বস্তুর ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবর দখল, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণ, মজুতদারী ও কালোবাজারী, চোরাচালান, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, চাঁদাবাজীর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ, ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, সিন্ডিকেট করে জিনিসের দাম বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়েঃ ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ও ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা, ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ- যাকাত, ওশর, মীরাস ও উত্তরাধিকার সম্পদ, অসিয়্যত, ওয়াকফ, সাদাকাতুল ফিতর, মোহর ও নাফাকাত, কাফফারাহ ও ফিদিয়া, উদহিয়া, আকীকাহ্ ও নযর, হিবা ও সাদাকাহ, জারায় ও মিনাহ প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়েঃ বাংলাদেশের সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র ও ইসলামী নীতিমালা,বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও বণ্টনে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে ওশর আদায় ও বণ্টনে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে কর্জে হাসানা, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানী ও সাদাকার আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে মীরাসী সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প সম্পদের আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে জুয়া প্রতিরোধে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে সুদ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান, বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামী বিধান তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়েঃ সার্বিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জীবিকার মর্মকথা, ইসলামী নীতিমালায় উপার্জন ও ব্যয়ের মর্মকথা, বাংলাদেশে উপার্জন ও ব্যয়ে দুর্নীতি ও ইসলামী বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশে হালাল উপার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি নামে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফুল হক ফারুকী
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-৯৭/২০০৯-১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র
ঘোষণাপত্র
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
শব্দ সংকেত
ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	**(১-৪৫)**
* সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি	২
* ইসলামী সমাজ ও তার প্রকৃতি	৪
* ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য	৯
* ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি তাওহীদ	৯
* রিসালাতে বিশ্বাস ও নবুওয়াতের সমাপ্তি	১২
* তাকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ	১৪
* পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস	১৫
* ঈমান, আমল ও উপলব্ধির সমন্বয়	১৮
* ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে ভারসাম্য	২০
* আখলাক বা চরিত্র	২২
* স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা	২২
* ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	**(৪৬-১১৩)**
* প্রাসঙ্গিক আলোচনা	৪৭
* অর্থনীতি কী?	৫১
* ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি	৫৩
* ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি	৫৬
* ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য	৬৪
* ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ	৮০
* ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব	১১১
তৃতীয় অধ্যায়	
ইসলামে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ, মালিকানা ও এর গুরুত্ব	**(১১৪-১৪৩)**
* সম্পদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	১১৫
* ইসলামে সম্পদের ধারণা	১১৭
* সম্পদের শ্রেণীবিভাগ	১১৮
* ইসলামে সম্পদের মালিকানা	১৩২
* ইসলামে সম্পদের মালিকানার ধরণ ও প্রকৃতি	১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে সম্পদ আহরণ ও উপার্জনের উপায় ও ক্ষেত্রসমূহ (১৪৪-২১০)

* সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব	১৪৫
* সম্পাদ উপার্জনের হালাল উপায়	১৪৭
* শ্রম বিনিয়োগ	১৪৭
* শ্রম লব্ধ পন্থা	১৬৮
* ব্যবসা-বাণিজ্য	১৭১
* ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি	১৭৬
* ক্রয়-বিক্রয়ের বাতিল পদ্ধতি ও ফকিহ্ মতবাদ	১৮১
* যে সব কর্মকান্ড ব্যবসা-বাণিজ্য বাতিল করে দেয়	১৮২
* ধার কর্জ	১৮৩
* দান দক্ষিণা	১৮৬
* উত্তরাধিকার সূত্র	১৯০
* সম্পদ উপার্জনের অবৈধ উপায়	১৯১
* সুদ	১৯১
* ঘুষ	১৯৮
* জুয়া	১৯৯
* লটারি	২০১
* প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া ও ভেজাল মেশানো।	২০২
* হারাম বস্তুর ব্যবসা	২০২
* অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন	২০৩
* চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবর দখল	২০৪
* কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণ	২০৬
* মজুতদারী ও কালোবাজারী	২০৬
* চোরাচালান	২০৭
* সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ	২০৭
* চাঁদাবাজীর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ	২০৮
* লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন	২০৯
* ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন	২১০
* মাদকদ্রব্যের ব্যবসা	২১০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ও ক্ষেত্রসমূহ (২১১-২৬০)

* ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ২১২
* ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ ২১৫
* যাকাত ২১৫
* ওশর ২২৪
* মীরাস ও উত্তরাধিকার সম্পদ ২৩৪
* অসিয়্যত ২৩৮
* ওয়াকফ ২৪৪
* সাদাকাতুল ফিতর ২৫৪
* মোহর ও নাফাকাত ২৫৫
* কাফফারাহ ও ফিদিয়া ২৫৮
* উদহিয়া, আকীকাহ্ ও নযর ২৫৮
* হিবা ও সাদাকাহ ২৫৯
* জারার ও মিনাহ ২৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন (২৬১-৩১৫)

* বাংলাদেশে সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র ও ইসলামী নীতিমালা ২৬২
* বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও বন্টনে ইসলামী বিধান ২৬৩
* বাংলাদেশে ওশর আদায় ও বণ্টনে ইসলামী বিধান ২৭৪
* বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান ২৭৬
* বাংলাদেশে কর্জে হাসানা, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানী ও সাদাকার আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান ২৮৪
* বাংলাদেশে মীরাসী সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান ২৮৭
* বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামী বিধান ২৮৮
* বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প সম্পদের আয় ও ব্যয়ে ইসলামী বিধান ২৯২
* বাংলাদেশে জুয়া প্রতিরোধে ইসলামী বিধান ২৯৬
* বাংলাদেশে সুদ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান ২৯৯
* বাংলাদেশে ঘুষ ও ইসলামী বিধান ৩০৬
* বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামী বিধান ৩১১

সপ্তম অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন (৩১৬-৩৩৬)

* ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জীবিকার মর্মবাণী ৩১৭
* ইসলামী নীতিমালায় উপার্জন ও ব্যয়ের মর্মকথা ৩২২
* বাংলাদেশে উপার্জন ও ব্যয়ে দুর্নীতি ও ইসলামী বিধি-বিধান ৩২৬
* বাংলাদেশে হালাল উপার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা ৩৩৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৭-৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

* সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি
* ইসলামী সমাজ ও তার প্রকৃতি
* ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য
* ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি তাওহীদ
* রিসালাতে বিশ্বাস ও নবুওয়াতের সমাপ্তি
* তাকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ
* পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস
* ঈমান, আমল ও উপলব্ধির সমন্বয়
* ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে ভারসাম্য
* আখলাক বা চরিত্র
* স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা
* ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি:

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সর্বদাই দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করছে। কারণ দলবদ্ধ জীবন যাপন ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকে। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা মানুষের একটা স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষের সংস্পর্শে মানুষ না থাকলে ও দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন না করলে সে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ মানুষ সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বেড়ে উঠে। জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন যাপনে প্রয়াসী হয়। এ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভিতর দিয়েই মানব সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এ সমাজ প্রত্যয়টি হলো সাধারণ স্বার্থপ্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে। বুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বুঝায়, তা হল একত্রে গমন, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। আবির্ভাবের সেই আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ হল যুথবদ্ধ। সমাজবদ্ধতার মূলভিত্তি হল এই যুথবদ্ধতা বা দলবদ্ধতা। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন রকম কাজ-কর্মের স্বার্থে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকে। পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক হল অধিকতর জটিল প্রকৃতির, সাদৃশ্য বা সমতার (Likeness) ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার (Difference) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশ বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। এইভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিচিত্র ও জটিল সামাজিক সম্পর্ককেই সাধারণভাবে বলা হয় সমাজ।

'সমাজ' প্রত্যয়টির ধারণা খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে Dictionary of sociology-তে বলা হয়েছে, "সমাজ হল নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবারত এমন এক জনগোষ্ঠী, যাদের একটি ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাধারণ জীবনধারা, সংস্কৃতি ও ঐক্যের অনুভূতি রয়েছে এবং যারা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর মত সামাজিক আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত পরস্পর সম্পর্কিত ভূমিকা এবং ভূমিকা সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণের সমন্বয়ে সমাজের একটি কাঠামো থাকে। বিশেষ ধরনের মানবগোষ্ঠী বিধায়, মৌল চাহিদা পূরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা হল সমাজ। সমাজ স্বনির্ভর, তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণ স্বনির্ভরতার অর্থে নয়; বরং সমাজের স্থায়িত্বের বা টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাংগঠনিক গঠন কাঠামোর দিক হতে সমাজ স্বনির্ভর। এছাড়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থাকার মতো বিভিন্ন উপায় সমাজে বিদ্যমান থাকে। সমাজ এর সদস্যদের জৈবিক প্রজননের জন্য গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়।"[১]

---

১. "Society is a group of people with a common and at least somewhat distinct culture, who occupy a particular territorial area, have feeling of unity and regard themselves as a distinguishable extity. Like all groups, a society has structure of interrelated roles with proper role behaviour prescribed by social norms. However a society is a special type of group with a comperhensive social system that includes all of the basic social institutions required to meet basic human needs. It is independent, not in the sense that it is necessarity complety economically self-sufficient, but in that it includes all of the organizational forms necesary for its own survival. In addition, a socienty has the means to survive for a long period of time, and recruits its members at least in party by biological reproduction within the group itself." (William P. Scott. Dictionary of Sociology)

Dhaka University Institutional Repository

পিয়ারসন (Pearson) এর ভাষায়, "Society may be defined as the total complex of human relationships in so far as they grow out of action, it terms of means and relationship, intrinsic or symbolic."[২]

অধ্যাপক জিনসবার্গ (Morris Ginsberg) এর মতে, "The term society may be used to include all or any dealings of man with man, whether these be direct or indirect, organised or unorganised, conscious or unconsious, co-operative or antagonistic. Society is universal and pervasive and has no definite boundary or assignable limits. A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behaviour which mark them off from others who do not enter into those relations or who differe from them in behaviour.[৩]

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেগ বলেছেন, "সমাজ হল মানুষের আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব বা পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ ও বিভাগ, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা-এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত সদা পরিবর্তনশীল একটি জটিল ব্যবস্থা। সমাজ হল সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের একটি প্রবহমান ধারা।"[৪]

সমাজ বিজ্ঞানী ল্যাপিয়ার (Lapiere) এর মতে, "সমাজ বলতে একদল লোকের সমষ্টিকে নির্দেশ করে না, বরং মানুষের পারস্পরিক মিথক্রিয়ার আদর্শের জটিল ধরণকে বোঝায়; যা মানুষের নিজেদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে ঘটে থাকে।"[৫]

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (F.H. Giddings) এর মতে, "সমাজ হল সম-মনোভাবাপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সম্পর্কে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে।"[৬]

সুতরাং সমাজ হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং যে ক্ষমতা অবশ্যই কতগুলো রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। মানবগোষ্ঠী যখন একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কতগুলো আদর্শ অনুসরণ করে তখন তাকে সমাজ বলে।

সমাজ মানব জীবনের আদি ও প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানেও মানুষ নিজেদের পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। তবে একাধিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমান সমাজে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় যাতে সুষ্ঠু নীতি ও সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য সমাজ কতকগুলো উদ্দেশ্য সাধন করে। যেমন:

১. মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা;

---

২. Pearson, Family-Socialization and Interaction Process, London, 1965, P. 5
৩. Morris Ginsberg: Sociology, London: Oxford University Press, 1987, P. 7
৪. R.M. MacIver and C.H.Page: Society, 1967, P. 5
৫. F.H. Giddings: Principles of Sociology, 3rd end. P. 5
৬. P. Gisbert: Fundamentals of Sociology, P. 8

Dhaka University Institutional Repository

২. বিপদাপদে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৩. বৈধ ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের আয়োজন করা;

৪. স্নেহ-মায়া-মমতা ও প্রেম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া;

৫. সমাজবদ্ধ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা;

৬. সমাজকে বঞ্চিত ও নির্ধারিত গতিধারায় প্রভাবিত করা যাতে সকল সদস্যের কল্যাণ নিশ্চিত হয়;

৭. উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করে জীবনকে আরামপ্রদ করে তোলা;

৮. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম অধিকার নিশ্চিত করা;

৯. দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো;

১০. বিবাহ, পরিবার, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, শিক্ষা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা;

১১. মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

১২. সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে বন্ধুত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান করা।[৭]

ইসলামী সমাজ ও তার প্রকৃতি:

ইসলামের পরিভাষায় সমাজকে 'উম্মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৮] তাই ইসলামী সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকবৃন্দ আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ঈমান এবং পরজগতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে।[৯] এখানে বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অভাব-অভিযোগ ও অপসংস্কৃতি থাকবে না। মানুষ পরস্পরকে ভালবাসবে, একে অপরের বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে।[১০] সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। সমাজে উপর্যুক্ত নেতিবাচক সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো সর্বোচ্চ স্তরে পরিলক্ষিত হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবী সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১১]

---

৭. মিয়া মোহাম্মদ সেলিম, বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, নবেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২০–২১

৮. আল-কুরআন, ৩৩:৩০

৯. আল-কুরআন, ৪:৩৬

১০. আল-কুরআন, ২:১৭৭

১১. তফাজ্জল হুসাইন, হযরত মুহাম্মদ (স.), সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৫১–৭৪

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ সমাজ গঠন মূলত আল-কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সর্বক্ষেত্রে "মধ্যমপন্থা" অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।[১২] মানুষের সাধারণ রুচি ও স্বভাব প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলাম আদর্শ সমাজ গঠনে এক সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা সর্বকালের সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে উপযোগী। তাই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা স্বয়ং এমন একটি উন্নত ও যুক্তিসম্মত সমাজ, যেখানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উত্তম দিকগুলোর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ ও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করার জন্য ইসলাম এক সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে কোন অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ সমাজে সংঘটিত হতে পারে না।

মুসলমানদের সামাজিক জীবন আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তিকে নিশ্চিত করা। শ্রেণী সংগ্রাম, বর্ণাশ্রম এবং সমাজের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থী। কুরআন বা হাদীসের কোথাও শ্রেণী, বংশ বা সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের কোন উল্লেখ কেউ খুঁজে পাবে না, বরং এর বিপরীত কুরআনের বহু আয়াত ও মহানবীর (স.) বহু বাণী মানবজাতিকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে বিষয়গুলো একই সঙ্গে ইসলামের সামাজিক কাঠামোর মূলনীতিরূপে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হলো এই যে, মানব জাতি এক ও অভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভূত এবং একই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ একটি পরিবার সদৃশ।[১৩]

মানব জাতির ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে আদম ও হাওয়ার অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের আলোকে। প্রতিটি মানব সন্তানই প্রথম পিতা ও প্রথম মাতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বপরিবারের একজন সদস্য। অতএব অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে তার তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন তার উপর অভিন্ন দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। লোকেরা যখন উপলব্ধি করে যে, তারা সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্টি আদম ও হাওয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তখন আর বর্ণবিদ্বেষ, সামাজিক অবিচার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের কোন অবকাশ থাকবে না। অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের দরুণ লোকেরা যেমন প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ তেমনি সামাজিক আচরণে তারা হবে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও হাদীসে প্রকৃতি ও উৎসের দিক থেকে মানবীয় ঐক্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল বর্ণগত অহমিকা ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নির্মূল করা এবং যথাযথ ভ্রাতৃত্বের পথকে সুগম করে তোলা।[১৪]

---

১২. আল-কুরআন, ৪৯:১০–১৩
১৩. আল-কুরআন, ২:২২৩
১৪. আল-কুরআন, ৪৯:১৯

Dhaka University Institutional Repository

মানবীয় ঐক্যের ধারণা শুধু এর উৎসের নয়, বরং এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের মধ্যেও নিহিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আল্লাহর সান্নিধ্য। আমরা সবাই তাঁর কাছ থেকেই এসেছি, তাঁর জন্যই বেঁচে আছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।[১৫] কুরআনের বর্ণনানুসারে মানব সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্যই হল আল্লাহর বন্দেগী করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা।[১৬] দুনিয়ার সত্য ও সুবিচার, ভালবাসা ও অনুকম্পা, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠাও এ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সামাজিক জীবনের পটভূমি হিসেবে উৎস ও লক্ষ্যের এই একত্ব ও অভিন্নতার উপর ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা হল সমাজের পরিপূরক। এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। ব্যক্তি তার সমাজের অভিন্ন কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব শুধু সমাজের প্রতিই নয়, আল্লাহর প্রতিও। অন্যদিকে ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট সমাজও দায়ী তুল্যভাবে। ব্যক্তি যখন সক্ষম থাকে, তখন সে হয় দানকারী এবং সমাজ হয় দানগ্রাহী। পক্ষান্তরে সে যখন অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন সে হয় নিরাপত্তা ও যত্নশীলতা লাভের অধিকারী। এক্ষেত্রে ব্যক্তি হয় দানগ্রাহী এবং সমাজ হয় দানকারী। সুতরাং এখানে কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটে সমতালে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পাস্পরিক। এখানে কোন রাষ্ট্র ব্যক্তিকে উৎপীড়ন এবং তার স্বাধীন সত্তাকে হরণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিই সমাজকে শোষণ এবং রাষ্ট্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার অধিকারী নয়। এখানে পরস্পরের সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে পুরোপুরি সমতা। সর্বোপরি এখানে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি গঠনমূলক মিথষ্ক্রিয়া।

উৎস ও লক্ষ্যের প্রশ্নে এই মানবীয় ঐক্য এবং এই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি মঙ্গল ও পুণ্যের কাজে সহযোগিতা ইসলামের সামাজিক জীবনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে।

ব্যক্তির সত্তা এবং মন-প্রাণ ও সম্মানের প্রশ্নে তার পবিত্র অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি একে বিশেষত্ব দান করে। সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনেও এর বিশেষত্ব পরিষ্ফুট হয়ে উঠে। কোন ইসলামী সমাজে ব্যক্তি কখনো উদাসীন হতে পারে না। তার আয়ত্বাধীন সকল আইনসঙ্গত উপায়ে যে কোন প্রকারের সুকৃতির দিকে আহবান ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধের সাহায্যে সুস্থ সামাজিক নীতিবোধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালনে তাকে আদেশ করা হয়েছে।

এরূপ কাজের মাধ্যমে সে কেবল নিজেই দুষ্কৃতির উচ্ছেদ ও সুকৃতির প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে না, বরং অন্যকে অনুরূপ কাজে সাহায্যও করে।

---

১৫. আল-কুরআন, ২:১৫৭

১৬. আল-কুরআন, ৫৯:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সামাজিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত নিখুঁত, মহৎ ও ব্যাপক। এই কাঠামোর উল্লেখযোগ্য মৌল উপাদানগুলো হলঃ সহযোগী লোকের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, আর্তের প্রতি সান্তনা ও সমবেদনা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা, ব্যথিতের ব্যথা উপশম, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সংহতির অনুভূমি, জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের প্রশ্নে অন্যান্য লোকের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তির ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব। মহানবী (স.) হাদীসে এ ধরনের বর্ণনা প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ

"যে কেউ এই দুনিয়ার কোন মানুষের কষ্ট লাঘব করে মহাবিচারের দিন আল্লাহ তার একটি কষ্ট লাঘব করে দেবেন।"

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের প্রকৃতি খাঁটি বিশ্বাসী হবে না, যতক্ষণ না সে সহযোগী লোকের জন্যে তা-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে।"

"যে কেউ অন্যকে সৎকর্মের আহবান জানায়, সে নিজেই সৎ কর্মশীলদের মত এবং তাকে পুরস্কৃত করা হবে সে অনুসারে আর যে কেউ অন্যকে দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে, সে ঠিক দুষ্টকর্মকারীর মত এবং তাকে শাস্তি দেয়া হবে সে অনুসারেই।"[১৭]

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে এ ধরনের অনেক বাণী লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় করার মত কত এবং ইসলামের অবস্থায় থাকা ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা সবাই মিলিতভাবে আল্লাহর রুজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কর। কেননা, তোমরা প্রথমে পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়কে ভালবাসার দ্বারা যুক্ত করে দিয়েছেন। এভাবে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছ। তোমরা এক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের তীরে দাঁড়িয়েছিলে, তারপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শনকেই সুস্পষ্ট করে তোলেন, যাতে করে তোমরা পথ নির্দেশ পেতে পার। তোমাদের মধ্যে একদল লোক থাকা উচিত, যারা সবাইকে মঙ্গলের দিকে আহবান জানাবে, সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং দুষ্কর্মের থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত তারাই হল কল্যাণ লাভকারী।"[১৮]

"হে ঈমানদার লোকেরা, অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা পরস্পরকে সৎকর্ম ও পুণ্যশীলতায় সাহায্য কর। কিন্তু পাপাচার ও ঘৃণা-বিদ্বেষে সাহায্য থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহ শাস্তির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।"[১৯]

---

১৭. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদাব ও বাবুল বিররি ওয়াসিলা দ্রষ্টব্য।

১৮. আল-কুরআন, ৩

১৯. আল-কুরআন, ৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম আমলে অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ মানবতাকে সর্বোতভাবে পূর্ণ করার আদর্শ বাস্তবায়নের একটা উপায় স্বরূপ। উচ্চতর ও নিম্নতর এ দু'টি দিক রয়েছে মানব স্বভাবের। নিম্নতম প্রকৃতিকে উচ্চতর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করাই জীবনের লক্ষ্য।[২০] মানুষকে এ ধরনের রূপান্তর সংঘটনে সহায়তা করাই ইসলামের কাজ। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যে সব বিশ্বাস ও অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো ইসলামের আরকান ও স্তম্ব নামে পরিচিত। যেসব সূত্র চিন্তা ও কর্মের উৎস এবং যেগুলো মানুষকে সার্বিক পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে, এগুলো তাই। এ স্তম্ভ হলো, কালিমা, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ। এগুলো মানুষকে তার পরিবেশ, আদর্শ ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও শান্তির সম্বন্ধে সম্বন্ধ করার একটি উত্তম বাহন স্বরূপ। মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শৃংখলার উপর। এসব নিয়ম যদি যথার্থভাবে পালিত হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশৃংখলা এবং সামাজিক, জাতীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের এক উচ্চতর চেতনা। এভাবেই ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চায়। সেজন্যই ইসলাম এমন ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী, যা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যকার বিরাজমান সব অস্থিরতা, সংঘর্ষ ও সর্বনাশা যুদ্ধবিগ্রহের মূলে ছিল। যে ঔদ্ধত্ব জাতীয়বাদ অপর জাতিকে ধ্বংস করে তার নিজের লোকজনকে সাহায্য করতে চায়, তা ইসলামের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ নয়। ইসলাম বর্ণগত জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে, কারণ তা আরব ও পারসিক, মিশরীয় ও সিরীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। ইসলাম তার অনুসারীদের এসব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠার শিক্ষা দেয় এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়, যেখানে জাতিগত ও ভৌগোলিক বৈষম্য মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধের উচ্চতর আদর্শে মিশে যাবে।[২১]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বলতে পৃথক কোন গোত্র বা সম্প্রদায় নয়, বরং গোটা মানব জাতিই একটি সমাজ। এ সমাজের উৎপত্তি আদি পিতা আদম (আ.) হতে। আর এর বিস্তৃতি ও প্রসারতা বিশ্বব্যাপী। মানব ইতিহাসে প্রাথমিক যুগ হতে মানব সমাজের ক্রমবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং ক্রমশ তা প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়ার তারতম্য এবং আঞ্চলিক ও প্রাকৃতিক নানা প্রভাব থাকা সত্ত্বেও গোটা মানব সমাজের দৈহিক গঠন ও সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের যেমন প্রভেদ নেই, তেমনি তাদের জীবনের গতিধারা, মৌলিক চাহিদা এবং হৃদয়ের অনুভূতিতেও এক। অন্যদিকে মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কেও বিশ্বের সকল মানুষ একই মনোভাব পোষণ করে থাকে। মানুষ যেখানেই এবং যে অঞ্চল বা প্রত্যন্ত অঞ্চলেই বাস করুক না কেন; তাদের মৌলিক সমস্যাও সকলের একই। তাই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিই একটি সমাজ।[২২] এ মতের উপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপিত।

---

২০. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৩২
২১. ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২২. আল-কুরআন, ৩০:৩০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্যঃ

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) যে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমাজ গঠন করেছেন, তা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণেরই প্রচারিত ও প্রবর্তিত। নবী করীম (স.) কর্তৃক এটা ব্যাপকতা সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে শাশ্বত ও পূর্ণরূপ লাভ করেছে মাত্র। যেহেতু মহানবী (স.) শেষ নবী এবং সমগ্র বিশ্বের একক রাসূল, তাই ইসলামী সমাজ গঠনে তাঁর ভূমিকা, শিক্ষা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও গঠননীতি যেমন ব্যাপক ও সর্বস্তরের মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুবিস্তৃত, শক্তিশালী, সনাতন, অপরিবর্তনীয় ও অসংশোধনীয়। বরং সর্বকালের মানুষের জন্য তা সমানভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য।

সমাজ জীবনে যথার্থ উন্নতি লাভের জন্য দু'টি বিষয় প্রয়োজন যেমনঃ (ক) জীবন যাপনের উপকরণ এবং ব্যক্তি ও সমাজের বস্তুগত চাহিদা পূরণ। (খ) মানব জীবনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ন্যায়বিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ-বিধি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই বিশ্বের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্ উপরিউক্ত দু'টি বিষয় মানুষকে পূর্ণমাত্রায় দান করেছেন। বস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য প্রকৃতিতে সব ধরণের উপকরণসহ মানুষের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে এবং তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য তিনি মানুষের মধ্য থেকেই প্রেরণ করেছেন নবী-রাসূলগণকে। সঠিক পথে পরিচালনার জন্য দিয়েছেন জীবন বিধান। এই জীবন বিধানের নাম ইসলাম। সকল নবী-রাসূল এই ধর্মের প্রচার করে গেছেন।[২৩] সুতরাং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যেসকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলঃ

ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি তাওহীদঃ

ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদই বুনিয়াদী আকীদা। তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য হল আল্লাহ এক, তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত; তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও পালনকর্তা; জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁরই অধিকারে রয়েছে; তিনিই সকল প্রয়োজন পূরণকারী, তিনিই ইবাদত পাবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তারই নিকট চাইতে হবে। তার কোন শরীক নেই। তাওহীদ সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্বপ্রকারের শিরকের সম্পূর্ণ বিরোধী। তা সর্বপ্রকার শিরকের বাতিল ঘোষণা করে। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করার এবং মাথা উচু করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সাহস সৃষ্টি করে। তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিশৃঙ্খলা হতে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলা ও সংযমের গুণে বিভূষিত। তাওহীদে বিশ্বাস বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাকে মজবুত করে। তাওহীদে বিশ্বাসের কল্যাণে মানবাত্মা জীবনের সম্ভাবনাসমূহ সমন্ধে তাওয়াক্কুল ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। আল-কুরআনের মূলসূর হল আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের প্রচারকে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম তাওহীদের

---

২৩. আল-কুরআন, ৩:৮৪; ৩:১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বাণী শুনিয়েছেন। রাসূল (স.) তাঁর মক্কা জীবনের তেরটি বছরে বিশেষত তাওহীদের প্রচার করেছেন। আল-কুরআন আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সৃষ্টিকে ইবাদাতে শরীক করাকে শিরক বলেছে এবং শিরককে জঘন্য পাপাচাররূপে নির্দেশ করেছে। অনুরূপভাবে তা মুশরিক ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার জন্য জান্নাত হারাম এ ঘোষণা দিয়েছে।[২৪]

তাওহীদের আকীদা ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে, যা 'আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম গুণবাচক) নামে বর্ণিত হয়েছে। এসকল গুণবাচক নামের মধ্যে রাব্ব (প্রতিপালক), হায়াত (প্রাণ), ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), ইরাদা (ইচ্ছা), সাম (শ্রাবণ), বাসার (দর্শন), বাচন (কালাম) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রেম আল্লাহর একটি বিশিষ্ট গুণ। কুরআনে তাই আল্লাহকে বলা হয়েছে প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) বলে। এসব গুণ অনাদি, অনন্তকাল ধরে আল্লাহর অন্তঃসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি আদি স্রষ্টা, বিশ্বজগতের চালক ও নিয়ন্তা। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মধ্যে কাজ করেন। তিনি একাধারে জগতের অন্তর্গত ও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ তিনি জগতে যেমন উপস্থিত তেমনি উপস্থিত জগতের বাইরেও।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে যে উচ্চ ও মহান ধারণা কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, তার তুলনা অন্য কোন ভাষায় নেই। অত্যন্ত কাব্যময় ও চিত্ত আলোড়নকারী অনুচ্ছেদগুলির বিরাম-বিচ্ছেদহীন মূলসূর হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, তার বিমূর্ততা, মহিমা ও ক্ষমাশীলতা। জীবন, জ্যোতি আর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহে যার শেষ নেই। কিন্তু আগাগোড়া কোথাও অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। আবেদন রাখা হয় শুধু মানুষের অন্তরের বিবেকের কাছে,তার সহজাত যুক্তির কাছে।[২৫]

"বল! তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ, কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি জন্ম দান বা জন্মগ্রহণ করেন না, আর কিছুই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।"[২৬]

"তিনিই আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন যাতে করে জাহাজসমূহ তাঁর আদেশের মধ্য দিয়ে চলতে পারে; যাতে করে তোমরা তার কৃপা ভিক্ষা করতে পার এবং তোমরা হতে পার কৃতজ্ঞতাভাজন। আর তিনি তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সমগ্র বস্তুকে। দেখ, এর মধ্যে রয়েছে যথার্থ নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"[২৭]

"এক ইলাহ; তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; তিনিই পরম দয়ালু ও দাতা। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে আর দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে, আর সাগরের বুকে

২৪. আল-কুরআন, ৩১:১৩; ৬:৬৮; ৫:৭২
২৫. Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, Delhi, 1949
২৬. আল-কুরআন, ১১২:১–৫
২৭. আল-কুরআন, ৪৫: ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

চলমান মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্যবাহী জাহাজের মধ্যে; আর আসমান থেকে আল্লাহর প্রেরিত বৃষ্টির পানিতে যা মৃত মৃত্তিকা আর মৃত্তিকার বুকে বিচরণকারী সবরকম জীব জন্তুকে আবার সঞ্জীবিত করে তোলে; আর আসমান ও যমীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী বায়ু ও মেঘের সঞ্চালনে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। তবুও কতক মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ বলে অপরকে গ্রহণ করে আর আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে।"[২৮]

"আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই-চিরঞ্জীব। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনের সবকিছু তো তাঁরই জন্য। এমন কে আছে তার কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? তিনি জানেন যা আগে ঘটে গিয়েছে আর যা ঘটবে পরে; কিন্তু তিনি না চাইলে তাঁর জ্ঞানের কণামাত্রও তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর কুরসী বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তিনি আনায়াসেই করে থাকেন।"[২৯]

"তিনিই তো দিবসের উপর রাত্রির পর্দা পরিয়ে দেন আর দ্রুত এই অনুক্রম চলতে থাকে। আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকা তাঁরই আদেশের বশবর্তী। জেনে রেখো, গোটা সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তাঁরই। সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ বড়ই বরকতময়।"[৩০]

"তিনিই তো তোমাদেরকে দেখান বিজলী তোমাদের ভীতি ও আশা সঞ্চারের জন্য আর তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেস্তাগণ উভয়ে তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন। তবুও ওরা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে।"[৩১]

"তিনিই সঠিকভাবে আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন; ওরা যা কিছু তাঁর সঙ্গে অংশীদার করে তিনি তা থেকে কত মহান! তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ক্ষুদ্র শুক্র কণা থেকে, আর দেখ। সে একজন প্রকাশ্য বিতন্ডা সৃষ্টিকারী। আর তোমাদের জন্য তিনি গবাদি পশুও সৃষ্টি করেছেন, ---- পশগুলিকে যখন সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন আর প্রভাতে চরাতে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। ----- তিনি রাত্রি আর দিন, সূর্য আর চন্দ্র তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আর তারকারাজীও তারই বিধানে ক্রিয়াশীল আছে।"[৩২]

"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তবে তা হিসেব করে শেষ করতে পারবে না; আল্লাহ বাস্তবিক ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা যা গোপন কর, তার সবই আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং এগুলোকে তো সৃষ্টি করা হয়, মৃত ও প্রাণহীন।"[৩৩]

---

২৮. আল-কুরআন, ২:১৬৩ – ৬৫
২৯. আল-কুরআন, ২:২২৫
৩০. আল-কুরআন, ৬:৫৪
৩১. আল-কুরআন রাদ, ১২–১৩
৩২. আল-কুরআন, ৪:৩–১১
৩৩. আল-কুরআন, ৪৫:২১

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ সব জিনিসের স্রষ্টা, সবকিছুর অভিভাবক। তিনিই আসমান ও যমীনের চাবির মালিক।"[৩৪]

"তোমার কণ্ঠস্বর উচু করার প্রয়োজন নেই, কারণ গোপন ফিসফিস আর তারচেয়েও বেশী গুপ্ত কথা তিনি জানেন। বল, আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার? বল, আল্লাহর' করুণা তিনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।"[৩৫]

"আল্লাহ তো শস্যকণা আর আঁটি ভেদ করে অঙ্কুরের পথ নির্গম করেন। তিনি জড় থেকে জীবন আবার জীবন থেকে জড়কে নির্গত করেন। ইনিই তো তোমাদের আল্লাহ। তারপরেও তোমরা পথহারা হয়ে কোথায় যাচ্ছ? অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো ফুঁটিয়ে তোলেন তিনিই; তিনি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের হিসাবের জন্য স্থাপন করেছেন; এ হচ্ছে মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানবান আল্লাহর অলঙ্গ নিয়তি।"[৩৬]

"তুমি কি দেখ না যে আকাশন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আল্লাহর অধীনেই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহর সমীপেই ফিরে যেতে হবে।"[৩৭]

বৃহত্তর জগত আর অধিকতর অগ্রগামী মানব সমাজের প্রতি এই ছিল ইসলামের দাওয়াতের ভাষা। বিশ্ব মানবের মহান প্রেমাকূল চিত্তের কাছে সত্য, বিশুদ্ধ আর পবিত্রের জন্য কঠোর সাধণা ও ব্যাকুলতার কাছে এ বাণী ছিল উচ্চ পর্যায়ের এক কোমল আবেদন। এ বাণী আবেদন করছে মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে, তাঁর অন্তর চেতনা ও তার নীতিবোধের কাছে; আর প্রমাণ করছে, প্রকাশ করে দেখাচ্ছে পৌত্তলিক বিশ্বাসের অস্বাভাবিকতা। ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সাদরে অঙ্গীভূত আল্লাহর ক্ষমতা, দয়া, একত্ব ও স্নেহ কোমলতা সম্পর্কিত এই উপদেশমালা ইসলামী সমাজের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কর্তব্য হিসেবে নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

রিসালাতে বিশ্বাস ও নবুওয়াতের সমাপ্তিঃ

রিসালাতে বিশ্বাস ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকীদা। আল্লাহর সত্তা অদৃশ্য। তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রচারের জন্য কোনও দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন (আল্লাহর) দীনের প্রচারের উক্ত মাধ্যম। তাঁর (আল্লাহর) প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণীর (অহী) সাহায্যে লোকদের চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে সঠিক ও নির্ভুল পথে আনয়ন করেন। একথা সত্য যে, ইসলামে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান

---

৩৪. আল-কুরআন, ৩৯: ৬৩ – ৬৪
৩৫. আল-কুরআন, ১২
৩৬. আল-কুরআন, ৯৫–৯৬
৩৭. আল-কুরআন, আন-নূর, ৪১–৪২

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মানবীয় বুদ্ধিকে জ্ঞান লাভের ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের একমাত্র উৎস বলে নির্দেশ করা হয়নি, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সুক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম উৎস হচ্ছে অহী, নবুওয়াত ও রিসালাত।[৩৮]

একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়াঙ্গম ও উপলব্ধি করতে পারে এবং পাপাচার, অন্যায়, ফ্যাসাদ ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনাচার সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল মানব জাতির হিদায়াত এবং তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথনির্দেশ। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন সমাজ হতে গোমরাহী ও সর্বপ্রকার অনাচার দূর করার জন্য, লোকদেরকে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে; পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিণতির সাথে সম্পর্কিত অহীর মারফত প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পদকে তাদের নিকট পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে যে সকল মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয় তৎসম্বন্ধে তাকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও বুনিয়াদী তথ্য আমাদের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ভান্ডারে নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলই লোকদিগকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।[৩৯] দীনের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণ নিজ হতে কিছুই বলেন না, বরং তাঁরা কেবল আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রচার করেন।[৪০] রিসালাতে বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষের অন্তরে আল্লাহর শিক্ষা ও হিকমাতের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

ইসলামে রিসালাত ছাড়াও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে ফিরিস্তাদের সম্পর্কে। জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল, আযরাঈল সহ অসংখ্য ফেরেস্তায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ বলেছেন, "তিনি (আল্লাহ) স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্দেশসহ ফিরিস্তাদেরকে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।[৪১]

নবুওয়াতের চূড়ান্ততায় বিশ্বাস ইসলামের অপর একটি মৌল উপাদান। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও অনুভূতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন বাইবেলে নতুন নবীর আগমনের পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু কুরআনে তা নেই। কুরআনে বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর তরফ হতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণ মুহাম্মদ (স.) এ সমাপ্তি হয়েছে।[৪২] মহানবী (স.) স্বয়ং বলেছেন, "যখনই কোন নবী পরলোক গমন করেছেন, তারপর অবতীর্ণ হয়েছেন অন্য একজন। কিন্তু আমার পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না।"[৪৩]

---

৩৮. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড), পৃ. ৩০০
৩৯. আল-কুরআন, ১৬:৩৬
৪০. আল-কুরআন, ৫৩: ৩–৪
৪১. আল-কুরআন, ১৬:২
৪২. আল-কুরআন, ৩৩:৪০
৪৩. বুখারী শরীফ (১ম খন্ড), পৃ. ৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এই নির্দেশ নিয়ে মতদ্বৈততার কোন অবকাশ নেই। একে যে-ই অন্যভাবে বা অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করবে, সে-ই পরিগণিত হতে অবিশ্বাসী বলে।[৪৪] মহান আল্লাহ যুগে যুগে পথহারা দিগভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন এ ধরাধামে। আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সুসংবাদ কিংবা সতর্ক করার জন্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাও ছিল অন্যান্য নবীর পালিত সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বেরই অংশ, যদিও এখানে এসে নবুওয়াত উপনীত হয়েছে তার শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-পয়গাম্বরের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে যে ধর্মীয় সত্য বা ভাবাদর্শ প্রেরণ করেছেন এবং যা নিয়ে ধর্মবিশ্বাস গঠিত, তাই পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা অর্জন করেছে শেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এ। আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এজন্য যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির সবচেয়ে মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।[৪৫]

মহানবী (স.) যে বাণী বহন ও প্রচার করেছিলেন, তা ছিল পৃথিবীতে নবী-পয়গাম্বরদের শিক্ষা। আর এ বাণীই সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনে, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।'[৪৬] শেষনবী (স.) এর অমীয় বাণী ও শিক্ষা অতীতের ন্যায় আজও সজীব এবং তা চিরভাস্কর হয়ে থাকবে মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস ও প্রাণশক্তি হিসেবে।

তাকদীর বা ঐশীনির্বন্ধঃ

ইসলাম এমন এক পরম বুদ্ধিমান সত্তার উপস্থিতি স্বীকার করে যিনি সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেন। সেই বুদ্ধিমান পরমসত্তাই আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই আদি সক্রিয় কারণ। তাই আল্লাহর ইচ্ছার কাছেই জগতের সব ব্যক্তি, বস্তু ঘটনাকে নির্দেশ করতে হবে। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রিত সত্তা হতে পারে না। কারণ, তাহলে জগতে যত মানুষ আছে, ঠিক ততটি আদি কারণ স্বীকার করতে হয় এবং তাতে করে আল্লাহর ক্রিয়াপরতাকে সীমিত ও বিঘ্নিত করা হবে। কিন্তু ইসলামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তা পরম ঐশীশক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীনতার সংযোগ ও সমন্বয় সাধনে সক্ষম। ইসলামের মতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই হল আল্লাহর নির্দেশ বা বিধান। আর প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এসব প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক কার্যকারণ অগ্রসর হয়ে থাকে। মানুষ প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তার কার্যকলাপ কতিপয় বাহ্য ও আন্তর নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও মানুষ তার সীমিত অস্তিত্বের আওতায় তার কর্ম ও আচরণের কর্তা। সে একটি নৈতিক সত্তা, আর সুনীতি ও দুর্নীতির পার্থক্য করা এবং স্বেচ্ছায় ভাল কিংবা মন্দ কর্মপন্থা নির্বাচন করা তার পক্ষে অসম্ভব

---

৪৪. S. Mahmudunnasir, Islam: Its concepts and History, New Delhi, 1981, P.52

৪৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩–৩৪

৪৬. আল-কুরআন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

নয়।[৪৭] মানুষ যে কর্মপন্থাকে শুভ ও সঙ্গত বলে নির্বাচন করে, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এর জন্য আল্লাহ্ নয়, সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ কাউকে এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে যা ভাল উপার্জন করে সেটা তারই এবং সে যা মন্দ উপার্জন করে সেটাও তারই।"[৪৮]

মানুষ তার কার্যাবলীর জন্য এবং তার শক্তির সদ্ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী। সে ইচ্ছা করলে যেমন পারে উত্থান করতে তেমনি পারে অধঃপতিত হতে। কুরআনের মতে, মানুষ সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সে একটি স্বাধীন দায়িত্বশীল কর্তব্য এবং নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা।[৪৯] প্রত্যেক মানুষ জন্মায় স্বাধীনতা ও নিস্পাপ হয়ে এবং একটি নৈতিক কাঠামো নিয়ে। কিন্তু জন্মের পর তাকে নানা রকম কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকশিত করতে হয়। মানুষের নিজস্ব আচরণই তাকে দোজখে কিংবা বেহেস্তে নিয়ে যাবে এবং তার কোন আচরণই তকদীর বা অদৃষ্টের ফল নয়, কিংবা সে বেহেস্ত বা দোযখে যাওয়ার কোন অনিবার্য ডিক্রী নিয়ে জন্মায় না। তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তারই কর্ম ও আচরণ দ্বারা। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, "যে সৎ পথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে। আর যে বিপথে চলে সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে তা করে। একের বোঝা অপরে বহন করবে না। সর্তককারী না পাঠিয়ে আমি (কোন জাতিকে) শাস্তি প্রদান করিনা।"[৫০]

"জেনে রেখো, যতদিন পর্যন্ত কোন জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থারও পরিবর্তন করে না।"[৫১]

সুতরাং দেখা যায় যে, জগত একটি আত্ম গঠনের স্থান। এখানে ভাল-মন্দ উভয় পথই রয়েছে। এ দু'য়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মানুষের। আর মানুষ তা নির্ধারণ করবে প্রজ্ঞার সাহায্যে। জীবন মানুষকে কাজ করার এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করে। একমাত্র কর্মই মানুষের উত্থান কিংবা পতনের জন্য দায়ী। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্তি কিংবা অধঃপতন মানুষের নিজেরই কর্মফল। তাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনকে ইসলাম দেখে এমন অসীম শক্তি হিসেবে, যা কোন রকম অনতিক্রম্য বাধাবিপত্তি স্বীকার করে না।

পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসঃ

ফিরিশতায়, ভাল-মন্দ বিষয়ক তকদীরে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দেয় এবং তাতে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে।

---

৪৭. S. Rahman, An Introduction to Islam Culture and Philosophy, Mullick Brother, Dhaka, P. 52
৪৮. আল-কুরআন, ২:২৮৬
৪৯. আল-কুরআন, ৪২: ১১১ ও ৩০
৫০. আল-কুরআন, ১৬:১৫
৫১. আল-কুরআন, ১৩:১৯

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্বারা মানব জীবন উদ্দেশ্যবিহীন একটি চলন্ত তরী আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বা অস্তি ত্ববাদীদের ধারণা বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না?"[৫২] ইসলামে মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত রয়েছে। যা আখিরাত বা পরকালের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা গড়ে উঠেছে একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। সে হচ্ছে পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে, আর ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ নির্ভর করবে স্রষ্টার আদেশ কতখানি কী প্রকারে পালন করেছে তা উপর। এতদসত্ত্বেও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম আর তা সৃষ্টি জীবের উপর তা সমভাবেই বর্ষিত হবে। এই কেন্দ্রীয় স্ত ম্ভের উপরই ইসলামের সমস্ত পারলৌকিক জীবনের ধারণাটি আবর্তিত হচ্ছে। আল-কুরআনের বহু আয়াতে কিয়ামাত বা শেষ দিবসের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহ সব মানুষের বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী পুরষ্কার কিংবা তিরষ্কৃত করবেন। তারও আগে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে আত্মাকে। মুনকার ও নকির এই দু'ফিরিস্তা হাজির হবেন কবরে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন তার ইহজাগতিক কৃতকর্ম সম্পর্কে। কেবলমাত্র নেক ব্যক্তিগণই পারবেন সঠিক উত্তর দিতে। বিশ্বাসীগণ নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করবেন শান্তি ও সুতৃপ্তিতে; আর অবিশ্বাসীগণ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তার পার্থিব জীবনের আমলনামা। পূণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ডান হাতে[৫৩] আর পাপাত্মাদের বাম হাতে[৫৪] এবং এর ভিত্তিতেই আল্লাহ সকলের বিচার করবেন।

পরকালে নেককার লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বদকার লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি। কুরআনে বেহেস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে পাহাড়, নদী, ছায়াময় বৃক্ষ ও প্রীতিদায়ক জলবায়ু পরিবৃত নয়নাভিরাম উদ্যান হিসেবে।[৫৫] আর দোযখকে (জাহান্নামকে) চিত্রিত করা হয়েছে একটি উত্তপ্ত বিভীষিকাময় স্থান বলে। নেককারগণ পাবে বেহেস্তের চির শান্তি, আর পাপাত্মাগণ ভোগ করবে দোযখের অসহ্য যন্ত্রণা। বেহেস্তের অধিবাসীগণ থাকবেন এক অত্যন্ত প্রীতিকর ও মনোরম পরিবেশে এবং তারা উপভোগ করবে সুখ। তাদের মুখে ভেসে উঠবে আনন্দের ছায়া এবং তাঁরা পরম তৃপ্তি লাভ করবেন। তাদের পরিশ্রম থেকে।[৫৬] তারা কোন অলস আলাপচারিতা শুনবে না। কোন মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করবে না।[৫৭] নিষ্ফল কোন কিছুতেই তারা জড়িত হবে না, বরং পেতে থাকবেন শুধু শান্তি আর শান্তি।[৫৮] তাদের স্বাগত জানানো হবে শান্তির বার্তা দিয়ে।[৫৯]

---

৫২. আল-কুরআন, ২৩:১১৫
৫৩. আল-কুরআন, ১৭:১৪
৫৪. আল-কুরআন, ৬৯ : ১৯-২৫
৫৫. আল-কুরআন, ১৩:৩৫
৫৬. আল-কুরআন, ৮৮ : ৯–১০
৫৭. আল-কুরআন, ৭৮:৩৬
৫৮. আল-কুরআন, ১৯:৬৩
৫৯. আল-কুরআন, ২৫:৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিস্তাগণ তাদেরকে স্বাগত জানাবে এই বলে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনারা এসেছেন এক আনন্দময় পরিবেশে সুতরাং প্রবেশ করুন এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করুন।"[৬০] তারা গরম বা ঠান্ডায় কোন ক্লান্তিকর অনুভূতি বোধ করবেন না।[৬১] আল্লাহ তাদের বিশুদ্ধ পানীয় প্রদান করবেন।[৬২] তারা বাগান ও ঝর্ণা পরিবৃত অবস্থায় বসবাস করবেন।[৬৩] কোন রকম দুশ্চিন্তা বা অবসাদ তাদের থাকবে না। তারা পরিপূর্ণ আরাম ও আনন্দের সুরভী উপভোগ করবেন।[৬৪]

"তারা অভিভূত থাকবেন পরম উল্লাস বা আনন্দঘন অনুভূতিতে।"[৬৫] "তাদের মুখমন্ডলে অভিব্যক্তি ঘটবে প্রশান্তির এবং তাদের পরিবেশন করা হবে কস্তুরীর মোড়কে আঁটা বিশুদ্ধ পানীয়।"[৬৬] তারা তখন অবস্থান করবেন এক পরম প্রশান্তি ও আনন্দের রাজ্যে এবং তখন তারা বলবেন, "সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের বসবাসের জন্য প্রদান করেছেন এ পরমানন্দের বাগান।"[৬৭]

অন্যদিকে দোজখের শাস্তি কেমন কঠোর হবে এ ব্যাপারে কুরআনে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পাপীগণ যখন যন্ত্রণা ভোগ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, শাস্তি বিধানে তিনি কঠোর।[৬৮] তাদের ফুটন্ত পানি পরিবেশন করা হবে। সেই পানিতে তারা চুমুক দিবে বটে কিন্তু সহজেই তা গিলতে পারবে না।[৬৯] "শুধু ফুটন্ত গরম পানি ছাড়া ঠান্ডা কোন কিছুই তারা পাবে না। তাদের দেয়া হবে এক ধরনের শুকনো তেতো ও কন্টকময় তৃণ জাতীয় খাদ্য।"[৭০] এখানে যেমন থাকবে না কোন পুষ্টি তেমনি তাতে ক্ষুধাও নিবৃত হবে না। পাপীদের এ সঙ্গ শৃঙ্খলিত অবস্থায় যখন বন্দী করে রাখা হবে, তখন তারা ছটফট করতে থাকবে অসহ্য যন্ত্রণায় এবং কামনা করতে থাকবে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছে আসবে না।[৭১]

ইসলামে বেহেস্তের সুখ-শান্তি ও দোযখের দুঃখ-কষ্টের যে ধারণা পেশ করা হয়েছে সে ধারণার সঙ্গে গুনাহ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর ধারণাও ইসলামের একটি অন্যতম দিক। এ বিষয়েও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এমন মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনও গুনাহ করে বসে এবং অতপর সে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। আর এটাই হচ্ছে তার রহমত ও মাগফিরাতের দাবী। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা তার জন্য সব সময় খোলা থাকে এবং আল্লাহ তাওবাকারীদিগকে ভালবাসেন।

---

৬০. আল-কুরআন, ৩৯:৭৪
৬১. আল-কুরআন, ৭৬:১৪
৬২. আল-কুরআন, ৭৬:২২
৬৩. আল-কুরআন, ১৫:৪৬
৬৪. আল-কুরআন, ৫৬:৯০
৬৫. আল-কুরআন, ৭৬:১২
৬৬. আল-কুরআন, ৮৩: ২৫–২৭
৬৭. আল-কুরআন, ৩৯:৭৫
৬৮. আল-কুরআন, ২:১৬৬
৬৯. আল-কুরআন, ১৪:১৭–১৮
৭০. আল-কুরআন, ৮৮:৭–৮
৭১. আল-কুরআন, ২৫:১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস, কর্ম এবং উপলব্ধির সমন্বয়:

প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী: বিশ্বাস, কর্ম এবং উপলব্ধি। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তদানুরূপ কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্কের উপলব্ধি করা।

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষায় ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে একমাত্র উপাস্য আল্লাহ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা অর্থাৎ বিশ্বাস করতে হবে যে, কর্ম, আরবী পরিভাষায় যাবে বলা হয়েছে 'আমল'। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জীবনে তার প্রকৃত প্রতিফলন কতটুকু ঘটছে এর নাম 'আমল'। যে কোন কাজ করতে হলে প্রয়োজন কতকগুলো নিয়ম-কানুন, যার আলোকে গড়ে উঠে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ। তাই আল্লাহ প্রেরিত ওহীসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) যে কাজগুলো করেছেন, তার আলোকে গড়ে উঠেছে মানুষের জন্যে জীবন বিধানের ভিত্তি এবং কাঠামো, যাকে বলা হয় 'শরীআ'। অন্যদিকে 'ঈমান' হচ্ছে এর মূল স্তম্ভ, যাকে কেন্দ্র করে পুরো কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। অন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে নামায (সালাত), রোযা (সওম), যাকাত এবং হজ্জ।

একজন মুসলিমকে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়তে হয়, সূর্য উঠার আগে (ফজর) দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে (জোহর), বিকেলে (আসর), সূর্যাস্তের পরপর (মাগরিব) এবং গোধুলির শেষ ও উষাকাল শুরুর মধ্যবর্তী সময় (ঈশা)। অর্থাৎ সে যে আল্লাহর অধীন একথা যেন ভুলে না যায়। বরং বারবার আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে নতুন করে শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে।

বছরে একটি পুরো চান্দ্রমাস অর্থাৎ রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলিম উষাকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থেকে রোযা রাখে। বাহ্যত এসময় খাওয়া, পান করা অথবা ধুমপান এবং যৌন সম্ভোগ করা নিষিদ্ধ। একই সাথে সে কু-কথা, কু-চিন্তা এবং কু-কর্ম থেকে বিরত থেকে আত্মিক শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হয়। অন্যকথায় এভাবে সে তার স্বরূপ চেনা এবং নিজের মধ্যে কিছু ঐশী গুণ বর্জন করতে প্রচেষ্টা চালায়।

যাকাতের পূর্বশর্ত হচ্ছে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, তার দখলে যত সম্পত্তি আছে সেসব কিছুর মালিক আল্লাহ। সুতরাং অভাবী সকল লোকের তাতে অংশ আছে। তাই ব্যক্তি অথবা সমাজের জন্য যখন প্রয়োজন হবে তখন স্বেচ্ছায় এবং সন্তোষের সাথে উক্ত সম্পদ থেকে দান করতে হবে। অবশ্য মানুষ কখনই অভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই মানুষের বার্ষিক আয় ও সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে যাকাতের হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

পার্থিব সকল কাজ থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে বিমুখ করে মুক্ত আত্মা হিসেবে এবং আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার মানসিকতা নিয়ে মক্কায় হজ্জ পালন করা হয়। হজ্জ সমগ্র মানবতা এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত চারটি বিষয় মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল প্রকার আচার-আচরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো অনুসরণের মাধ্যমে, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করে একজন মানুষ পরিণত হয় খাঁটি মুসলিম রূপে। তার জীবনবোধ হবে অনুরূপ চেতনায় অভিষিক্ত। কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সে ওয়াদাবদ্ধ। সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স.)-এর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে, ইসলামের দাওয়াতকে তার কথা ও কাজের মাধ্যমে বুলন্দ করার প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'জিহাদ'। জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে সর্বাত্মক এবং সংগ্রাম করা। ইসলামকে ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা চালানোর নামই হচ্ছে জিহাদ। কুরআন ও সুন্নাহ মতে জিহাদকে পূর্ব বর্ণিত মৌল বিশ্বাসসমূহের স্বাভাবিক অনুষঙ্গী হিসেবে ধরা হয়েছে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে, নিজের সময়, শক্তি এবং সম্পদকে সত্যের জন্য কুরবান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, এমনকি সত্যের খাতিরে প্রয়োজনবোধে জীবন বিলিয়ে দেয়া। তাই জিহাদ হচ্ছে, তার কাছে যা কিছু আছে, জীবনসহ সব কিছু আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকা।[৭২]

আল্লাহর সাথে মানবের সম্পর্ক উপলব্ধি করা, একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যাকে আরবীতে বলা হয় 'ইহসান'। ইহসানকে হযরত মুহাম্মদ (স.) নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, 'তুমি (এমনভাবে) আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তাঁকে দেখছ; যদিও তাঁকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)।'[৭৩] অর্থাৎ সব কাজ এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যেন আল্লাহকে আপনি দেখছেন। তা যদি সম্ভব না হয় তবে এটা অন্তত উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। প্রকৃত একাগ্রতার ভিত্তিই হচ্ছে অনুরূপ উপলব্ধি। এ ধরনের একাগ্রতার তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নিজের ইচ্ছার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া এবং সাধ্যানুযায়ী ঐশী ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ফলে আল্লাহর পছন্দ তার পছন্দের রূপ নেয়, আল্লাহ যেসব পাপ কাজ দুনিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করা পছন্দ করেন না, সেগুলোকে দুনিয়ায় শুধুমাত্র এড়িয়ে চলা নয় বরং দুনিযার বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। একজন মুসলিম আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলোর ব্যাপারে শুধুমাত্র ভক্তিতে গদগদ হয়ে বসে থাকতে পারে না, বরং এগুলোর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়। এভাবে মানুষ ঐশী ইচ্ছার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমশ আল্লাহর নিকটতর হতে থাকে। তার অন্তরে ঐশী ভাবের জাগৃতি ঘটে এবং তারই আলোকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) হচ্ছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আল্লাহকে নিয়মিতভাবে স্মরণ করা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.)- কে ভালবাসা ও আনুগত্য করা, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া এবং অসৎ

৭২. খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ৬
৭৩. মাওঃ মনজুর নোমানী, তাসাউফ কাকে বলে? ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৯, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

কাজে বাধা দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। যাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের সান্নিধ্য এবং সহযোগিতায় অন্য মানুষও আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য পেতে পারেন। তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে তাদের আত্মার জাগৃতি ঘটাতে পারেন। তবে সেটা কোন যান্ত্রিক তৎপরতার মাধ্যমে সম্ভব নয় বরং একাগ্রচিত্তে, শুধুমাত্র আল্লাহর খাতিরে হতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহ্ ভক্তি।[৭৪] আল্লাহ ভক্তি হলো সকল প্রকার সাধুতা ও সদাচারের উৎস এবং সকল প্রকার ন্যায় কাজের মূল। যে লোক ঈমান, আমল ও ইহসান অনুযায়ী রসূল (স.) প্রতিষ্ঠিত সংস্কার আন্দোলনের প্রতিভূ হিসেবে মানব জীবনকে পুনর্গঠিত করতে চায় এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালিত হতে চায়, সে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিবেদিত হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্যের কথা প্রতিনিয়ত অন্য সকল মানুষকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। যে সমাজ এই মূল্যবোধগুলোকে সমষ্টিগত জীবনে বাস্তবায়িত করবে সে সমাজ আদর্শ সমাজ। ইসলাম মানুষের প্রকৃত (ফালাহ্) কল্যাণের জন্য এমনি একটি সমাজই গড়তে চায়।

ইসলামের মতে মানুষ যখন বিশ্বাস, কর্ম এবং উপলব্ধি এই তিনটি বিষয়কে সমভাবে পরিপূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়, তখন মূলত সে প্রমাণ করে যে, সে দুনিয়ায় আল্লাহর একজন খলীফা। যদিও মানুষ সব কিছু আল্লাহর নিকট থেকেই পায়, তবুও আল্লাহর যাবতীয় গুণের বহিঃপ্রকাশ মানুষের মাধ্যমেই তাঁর খলীফা হিসেবে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। সুতরাং ইসলাম জ্ঞান কর্তৃক এবং ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা আরোপ করে নাই। তবে এর কিছু যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত তাই এক্ষেত্রে একটা মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এবং এ কারণে মানুষ কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন। তাই ইসলাম ভাষা, বর্ণ এবং নারী, পুরুষ ইত্যাদি ভেদাভেদের উর্ধ্বে সকলের স্বতন্ত্র মর্যাদার কথা শিক্ষা দেয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা সবাইকে এক কাতারে শামিল করে দেয়। ফলে মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাকে তাঁর অপর সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করার অধিকার পায়।[৭৫]

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্যঃ

ইসলামে আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ব্যক্তিবাদ ও সমষ্টিবাদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে এবং বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে। ইসলাম ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সেগুলোর ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামী শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সাধন এবং সমাজ অথবা

---

৭৪. ইসলামের আহবান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পরামর্শ দেয় না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, "এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু তাই তার জন্য সে চেষ্টা করেছে।"[৭৬]

"তোমার উপর যে বিপদই এসেছে তা তোমাদের নিজেদের উপার্জনেরই ফল এবং অনেক অপরাধ তো তিনি আপনা হতে এমনিই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।"[৭৭]

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।"[৭৮]

"প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তার উপরই পড়বে।"[৭৯]

অন্যদিকে ইসলাম মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সমাজ ও রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ করে, সমাজের ভাল কাজে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়। জামাআতে নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলার কথা বার বার বলে, যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: 'আর তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ছিল।'[৮০]

সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলাম ব্যক্তিকে সেখানে উপেক্ষা কর না, বরং দু'য়ের মধ্যে যথোপযুক্ত ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়।[৮১]

বিশ্বজনীন সমাজ:

এই সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা বংশ ও ভাষার সমস্ত বৈষম্য এবং ভৌগোলিক সীমারেখা চূর্ণ করে পৃথিবীর কোণে বিস্তৃত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে দুনিয়ার মানুষের এক বিশ্বজনীন সমাজ ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে। বংশীয় এবং আঞ্চলিকতার বুনিয়াদে স্থাপিত সমাজগুলোতে শুধু সে লোকেরাই শামিল হতে পারে, যারা নির্দিষ্ট একটি বংশে কিংবা নির্দিষ্ট কোন দেশে জন্ম লাভ করে। তার বাইরে লোকদের পক্ষে এ ধরনের সমাজের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের এই চিন্তা এই আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে এই চরিত্র নীতির সমর্থক প্রত্যেকটি মানুষই প্রবেশ লাভ করতে পারে। আর যারা সে বিশ্বাস ও চরিত্র নীতিকে সমর্থন করে না, ইসলামী সমাজ তাদের নিজের মধ্যে শামিল করে নিতে পারে না বটে কিন্তু তাদের সাথে মানবোচিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদেরকে মানবোচিত অধিকার দান করতে সদা প্রস্তুত থাকে।[৮২]

---

৭৬. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯
৭৭. আল-কুরআন, ৪২:৩০
৭৮. আল-কুরআন, ১৩:১১
৭৯. আল-কুরআন, ২:১৮৬
৮০. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৮১. H.R. Gibb, Whither Islam, London, 1939, P. 379
৮২. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

আখলাক বা চরিত্র:

ইসলামী সমাজ্যব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আখলাক বা চরিত্র। 'আখলাক' অর্থ চারিত্রিক গুণ, বৈশিষ্ট্য, শিষ্টাচার ও সদাচরণ ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পর্কে এই আচরণ ও চারিত্রিক গুণ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় আখলাক। আর সামাজিক ক্ষেত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটলে তাকে বলা হয় মুয়ামালাত। যার অর্থ পাস্পরিক কার্যাবলী বা আচরণ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক আচরণ ও কার্যাবলী অত্যাবশ্যকীয়। যেহেতু সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সমান। তাই পারস্পরিক জীবনে মুয়ামালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, কৃষিকার্য এবং গৃহকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্র মুয়ামালাতের আওতাভুক্ত। মুয়ামালাত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী-দরিদ্র ও ইতর-ভদ্র ভেদ নেই। ইসলামী সমাজের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই মুয়ামালাতের উদ্দেশ্য।[৮৩]

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা :

যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা উভয় ধারা বিরাজমান এবং তা থাকতে বাধ্য। বিভিন্ন মতবাদ ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এই সমীকরণের যে কোন একটির প্রতিবেশী জোর দিয়ে ভুল করছে। স্থায়িত্বের উপর অত্যধিক জোর দেয়ার ফলে পুরো ব্যবস্থাটাই হয়ে পড়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কেড়ে নেয় এর নমনীয়তা এবং প্রগতিশীলতার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে স্থায়ী মূল্যবোধ বা অপরির্তনীয় উপাদানসমূহের অভাবে গড়ে ওঠে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ, অব্যয়বহীনতা ও অরাজকতা। এই দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে 'স্থায়িত্ব' ও 'পরিবর্তনশীলতা' উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

মোটের উপর ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি হচ্ছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। রক্তাভিজাত্য ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ করে পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততা ও কর্তব্যপরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। এখানে উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ ও মানবিকতার প্রতি ইসলামের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামের সামাজিক প্রগতির প্রথম সোপান। মানবকল্যাণ তথা মানবতার সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কীয় মানবীয় চেতনাবোধ। এর মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক, আত্মিক এবং বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন তথা সর্বপ্রকার উন্নতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র প্রভৃতি কল্যাণকর নিয়মনীতি ইসলামের অমূল্য অবদান। ইসলামই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের শিক্ষা

---

৮৩. ঐ, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে। এতে বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্য নেই। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একজন মানুষ হতে সৃজিত হয়েছে। তাই মানব সমাজে কোন রকম ভেদাভেদ থাকতে পারে না। পারেনা বলেই ইসলাম সমাজের সর্বত্র সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের বাস্তবায়নের আদেশ দেয়। মানব সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে ইসলামের এই অনুপম নীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ ও শিক্ষা অতুলনীয়। এই অতুলনীয়তাই ইসলামী সমাজকে অনন্য বৈশিষ্টমন্ডিত করেছে।

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধঃ

সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত ধারণা। মূল্যবোধের মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বর্তমান থাকে। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক শৃংখলার অন্যতম উপায়। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social Process) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতম মানদণ্ড (higher order norms) হিসেবে সমাজের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদণ্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।[৮৪]

সমাজ জীবনে বিধি-বিধান পালন, অনুশাসন, জীবন ব্যবস্থা, আর্থ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদির পথ নির্দেশ দেয়াই ধর্মের একটি সামাজিক মূলনীতি। এক্ষেত্রে ধর্মই অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা পালন করে। জীবনকে সুন্দর করার জন্য নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবীয় সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় জীবন দর্শন বিশেষত ইসলাম এ লক্ষ্য অর্জনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। ইসলাম অর্থ আনুগত্য, মেনে নেয়া, গ্রহণ করা এবং সেই মত জীবন যাপন করা। ইসলাম চায় আমাদের রব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে শান্তি আনয়ন। ইসলাম নতুন কোন জীবন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীতে প্রথম যেদিন মানুষের আগমন ঘটেছে, সেদিন থেকেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের জীবন বিধান আল্লাহ্ মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন। ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত একমাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। এর অর্থ ইসলাম এমন এক চিরন্তন এবং মৌলিক বিধান, যা মানুষকে জীবনের চলার পথে প্রতিনিয়ত দিকনির্দেশ দিয়ে থাকে।[৮৫] তাই সামগ্রিক

৮৪. সম্পাদাস, সমাজকর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১৩৭
৮৫. মুহাম্মদ ফজলে ইলাহী (অনু.), সহজ ভাষায় ইসলামের মূলকথা, আঞ্জুমানে হিদায়াতুল উম্মত, ঢাকা: ১৯৯৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

জীবনদর্শন এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামের পরিধিভুক্ত। এজন্যই মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৮৬]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপ্রার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। তাই ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "That is combines of all the grandest and the most prominent feateres in all ethnic catholic religions, compatible with reason and the moral intution of man----- . It is not merely a system of positive moral rules based upon a true conception of certain principels, the enforcement of certain dispositions, the cultivation of a certain temper of mind which the consciene is to apply to the every varying exigencies of time and place."[৮৭]

ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়, যেখানে থাকবে শুধু সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা যা সমাজকর্মেরও লক্ষ্য। ইসলাম মানবকল্যাণে বিশ্বাসী বিধায় অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মানব সেবাকে এতে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবাকে শ্রেষ্ঠতর কাজ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি; বরং বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের ধারা প্রবাহিত করে।

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের কয়েকটি দিক

মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতিঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই'- এটাই হল মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচাইতে বড় সনদ। এই সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত কেউ মানুষের উপরে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ সার্বভৌম। অতএব আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে মানুষের সাহায্যে চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। পবিত্র কুরআনে এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে, অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জল পথে। আর তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্য এবং আমার সৃষ্টি অনেক কিছুর উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।"[৮৮] সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা

৮৬. আল-কুরআন, ৫:৩
৮৭. Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, New Delhi & Other: 1947, P. 178
৮৮. আল-কুরআন, ১৭:৭০

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, এরপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৮৯] মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় লাভ করে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দেখা যাবে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত। পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের সেবায় নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত নিয়োজিত রয়েছে। আল-কুরআনে মানব জাতিকে তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সেরাসৃষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।"[৯০]

বিশ্বলোকের বিশালতার তুলনায় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। বিশ্বলোকের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রকায়, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষই তার প্রাণ ও আত্মা এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক দিয়ে এক বিরাট, বিশাল, অসীম ও মহান সত্তা। মানুষ বলতে মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত সত্তাই বোঝায়। কেবল দেহটা কখনও মানুষ নয়। মানুষ এক মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মান যেমন আল্লাহ্র নিকট, তেমনি তা বিশ্বলোকের সবকিছুর উপর। আল্লাহ্ তা'আলা এক বিশেষ উন্নতমানের তাকে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে রূপ, আকার-আকৃতি, গঠন প্রকৃতিও দিয়েছেন সবকিছু থেকে ভিন্নতর; সব কিছুর তুলনায় উন্নত ও উত্তম। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর "রূহ" তার দেহ সত্তায় ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার একনিষ্ঠ অনুগত ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজদাও করিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে যেমন দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তেমনি দিয়েছেন জ্ঞান-বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা গবেষণার শক্তি। এই মানুষ হল সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকুলের গৌরবের অমূল্য অতুলনীয় একমাত্র ধন। এ দুনিয়ার সবকিছুই মানুষের অধীন, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ্ সবকিছুকে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুকূল ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন। আর দৃশ্য-অদৃশ্য যত নিয়ামত, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, সবই বিপুলভাবে তাকে দান করেছেন। সবকিছু তার জন্য অনুগত ও অনুকূল।[৯১]

উর্ধ্ব জগতে অর্থাৎ মহান আত্মার জগতে মানুষের যে স্থান তা এতই উঁচু ও মহান যে, আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের মস্তকও তাদের সামনে অবনমিত। মহান আল্লাহ্ তাঁরই যমীনে তাঁর খলীফা বা প্রতিভূ হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজেই খিলাফতের এ মহান উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।"[৯২]

---

৮৯. আল-কুরআন, ৯৫: ৪ – ৬
৯০. আল-কুরআন, ৩১:২০
৯১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৮২
৯২. আল-কুরআন, ২:৩০–৩৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ এ বস্তুজগতের সারনির্যাস। মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। এটাই হল মানুষের মর্যাদা। ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্যই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং তার জন্যই এত আয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদেরকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে যাতে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফলকল্পে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবাহর করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে।"[৯৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে, মানুষ অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী। তাই সে জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে। এজন্য তাকে অন্য কোন সৃষ্টির সামনে মাথা অবনত করতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে, আল্লাহ্ পরম আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্তা এবং সবকিছুর উৎস। নিছক প্রশংসা বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ লাভ মানুষের পক্ষে কাম্য নয়। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে এমনভাবে আসমানী গুণাবলী অর্জন করতে হয়, যেন সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কেননা মানুষই মহান আল্লাহ্র একমাত্র সৃষ্টজীব, যে তার আপন শক্তির বিকাশ সাধন করে সচেতনভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এই সক্ষমতার মধ্য দিয়েই দেশ ও কালে অবস্থিত অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয় বরং প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃষ্টি, আল্লাহ্র সৃজনী শক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নির্দশন। প্রকৃতির প্রতিটি পরমাণু মানুষের দেহে স্থান পেয়েছে। মানুষ জগতের ক্ষুদ্ররূপ, যেন একটি অণুজগৎ। সে যেসব শক্তি ও বৃত্তির অধিকারী, সেগুলোর মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে চারদিকের পরিবেশ তার বিকাশ ও অগ্রগতির পক্ষে বেশ প্রতিকূল। কিন্তু এই পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে এবং কল্যাণকর করে ঢেলে সাজাতে সে সক্ষম। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরোধিতা মানুষকে এমন এক সুযোগ এনে দেয়, যার সাহায্যে সে সৃষ্টি করতে পারে এক কল্পজগৎ এবং সেই সূত্রে পেতে পারে অপরিমেয় আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। সুতরাং একমাত্র এ জগতের ও নিজের পরিবেশের জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ পারে তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে বিকশিত করতে।[৯৪] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সব রকম অধিকার ও কার্যক্রম কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়নি; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের উপর তা আরোপ করা হয়েছে। ফলে সবচাইতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেন। এ ব্যক্তি মানস গঠনের লক্ষেই ইসলামে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সর্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে জ্ঞানার্জনের তাগিদই ছিল প্রথম আসমানী বাণী।

---

৯৩. আল-কুরআন, ২২:৬৫

৯৪. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্মানের আসনে বসায়। এ সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দেয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারঃ

ইসলামের অন্যতম একটি স্বীকৃত মূল্যবোধ হল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী বিধান মতে, প্রত্যেক মানুষ স্বীয় চেষ্টায় ভাল মন্দ করে থাকে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। স্বীয় অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যারা সৎ কাজ করে তারা নিজের জন্যই করে থাকে এবং যারা অসৎ কাজ করে, তারা তা নিজেদের জন্যই করে থাকে।"[৯৫] "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের সচেষ্ট হয়।"[৯৬] "যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে নিযুক্ত হয়, সে সম্পূর্ণভাবে তার নিজ দায়িত্বেই তা করে থাকে।"[৯৭] "যে সৎ পথে চলে; সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে এবং যে বিপথে গমন করে, সে বিপথে গমনের দায়িত্ব নিজেই বহন করে।"[৯৮]

সুতরাং বুঝা যায় যে, ইসলামে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম একটা মধ্যমপন্থার নীতি অবলম্বন করে। ইসলাম আল্লাহ্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে যেমন এক বাক্যে স্বীকার করে, তেমনই মানুষের মুক্তচিন্তা ও দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না। আল্লাহ্ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। তবে তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তাকে ভাল-মন্দ বিচার করে চলতে হয়। তার মুক্ত চিন্তার অধিকার রয়েছে বটে কিন্তু সেই অধিকার আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আইন ও কানুন দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহ্ তা'আলার আইন-কানুন মেনে জীবন-যাপন করলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়, অন্যথায় ধ্বংসের পথে যাওয়া অনিবার্য। মানুষকে তাঁর পছন্দ মত চলার পথ বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি পথ একটিতে দুঃখ-কষ্ট, অপরটিতে শাস্তি রয়েছে, একটি ন্যায়ের অপরটি অন্যায়ের; প্রথমটির ফল পুরস্কার, অপরটির ফল শাস্তি। মানুষ তার স্বাধীন চিন্তার দ্বারা উপযুক্ত পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু মানুষের ভালকে মন্দে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্রই আছে। প্রকৃত ইসলামী আদর্শ হল আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ মেনে চলা। আর সেটাই ইবাদাত।[৯৯]

---

৯৫. আল-কুরআন, ৪১:৪৬
৯৬. আল-কুরআন, ১৩:১১
৯৭. আল-কুরআন, ৪:১১১
৯৮. আল-কুরআন, ১০:১০৮
৯৯. মুহাম্মদ লুৎফর, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ৩০৮

মানুষের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। মানুষের জন্মকাল হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলে ভিতর বাইরের সংগ্রাম। একদিকে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার সাথে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এদিক থেকেও মানুষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। মানুষের গোটা পরিবেশ এক বিরোধ সংহতির ইতিহাস, এক বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস। কাজেই মানুষ যা চায় সব সময় তা পায়না, এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়। মানুষ তাই এক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন। এক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক।[১০০]

ইসলাম যেমন সাধনার ধর্ম তেমন কর্মেরও ধর্ম। কর্মহীন ঈমান আর ঈমানহীন কর্ম আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। ইসলামের শিক্ষা হলো আল্লাহ্র দেয়া এই যে অফুরন্ত সম্পদ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ তা থেকে জীবিকা সংগ্রহ করুক। এও তার ইবাদাত বা উপাসনা। সুতরাং ইসলামে আত্মনির্ভরশীল পরিশ্রমকে কল্যাণ লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সকলকেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য পরিশ্রম করতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণের, মানব ধর্মের মূলকথা হল মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ইসলামে সমাজসেবাকে সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হিসবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম সৃষ্টি সে, যে তাঁর পরিবারের সাথে সদাচরণ করে।"[১০১]

সামগ্রিক জীবনবোধঃ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান বলে মানব জীবনের সামগ্রিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ উভয়েই সমাজের অখণ্ড সত্তায় বিশ্বাসী এবং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সমাজকে পৃথকভাবে বিচার না করে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা হয়।

ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম মানব জীবনের সবক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন, সংস্কৃতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, পার্থিব ও পারলৌকিক ইত্যাদি জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের পথ নির্দেশ রয়েছে। কুরআন মানুষকে ইসলামে পূর্ণভাবে অর্থাৎ কোন অংশ পৃথক না রেখে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলতে বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামের পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর।"[১০২]

---

১০০. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুঠির, বগুড়া ও ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ২৮৮
১০১. আব্দুল গাফফার হাসান নদভী, এন্তেখাবে হাদীস, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০১, হাদীস নং-২৪৮, পৃ. ১৫৯
১০২. আল-কুরআন, ২:২০৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা। কুরআন ঘোষণা করছে, "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি। যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্যে বিস্ময়কর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ্ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখে তাঁর ও তাঁর রসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে।"[১০৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষক বা রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার অধনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞেস করা হবে তার রাষ্ট্রের জনগণ সম্পর্কে। প্রত্যেক মানুষকে তার পরিবার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, প্রত্যেক নারী তার স্বামীর সংসারের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার পরিবারের সকল সদস্য সম্পর্কে হিসেব দিতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মচারী তার মালিকের রাখাল, তাকে তার মালিকের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"[১০৪]

শান্তিই হল ইসলামের মূলমন্ত্র। কারণ এই শান্তির পথেই ইসলামের উদ্ভব এবং এই শান্তিই এর শেষ ফলশ্রুতি। অতএব, ইসলাম মূলত শান্তির ধর্ম। মানুষকে অধিকতর সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। প্রকৃতির সবকিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এসকল পূর্ণতা সাধনে মানুষকে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছে এবং এর মাধ্যমে সে সুপ্ত মানসিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পরে। মানুষের মধ্যে মানবিক বৃত্তির পূর্ণতা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে এবং এ পূর্ণাঙ্গতা তাকে মুক্তি লাভে সাহায্য করে।

ইসলামের উদ্দেশ্য হল সর্বশক্তিমান পরমসত্তা আল্লাহ্‌র স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সাথে শান্তি স্থাপন করা। সৃষ্টির সেরা (আশরাফুল মাখলূকাত) জীব ও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি খলীফা হিসেবে মানুষকে সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করবে এবং একমাত্র তারই আদেশ মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। সে প্রাকৃতিক কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। এর অন্যথা হলে মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অবনতি ডেকে আনবে। এভাবেই মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি বজায় রেখে স্বীয় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। আবার ইসলাম যেমন আল্লাহ্‌র সাথে শান্তির কথা বলে, তেমনি তা সমগ্র বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও আগ্রহী। এর অর্থ মানুষ একজন অন্যজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়। পিতার প্রতি পুত্রের ও পুত্রের পতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, একজন

১০৩. আল-কুরআন, ৫৭:২৫
১০৪. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, অনুবাদঃ আফলাতুল কায়সার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০২, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং-৪৫৭৬, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের, একজন অমুসলিমের প্রতি একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এসকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। তাই আল্লামা আবুল হাশিম তাঁর "দি ক্রিড অব ইসলাম" গ্রন্থে বলেছেন, "ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিস্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।"[১০৫]

তিনি আরো বলেছেন, "...... ইসলাম জীবনের কোন বৃত্তিকেই তুচ্ছ মনে করে না, আবার কোনটিকই জীবনের একমাত্র নিয়ন্তাও মনে কর না। তাই ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির স্থুল ও সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ চায়। আর এটাই ইসলাম, এটাই মানব সত্তার পূর্ণ বিকাশ তথা মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার পরম পরিণতি লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।"[১০৬] এভাবেই ইসলাম মানুষের জীবনকে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করে থাকে। বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও বিশ্ব সৌন্দর্য বিধানের মৌলিক শিক্ষা ইসলামে রয়েছে। এক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় স্রষ্টার একক কর্তৃক ও অসীম ক্ষমতাকে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস করা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানবীয় জীবনকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় করে তুলতে সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা দেয় ইসলাম। ইসলামের এ শিক্ষা জীবন-দর্শনের দিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। সমঅধিকারের ভিত্তিতে সমবেতভাবে জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তুলতে সহায়তা করছে, সমস্যাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত করছে।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বঃ

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সাম্য ও ভ্রাতৃনীতি। মানবকল্যাণ তথা মানবতার সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কীয় মানবীয় চেতনাবোধ। এর মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক, আত্মিক এবং বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন তথা সর্বপ্রকার উন্নতির বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে সাম্যের প্রশংসা সর্বত্র বিদ্যমান। বলাবাহুল্য, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র প্রভৃতি কল্যাণকর নিয়ম-নীতি ইসলামের অমূল্য অবদান। ইসলাম বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের যে শিক্ষা দিয়েছে তা অতুলনীয়। এতে বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্য নেই। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একজন মানুষ থেকেই সৃজিত হয়েছে। তাই মানব সমাজে কোনরকম ভেদাভেদ থাকতে পারে না। পারে না বলেই ইসলাম সমাজের সর্বত্র সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের বাস্তবায়নের আদেশ দেয়। মানব সমাজে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনে ইসলামের এই অনুপম নীতি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ ও শিক্ষা অতুলনীয়।

---

১০৫. আবুল হাশিম, ইসলামের মর্ম কথা, অনুবাদঃ মুসলিম চৌধুরী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬. পৃ. ৮২

১০৬. আবুল হাশিম, 'ইসলামী সংস্কৃতি', ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট-১৯৬৭, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, কোন বৈষম্য নেই; বংশ, বর্ণ ও শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ নেই। কেউ উঁচু নয়, কেউ নিচু নয়, কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ দাস নয়, কেউ মনিব নয়; কেউ অপবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। সব মানুষ সমান এবং মানুষের সৃষ্টিসূত্র এক ও অভিন্ন। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে জন্মসূত্রগত এক চিরন্তন শাশ্বত সম্পর্ক। আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন ব্যক্তি থেকে।"[১০৭] সম্পর্ক বৈষম্যহীন, এ সম্পর্ক মানবিক সম্পর্ক, মনুষ্যত্বের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক।

মানুষে মানুষে এই জন্মগত ও প্রাকৃতিক সম্পর্কের কারণেই মানুষের মধ্যে মানবতাবোধের সৃষ্টি হয়। এ বোধ জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে। এরপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিকশিত হয়।

এভাবেই ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে মানবকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটা হয় প্রকৃত মানবতাবোধ। এর সাথে কোন বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকে না। এ নিঃস্বার্থ চেতনা ও মানবতাবোধই ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। এ মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, মূলত সেটাই ইসলাম। এরপর ইসলাম যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা হল মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য।

সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। ইসলাম এমন এক ব্যাপক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে, সেখানে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণেই একজন অন্যজনের অধিকারকে পদদলিত করতে পারে না। মানবতার দর্শন হিসেবে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে প্রভেদ মানে না। অমুসলিমগণকেও ইসলাম তার সমাজ কাঠামো হতে বিচ্ছিন্ন করেনি। এক আল্লাহ্র অধীনে ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চায়। মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতীয়বাদা ও বর্ণবাদের উর্ধ্বে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনাই ইসলামের লক্ষ্য। শুরু থেকেই ইসলাম এ লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সমকালীন অবস্থার উপযোগী প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেছে।

---

১০৭. আল-কুরআন, ৭:১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

মানব সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে ঐক্যবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলাম নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছে। ইসলামের ঐক্যবন্ধন কেবল দেশ ও জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা সমগ্র মানব জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে আগ্রহী। দেশে দেশে, জাতিকে জাতিতে, সর্বোপরি ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতিকে ঐক্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।[১০৮]

তাই ইসলাম আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের কথা, মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা শিক্ষা দেয়। যেসব বাধা ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ইসলাম যে সব বাধাকে কার্যকরভাবে অপসারণ করে এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে যাতে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়।[১০৯]

ইসলাম শুধু মানব মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন ঘোষনাই প্রদান করেনি; বরং সপ্তম শতাব্দির প্রারম্ভ থেকে সম্পূর্ণ সফলভাবে এ সব আদেশ বাস্তবায়িত করে, যখন সমগ্র বিশ্বের কাছে মানব মর্যাদা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা ছিল একেবারেই অজানা। গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সভ্য দেশের মধ্যেও হেলট (Helots), প্লেবিয়ানস (Plebians) ও শুদ্রেরা সকল মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত অনেক স্থলে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শুদ্র, ইতর-ভদ্র, উঁচু-নিচু এ ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরন্তন অভিশাপ। উঁচু শ্রেণীর ও বর্ণের মানুষেরা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে ধর্ম ও সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে কোটি কোটি নর-নারীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে।

ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানব জাতিকে এক সমাজভুক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেয়নি, বাস্তবজগতে কোটি কোটি মানুষকে এই সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইসলাম আল্লাহ্‌কে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে দিয়ে বাদশাহ ও ফকির, আমীর ও গরীব, ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক, প্রভু ও ভৃত্যকে একসূত্রে গ্রথিত ও এক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই সাম্যে মানুষের অন্তর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র ও শ্বেত-কৃষ্ণের নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করেছে, "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।"[১১০]

---

১০৮. Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987, P. 80

১০৯. Ibid, P. 82

১১০. আল-কুরআন, ৪:১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সমগ্র মানবজাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। অতএব জাতি ও গোত্রের এই প্রকারভেদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হওয়া উচিত যে, তা পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যম হবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজনমাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[১১১]

এরপর জীবনে কতক লোক সামনে এগিয়ে যায় এবং কতক লোক পেছনে পড়ে থাকে। কেউ বিত্তশালী হয়, কেউ বা বিত্তহীন হয়। কেউ শাসক হয়, কেউ হয় শাসিত। কতক জাতির চামড়া হয় সাদা, কতক জাতির চামড়া হয় কালো। এটা প্রকৃতিক অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এই উঁচু-নিচু ও ছোট-বড় মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ ঘটাবে ইসলাম তা সমর্থন করে না। দরিদ্রের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের, কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা কেবল সততার ভিত্তিতে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচাইতে অধিক সম্মানিত, যে সবচাইতে তাকওয়াবান।"[১১২] কুরআনের এই মহৎ উদ্দেশ্যের সমর্থন করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সকলেই সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পার না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গকে একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। কেবল ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত।[১১৩] এভাবেই ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের আভিজাত্য, ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার, পদমর্যাদা ও জ্ঞান গরিমা চুরমার করে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম যে সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে তাতে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণ অর্থাৎ তার গুণ ও কর্মের দ্বারা, তার বংশ গৌরব, ধনদৌলত, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পেশা দ্বারা নয়। নারীরা শুধু সামাজিক মর্যাদাই লাভ করে না, তারা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস সব মিথ্যা ও কৃত্রিম সম্ভ্রমবোধ সরাসরি বাতিল করে দেয়। ইসলামের খলীফাগণ তদানীন্তন বিশ্ববাসীর মনে ভীতি ও প্রশংসার ভাব উদ্রেক করেছিলেন তাদের চরিত্র মহত্ত্বে, রাজ দরবারের মনোমুগ্ধকর শোভা ও আড়ম্বর দ্বারা নয়। কালিমার এই মানবীয় দিক অর্থাৎ মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এমন যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে লালন করা হত যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে, তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের প্রতি কোন বিশেষ সামাজিক

---

১১১. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
১১২. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
১১৩. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা: ১৯৪৩, পৃ. ৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা প্রদর্শন করার কোন প্রবণতা সহ্য করতেন না।[১১৪] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (স.) ঘোষণা করেন, "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। (অতএব সকলেই সমান)" "হে আদম সন্তান! মনে রেখো, আজকের এই দিন, এই মাস, এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পত্তিও মর্যাদা সম্পন্ন।" "মনে রেখো, আঁধার যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি আমার পদতলে দলিত করছি। অজ্ঞতার যুগের রক্তপাত এবং তার প্রতিশোধের সকল ঘটনা আজ থেকে ভুলে যাও। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা রাবী'আ ইবন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি।[১১৫] এভাবে মহানবী (স.) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছিলেন। স্বয়ং তিনি তাঁর মহান জীবনেও সাম্যের এ আদর্শ পেশ করেছেন।

ইসলাম আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদ দর্শনের ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের ধারণার ভিত্তিতে মানুষের জন্য সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম শুধু সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উচ্চতর আদর্শ ও রীতিনীতিই শেখায়নি; বরং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকারের রীতিনীতিরও নিশ্চয়তা বিধান করেছে জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দিয়েছে অবাধ বাকস্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান ন্যায়বিচার পাবার অধিকার। রাষ্ট্র, সমাজ ও মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করেছে। সরোজিনী নাইডু লন্ডনে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "It (Islam) has brought to the modern world the true gift of democracy but the trend of civilization today the sum total of the world's aspiration today is to reconstruct the new world towards the brotherhood that was preached in the desert by a camel-driver more than thirteen hundred years ago. ....Centuries ago when my forefathers were evolving great philosophies and sending to the younger nations a message of enlightenment. Arabia was still uncultured. Arabia was nothing but a desert of wild holders when the great Buddhist message of "Nirvan" was being enunciated from the Bo-tree by – Bhaddha. Gaya and Sarnath, there was no conception of what the world 'Democracy meant when Christ was crucified upon the cross by the unbehevers, even then the idial of brotherhood was not accepted. It was challenged and trampled in the dust. It was necessary that a camel-driver from Arabia should gave to the world in the ultimate from the most perfect deformation of brotherhood of the republic of equality of all men of all classess of all ranks."[১১৬]

---

১১৪. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪–৭৫

১১৫. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ৪৫

১১৬. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৫২–৫৩

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম আরবদের সংস্কৃতির মধ্যে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, মানব জাতির অতীত কিংবা বর্তমান ইতিহাসে আর কোথাও তা দেখা যায় না। তাদের কাছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ও দূরবর্তী আদর্শ মাত্র ছিল না, এটা ছিল তাদের প্রত্যক্ষ সমাজ জীবনের ভিত্তি। তারা শুধু একে অপরের সহচর ছিলেন না, ছিলেন একে অন্যের ভাই। এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গুণেই বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করা, বিশ্বশান্তি কায়েম করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্ববন্ধুত্ব স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সকলের জন্য সমান সুযোগঃ

ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র।

ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃংখলা স্থাপন সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। এতে জাতিভেদের কোন বালাই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তিনি চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে।"[১১৭] এ আয়াতে সম্পদ ভোগে কোন বিশেষ শ্রেণীর অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। কোন প্রাণীর মধ্যে বৈষম্যও করা হয়নি।

ইসলামী আইন অনুসারে কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করলেও সেই শাস্তি দেয়া হত যে শাস্তি একজন মুসলমানকে হত্যা করলে দেয়া হত। যাতে কোন অবিচার বা যথেচ্ছাভাবে না হয়, সেজন্য কোন মুসলমান নাগরিককে অমুসলিম (যিম্মী) নাগরিকের সম্পত্তি ক্রয় করারও অধিকার দেয়া হয়নি। এমনকি ইমাম এবং সম্রাট পর্যন্ত কেউই কোন অমুসলিমকে তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তাদের (যিম্মী) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকার থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'উশর' যিম্মীদের নিকট হতে নেয়া হবে না। তাদের অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।[১১৮] তিনি শত্রুদের প্রতি

---

১১৭. আল-কুরআন, ৪১:১০

১১৮. Sayed Amir Ali, Op.cit, P. 130

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গৃহাভ্যন্তরের বাসিন্দাদের গায়ে হাত দিও না, নারীদের অক্ষমতার সম্মান রক্ষা কর; দুগ্ধপোষ্য শিশু আর রোগশয্যার মানুষকে আঘাত করো না; বাধা প্রধান করে না এমন অধিবাসীদের বাসগৃহ ভেঙ্গে দিওনা; তাদের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ ও ফলের গাছ নষ্ট করো না। খেজুর গাছের ক্ষতি করো না।"[১১৯] তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি যিম্মীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে এবং তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে আমি পরলোকে তার জন্য অভিযোগকারী হব।"[১২০]

এজন্যই Encyclopedia of Religion and Ethics এ বলা হয়েছে "The recognition of rival religious systems as possessing a Divine revelution gave to Islam from the outset a theological basis for the toleration of non Muslim. [১২১]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনে সাম্য ও মৈত্রীর নীতি ঘোষণা করেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করেন। স্বরাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বরূপ আরবে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করন, জনসাধারণের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হিফাযতের দায়িত্ব ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; সুবিচার কায়েম করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মানুষের আর্থিক দুর্গতি দূরীভূত করার সকল বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ইসলাম আরবদের সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল; আরবরা শুধু মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদই অপসারণ করল না, তারা তাদের মধ্যকার সব বিবাদ মীমাংসা করল, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সমূলে উৎপাটিত করল, একে অপরের সহচরের মত নয়, নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতে শিখল। এ সমাজ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাসের ফলে।[১২২]

"সমস্ত মানব এক জাতি" (২:২১৩) এই সক্রিয় বিশ্বাসের ফরে যাঁরা ছিলেন সমাজে সর্বপ্রধান সেই খলীফাগণও কোন বিশেষ সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করতেন না। একজন সাধারণ বেদুঈনও তাদেরকে নাম ধরে সম্বোধন করত, যেভাবে সে তার ভাইকে সম্বোধন করত; বর্তমানে রাজা, মহারাজা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরকে যেভাবে আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিযোগে সম্বোধন করা হয়, খলীফাগণকে সেভাবে সম্বোধন করা হত না। খলীফা ও একজন সাধারণ লোকের মধ্যে এটুকু পার্থক্য ছিল যে, খলীফা পদাধিকার বলে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতেন, কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সামাজিক সম্মান ভোগ করতেন। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এত বাস্তব, এত অনুপম ও সতেজ ছিল যে, সামাজিক প্রাধান্য লাভে খলীফাগণের নিজেদের মধ্যে কোন চিন্তা ছিল না এবং তাঁদের পদের সম্ভ্রম ও মহিমা সম্বন্ধেও

---

১১৯. Ibid, P. 130
১২০. আব্দুল গাফফার হাসান নদভী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৮, পৃ. ২১৪
১২১. Encyclopedia of Religion and Ethics, Edited by James Hastings, XII, P. 366
১২২. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কোন কৃত্রিমতাবোধ ছিল না। যখন পারস্যের গর্বিত শাসনকর্তা হরমুজানকে বন্দী অবস্থায় খলীফা উমরের (রা.) সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন বিজেতা খলীফা নিরীহ সাধারণ মানুষের মত হাতের উপর মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ (স.) এর মসজিদে খোলা সিঁড়িতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।"[১২৩]

সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করতেন। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব উঁচু ছিল। কোন পরিশ্রমের কাজকে, তা যতই নগন্য হোক না, তাঁরা নীচ বলে মনে করতেন না। নিজের পেশার ভিত্তিতে ভাই থেকে ভাই পৃথক হতেন না। হযরত আবূ বকরকে (রা.) প্রায় দেখা যেত কাপড়ের ভারী বোঝা পিঠে করে কাপড় বিক্রি করার জন্য মদীনার রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। তাঁদের সমাজে ঈর্ষা ও ঘৃণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শোষণের সম্পর্ক ছিল না, ছিল প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক এবং তাঁরা একে অন্যকে ভাইয়ের মত সাহায্য করতেন। তাঁরা পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। যদি কখনও তাঁরা কাউকে আঘাত করতেন প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে নয়, শুধু বিদ্বেষমুক্ত কর্তব্য পালনের জন্য।

বস্তুর সাম্য, মৈত্রী, জনসেবা ও সুবিচারের এমন অতুলনীয় এবং অভাবনীয় বিস্ময়কর আদর্শ কেবল ইসলামই পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে এইচ. এ. আর গীবের মন্তব্যটি উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। তিনি বলেছেন, "নিরবচ্ছিন্ন মানবতার সেবা করার প্রচেষ্টা ইসলামে রয়েছে। ইউরোপের চাইতে অধিক বাস্তবভিত্তিক ও ঘনিষ্ঠভাবে ইসলাম প্রাচ্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। ইসলামে রয়েছে আন্তঃবর্ণ সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের চমৎকার ঐতিহ্য। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সম মর্যাদা ও সুযোগ প্রদানের এত উদ্যোগ কোন সমাজ নেয়নি এবং এতবেশী সফলতা আর কোন সমাজ অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন বর্ণ এবং ঐতিহ্যের মধ্যে মীমাংসার অযোগ্য সমস্যাসমূহের পূর্ণ মীমাংসা করার ক্ষমতা ইসলামের আছে।"[১২৪]

সম্পদের ব্যবহার ও সুষম বণ্টন:

ইসলামের সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কী খরচ করবে? বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয় কর।"[১২৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তিনি সেই মহান সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১২৬] এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১২৪. H.A.R. Gibb, Wheither Islam, London-1973, P. 379
১২৫. আল-কুরআন, ২:২১৯
১২৬. আল-কুরআন, ২:২৯

Dhaka University Institutional Repository

করে বলা হয়নি; বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য কর বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং কারও বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, কোন অঞ্চলের সম্পদ যে শুধু সে অঞ্চলের ইসলাম এ স্বীকৃতিও দেয়নি।

ইসলামে সম্পদ মাত্র দুটি কাজে ব্যবহৃত হবে। একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরটি শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে ব্যয় করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর।"[১২৭]

দারিদ্র্য বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককে সমাজের জন্য কম বেশী ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তারা তা হতে সমাজকল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অনটনের মধ্যে আছে, তারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে ব্যয় করুক। আল্লাহ্ কাউকেও তিনি যা দিয়েছেন তার বাইরে, তার বহনের অতিরিক্ত ভার তার উপর অর্পণ করেন না। অস্বাচ্ছন্দ্যের পর আল্লাহ্ পুনঃ তাদেরকে সম্পদ দান করবেন।"[১২৮]

আল-কুরআনে মওজুদদারদের নিন্দা করা হয়েছে কঠোরভাবে এবং তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, "তারা অভিশপ্ত যারা ধন সম্পদ মওজুত করে, আর গুনে গুনে রাখে, ভাবে তাদের ধন তাদের নিরাপত্তা দিবে, নিশ্চয় নয়। এই সম্পদ তাদের এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে, যা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে।"[১২৯] সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ধন সম্পদের অপচয় কর না, যারা এভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[১৩০] ইসলাম মানুষকে সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। এভাবেই ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব:

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে: স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বপালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমীনে যা কিছু বিদ্যমান, তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ্, মানুষ নয়-তা সে ব্যক্তিই হোক, আর ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রই হোক। মালিকানা স্বত্বের অর্থ-ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। ইসলাম মানুষের এ ধরনের অধিকার স্বীকার করে না। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিক রূপে নয় বরং আল্লাহ্র 'রব্ব' (লালন

১২৭. আল-কুরআন, ৬৩:১০
১২৮. আল-কুরআন, ৬৫:৭
১২৯. আল-কুরআন, ১০৪: ২–৪
১৩০. আল-কুরআন, ১৭:২৬–২৭

Dhaka University Institutional Repository

ও পালন নীতি) গুণের প্রতিভূরূপে (খলীফা)। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এর ব্যবহারিক স্বত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবনমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ও কর্মের সংস্থান এই মৌল জীবিকার উপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হাক্কুল ইবাদ' আদায় করা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সকল কাজই আল্লাহ্র জন্য, সকল কাজই আল্লাহ্র ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকুল মন চায় শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এখানেই ইবাদতের মূল নিহিত রয়েছে। আল-কুরআনের প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াতে ইসলামের ধর্মীয় জীবন "এটা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"[১৩১]

আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামে ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় ঈমান ও আমলের বিশ্বাস ও কর্মের মৌলিক নীতিসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঈমান ইসলামের তত্ত্বমূলক দিক এবং আমল (কর্ম)-এর ব্যবহারিক দিক। বিশ্বাস বিবর্জিত কর্ম যেমন ইসলামের লক্ষ্য নয়, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও ইসলামের আদর্শ নয়; ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ও সংযোগ ঘটেছে।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ইনসান' শব্দের অর্থ মনুষ্যত্ববোধ বা অনুভূতি। মানুষের এ মনুষ্যত্ববোধ এবং তার তীক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে বলেই তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। তার এ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়েই সে বিচার করবে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করবে। তারপর সে বুদ্ধি ও বোধকে, মনুষ্যত্ব ও অনুভূতিকে মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে কাজে লাগাবে ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"[১৩২] আল্লাহ্ তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের ভিত্তি হিসেবে পাঁচটি ফরয ইবাদাত হচ্ছে: কালিমা, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত। কালিমা সব সময় উচ্চারণ করা ফরয না হলেও সব সময় তা স্মরণে রাখা ও তার মর্মবাণী উপলব্ধি করা আবশ্যক। সালাত দিনে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা ফরয। সাওম শুধু বছরের একমাস ফরয। সাওম অবস্থায় অন্য সকল বৈধ কাজ করাও জায়েয রাখা হয়েছে। হজ্জ শুধু বিত্তবানদের জন্য জীবনে একবার পালন করা ফরয। যাকাত শুধু বিত্তবানদের জন্য

---

১৩১. আল-কুরআন, ২:২–৫
১৩২. আল-কুরআন, ৫১:৫৬

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট। বাকি সময় মানুষ কী করবে? আবার অন্যভাবে মানুষ যদি বাকি সময় নফল ইবাদতে কাটিয়ে দেয়, তা হয় বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করার নামান্তর। মূলত ইসলাম এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করতে বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, হে আমাদের রব আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দান কর।"[১৩৩] ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র তথা বিশ্ব, জীবনের সকল পর্যায়ে, দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার জন্য জীবনের সকল শ্রম, সাধনা, প্রয়াস ও সময়কে ব্যয় করাই প্রকৃত মু'মিন জীবনের লক্ষ্য এবং ইসলামে তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

যে সমস্ত ইবাদাত সরাসরি আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত, তা হুকূকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ইবাদাত; আর যে সমস্ত ইবাদাত বান্দা বা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত, তা হুকূকুল ইবাদ। দু'টি ইবাদাতের মধ্যে এমন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যে, দু'টিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই। বান্দার হককে উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করলে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা যাবে না। দু'ধরনের ইবাদতই আমাদের উপর ফরয এবং যদি কেহ উভয় ইবাদতের কোন একটিতে আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং অন্যটিকে উপেক্ষা করে, তবে তার পক্ষে ইবাদাতের পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সকল কিছু উপেক্ষা করে যদি কেউ শুধু আল্লাহ্র ধ্যানে ও চিন্তায় জীবন পরিচালনা করে সিদ্ধি লাভ করতে চায়, তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে উপেক্ষা করল। অথচ আল্লাহ্ই মানুষকে নানা জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বজগতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আঁধার মহিমান্বিত স্রষ্টার সকল গুণ ও শক্তির সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণ ও স্রষ্টার নির্দেশ মত হালাল-হারামের বিধান মান্যকরে জীবন-যাপন, সর্বোপরি সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সব কাজে তাঁর সন্তুষ্ট অর্জনই আল্লাহ্র হক। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক আচরণ করাই হুকূকুল ইবাদ। অতএব আল্লাহ্র হুকুম পালনের নামই ইবাদাত।

মূলত হুকুল্লাহ্ দাবি শুধু একটিই, আর হুকূকুল ইবাদ হল সুবিস্তৃত, সীমা-সংখ্যাহীন। হুকূকুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতা আসে না। একমাত্র আল্লাহ্কে স্মরণ করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনার্থ যদি আমরা সর্বপ্রকার মিথ্যা বলা, অশ্রাব্য-অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, পরনিন্দা-পরচর্চা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে সর্বদা সত্য কথা বলি, সুশ্রাব্য বাক্য ব্যবহার করি, অন্যের সাথে সদাচরণ করি, তবে তা অবশ্যই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে আমাদের চোখ, কান, হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গকে যদি সর্বদা ইসলাম নির্দেশিত হালাল পন্থায় ব্যবহার করি, তবে তা ইবাদাতরূপে গণ্য হবে। শরীরের যে কোন

---

১৩৩. আল-কুরআন, ২:২০১

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যায় অবৈধভাবে ব্যবহার করলে যেমন পাপ হয়, বৈধ ও ইসলাম সম্মত হালাল পন্থায় ব্যবহার করলে তেমনি নেকী ও সওয়াবের প্রত্যাশা করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মিথ্যা বললে, অন্যের সাথে অসদাচরণ ও অন্যায় করলে যেমন গুণাহ্ হয়, সত্য বললে, সদাচরণ, সদালাপ ও পরোপকার করলে তেমনি সওয়াব হয়।

পার্থিব জীবনে আমাদের কায়-কারবার, লেন-দেন, বেচা-কেনা, আর্থিক আদান-প্রদান, সামাজিক আচরণ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সঠিক ও সঙ্গতভাবে জীবন পরিচালনার নাম ইবাদত। বিক্রির সময় ওজনে কম দেওয়া, ক্রয়ের সময় বেশি আনা, মালে ভেজাল মিশ্রিত করা, অতিরিক্ত মুনাফাখোরি, মওজুদদারি, ফটকা বাজারি, কালো বাজারি, ক্রয়-বিক্রয়ের মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে সততা, ঈমানদারী ও আমানতদারীর সাথে ব্যবসা পরিচালনা করলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, অধীনস্থ লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়ানুগ আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে তা যথাযথরূপে মেনে চললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে যেমন শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, হুক্কুল ইবাদ পালনের কারণে তা যথার্থ ইবাদত হিসেবেও আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে এর বরখেলাফ হলে তা দ্বারা ইসলামের শিক্ষা বা আল্লাহ্র আদেশকে অমান্য করা হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[১৩৪] বস্তুত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মযলূম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিচারপ্রার্থীকে ন্যায্য বিচার দিতে, রোগগ্রস্তকে দেখা-শোনা করতে ও চিকিৎসা সেবা দিতে, মযলূমকে যালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে এসব কিছু হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বা মানবতার সেবা হিসেবে গণ্য।

সামাজিক ন্যায়বিচারঃ

সামাজিক ন্যায়বিচার হল সমাজের ভারসাম্যের ধারক ও বাহক। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার বিভিন্ন অধিকারের দাবি অনুসারে তা যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। পরস্পর বিরোধী দাবির মধ্যে এই সামাজিক ন্যায়বিচার ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার

১৩৪. আল-কুরআন, ৪:৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এবং সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন অপরিহার্য। কারণ ব্যক্তি যদি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমান সুযোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠা সম্ভব নয়। অথচ আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যেই ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ নিহিত। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যক্তি যদি নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে সে নিজের কাছে, পরিবারের কাছে, এমনকি সমাজের কাছে বোঝা ও সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ইসলাম আমাদের সামনে মানবকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যে মূলনীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছে, তা খুবই ব্যাপক। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, তারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের দিকে।"[১৩৫] মুসলিমদের সেবার আদর্শ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়েরই উৎকর্ষ চায় না, এর দৃষ্টিদিগন্ত আরও সুদূর প্রসারী, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য এটা উন্মুখ ও সর্বজনীন। অপরের সেবার জন্য মানুষের জন্ম, এটা-ই কুরআনের শিক্ষা এবং মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত মানব জাতির জন্য তাদেরকে মানবতার চরম উৎকর্ষের নজিররূপে কাজ করার জন্য শ্রেষ্ঠতম উম্মত করে পাঠানো হয়েছে।" (৪:১১০) একদিকে যেমন মানুষের সমাজে যা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত তা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে। অপরদিকে তেমনি অবৈধ অর্থাৎ আল্লাহ্র দেয়া আইনের পরিপন্থী যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও নির্দেশ করা হয়েছে।"[১৩৬] এখানে যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজে বিদ্যমান সম্পদের অসম বণ্টন পরিহার করে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা যাবে। ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষেই আবর্তিত হয়েছে। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত স্বেচ্ছামূলক কোন দান নয়; বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে দরিদ্রদের মধ্যে, যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার ফলে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দেয়া, যাতে "যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তন না করে বা কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে।"[১৩৭]

---

১৩৫. আল-কুরআন, ৪:১০৪
১৩৬. আল-কুরআন, ৩:১১০
১৩৭. আল-কুরআন, ৫৯:৭

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারা মূলত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে জড়িত। এতে সমাজে বিদ্যমান যেসব অব্যবস্থাপনার জন্য জনগণ তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, তা অপসারণ করে তাদের অধিকার প্রাপ্তির পথকে সুগম করে তোলে। একথার অর্থ এই নয় যে, তাদের এরূপ সুবিধা প্রাপ্তিতে সমাজে অন্যদের দাবি উপেক্ষিত হবে বরং কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পন্থা হিসেবে সমাজ কাঠামোতে জনগণের বিভিন্ন দল ও অংশের স্বার্থ ও সামাজিক দাবির স্বাচ্ছন্দ্যকর সমন্বয় ধারাতেই সামাজিক ন্যায়বিচার আসে। এক্ষেত্রে ইসলামের মূল্যবোধ অনবদ্য। কেননা, ইসলাম সমাজের সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। ইসলাম মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ মানে না। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই যেহেতু ইসলামের মূলমন্ত্র, তাই ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। এতে জাতিভেদের কোন বালাই নেই।"[১৩৮]

ইসলাম সমাজে অর্থ-সম্পদের সুষম বণ্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন এবং সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল-দুর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং এতে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম যে সুবিচার নীতি উপস্থাপন করেছে তা সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না, তা বংশের দিক দিয়েই হোক, আর বর্ণ, ভাষা ও সম্পদের পরিমাপের ভিত্তিতেই হোক। এমনকি আকীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণেও আইন প্রয়োগে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র সাক্ষী হেসেবে ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, যদিও তা তোমাদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের ঘনিষ্ঠজনের বিরুদ্ধে হয়।"[১৩৯]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনে ন্যায়বিচারের প্রতি কি অপরূপ নিষ্ঠা ছিল, একটিমাত্র উদাহরণেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। একদা মাখযূম গোত্রের একজন মহিলাকে চুরির অপরাধে নবী করীম (স.) এর দরবারে হাজির করা হল। তিনি চুরির শাস্তি হস্ত কর্তনের আদেশ দিলে তাঁর সমীপে সেই মহিলাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা হিসেবে রেহাই দেয়ার সুপারিশ করা হয়। নবী করীম (স.) তখন রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেছিলেন, "যদি মুহাম্মদের

১৩৮. ফজলুল করিম, আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৪৭, পৃ. ৪৬

১৩৯. আল-কুরআন, ৪:১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা ফাতিমাও এই অপরাধ করত, তবে আমি তাকেও অনুরূপ শাস্তি দিতাম।"[১৪০] পরবর্তীকালে খুলাফা রাশিদূনের জীবনে, তাবি'ঈন ও তাব' তাবি'ঈনের জীবনে সে প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনকর্তাদের জীবনে এবং পাঠান ও সুলতানদের মধ্যে এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইসলামের এ সুবিচার নীতি সামাজিক ন্যায়বিচার দর্শনের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধঃ

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হল "পড়" অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর।[১৪১] মানব জাতির চির অজ্ঞতা, অন্ধকার, অনৈতিকতা, জুলুম-অত্যাচার, অসত্য, অক্যাণ দূর করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহ্র যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন, তার প্রথমটি হল সেই বৈশিষ্ট্য যা জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন-তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১৪২] কেবল কুরআনে বর্ণিত এসব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান। এজন্য ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকলের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে (সুদূর চীন দেশে) এবং অবিশ্বাসীদের কাছে যাওয়ারও কথা বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহ্র পথে জ্ঞানার্জন করে, সে পুণ্যের কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে, সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লাহ্র আরাধনা করে, যে জ্ঞান দান করে, সে দান-খয়রাত করে; আর যে উপযুক্ত পাত্রে তা দান করে, সে আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বস্তু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান জান্নাতের পথ আলোকিত করে; নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু নির্জনে তা আমাদের সমাজ পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাদের সাথী এটা আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে; এটা

১৪০. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং-৪২৬৩, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৪
১৪১. আল-কুরআন, ৯৬:১
১৪২. আল-কুরআন, ২:১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে। বন্ধুমহলে এটা আমাদের অলঙ্কার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইহজগতে নৃপতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরকালে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়।[১৪৩] এভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ অসীম স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা করবে এবং জীবন, সমাজ ও জগতকে কল্যাণময় করে তুলবে।

বস্তুত মানবাধিকার, সম্পদের সুষম বন্টন, চাহিদা পূরণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, শ্রমের মর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি, বিচারে নিরপেক্ষতা, বৈষম্যহীনতা, মানব বৈচিত্র্যে, সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের মূল্যবোধ অনবদ্য। সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির উন্নয়ন ও বাস্ত বায়নে যার আবেদন অনন্য ও অতুলনীয়।

---

১৪৩. Sayed Amir Ali, Op.cit, PP. 360–361

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

* প্রাসঙ্গিক আলোচনা
* অর্থনীতি কী?
* ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি
* ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি
* ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
* ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ
* ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

সাম্প্রতিককালে মুসলিম সুধী মহলে ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। বস্তুত এ থেকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহের প্রতি তাঁদের অসন্তুষ্টি এবং মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ ও সমাধান উদ্ভাবনে এসব অর্থনৈতিক মতবাদের ব্যর্থতারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলো কারণে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান যুগে প্রচলিত ধারণা ও বাস্তব চর্চা অনুযায়ী যে শাস্ত্রকে ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়, তার জন্ম ও বিকাশ ঘটে এমন একটি সমাজপরিবেশে-যা মুসলমানদের নিকট অপরিচিতি ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে উৎসারিত পাশ্চাত্য সমাজের গর্ভে এ শাস্ত্র জন্মলাভ করে। বর্তমান পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞান দীর্ঘ দুই শতাব্দীরও বেশিকালে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় বর্তমান রূপ লাভ করেছে।[১] এ শাস্ত্রের বেশির ভাগ বিশ্লেষণ ও দর্শনেরই মূল পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের গভীরে প্রোথিত। আর এগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে ধরে নেয়া হয়েছে। যদিও পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের কথা কদাচিৎ সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়ে থাকে, তথাপি এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতি প্রধানত উপযোগবাদ, ভোগবাদ, অবাধ প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কোলে লালিত হয়েছে।

এমনকি এর বিপরীত অর্থনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রও একই সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়া ও ফসলমাত্র। বস্তুত এ সব ধ্যান-ধারণা ও তত্ত্ব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের 'অর্থনীতি বিষয়ক দার্শনিক ও বিশ্লেষকদের' অধিকাংশেরই অবচেতন মনে এবং তথাকথিত আধুনিক অর্থনৈতিক বিধি ও তত্ত্বসমূহের বেশির ভাগেই অদৃশ্য ভিত্তিরূপে বিরাজ করে আসছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এসব ধ্যান-ধারণাকে 'অন্যসব কিছু অভিন্ন থাকলে'-এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[২]

অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ সব সময়ই আরোহ ও অবরোহ-উভয় ধরনেরই ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বা পরীক্ষাবাদ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। একটি পাশ্চাত্য সমাজের মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের আওতায় অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণা উপস্থাপন এবং তা নিয়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছেন। বস্তুত যেসব কাল্পনিক ধারণা 'অভিজ্ঞতাজাত বা পরীক্ষালবদ্ধ প্রমাণের দ্বারা' ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়নি, তা-ই গৃহীত তত্ত্বের উপাদানে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদগণ পুরোপুরি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে

---

১. মুহাম্মদ আকরাম খান (সংকলন), নূর হোসেন মজিদী, রাসূলুল্লাহ (স.) এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

আসছেন। কারণ সেখানে একটি মূলনীতি হিসেবেই যেকোন ঐশী বা নৈতিক পথনির্দেশনাকেই বাদ দেয়া হয় এবং এভাবে তাকে স্বীকৃত জ্ঞান-উপাদানের বাইরে বের করে দেয়া হয়।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সম্পদসূত্রসমূহের সম্ভাব্য বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা। পাশ্চাত্যে সব সময়ই অর্থনৈতিক গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গণ্য হয়ে আসছে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহের পর্যালোচনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার বস্তুগত জীবনের উন্নতির লক্ষে পন্থা ও প্রক্রিয়া নির্দেশ করা।

অর্থনীতি বিজ্ঞান অত্যন্ত ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রপঞ্চকে অনুধাবন, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন সময় তাঁদের পর্যালোচনার ফলে নতুন নতুন প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটে যা পুনরায় গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের বিকাশের এটাই 'স্বাভাবিক' প্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত ও কার্যকর হয়ে আসছে। অভাব বা প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর 'অত্যাধুনিক' সমস্যাবলীতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং তার সমাধানের লক্ষ্যে অধিকতর উন্নত তাত্ত্বিক 'হাতিয়ারপত্র' উদ্ভাবন করেছেন।[৩]

সাম্প্রতিককালে ইসলামী অর্থনীতির প্রতি মুসলিম অর্থনীতিবিদদের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য অর্থনীতির ধারণা-কল্পনা, পদ্ধতিসমূহ, আওতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারণা, পদ্ধতি, আওতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে উদ্ভূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে এই পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকা এবং তার প্রত্যাবর্তন ও চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কতগুলো অপরিহার্য ধারণা থেকে ইসলামী অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌম শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা (প্রতিনিধি)।[৪] আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর বুকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আর তিনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আর তিনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাযিলকৃত শারী'আহ্ আকারে সর্বশেষবারের মত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীকে পুরোপুরিভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (স.)-এর ওপর কুরআন মজীদরূপে নাযিল করেছেন এবং তাকে সমস্ত প্রকার ভুল-ত্রুটি,হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিকৃতি

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪. আল-কুরআন, ২:৩০

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সংরক্ষণ করেছেন।[৫] হযরত রাসূলে আকরাম (স.) তা যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর সময় যেরূপ ছিল, ঠিক সেরূপ অবস্থায়ই তা চলে এসেছে ও প্রচলিত রয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এ বাণীর ব্যাখ্যা করেন এবং তৎকালীন আরবের বুকে স্বীয় নেতৃত্বাধীনে যে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তা বাস্তবায়ন করেন। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং শারী'আহ্ অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপন করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই শারী'আহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সম্বন্ধে জানা এবং তদনুযায়ী চলা ও তার বাস্ত বায়ন করা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষ যাতে এ দায়িত্বপালন করতে পারে, সে লক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এখতিয়ারে কতগুলো পার্থিব উপায়-উপকরণ ও সম্পদসূত্র ন্যস্ত করেছেন। তাই তাকে এসব উপায়-উপকরণ ও সম্পদসূত্র এ দায়িত্ব পালনের লক্ষেই ব্যবহার করতে হবে। বস্তুত মানুষের এখতিয়ারে যে পার্থিব সম্পদ ন্যস্ত করা হয়েছে, তা তার কাছে গচ্ছিত আমানতমাত্র এবং পুনরুত্থান দিবসে (আখিরাতে) তাকে এ আমানতের হিসাব দিতে হবে।[৬]

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ধারনা এই যে, পার্থিব ধনসম্পদ কোন ঘৃণ্য ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বৈরাগ্যবাদের বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনসম্পদকে চূড়ান্ত লক্ষে পরিণত করা না হলে তা অর্জনে কোন পাপ নেই, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত শারী'আহ্র পথ থেকে বিচ্যুত না হলে বা শরী'আহ্ নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে অধিকতর সম্পদ আহরণের চেষ্টা-সাধনা একটি মহৎ কাজ বলে পরিগণিত। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামে মানুষের ভোগবাদী প্রবণতাকে ঐ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করা হয়েছে যাতে মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে গভীর চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়, মানুষ আল্লাহ্র খলীফা এবং সুবিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি মানুষকে শরী'আহ্র কাঠামোর আওতায় বিবেচনা করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন না করা সাপেক্ষে সে যেভাবে ইচ্ছা, আচরণ করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। তার ব্যষ্টিক ও সামাষ্টিক আচরণ শরী'আহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় অধ্যাদেশ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও পথপ্রদর্শিত। পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কাঠামোর আওতাধীনে বিবেচনা করা হয়। একারণে যে সমাজে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত শারী'আহ্ সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থানের অধিকারী, সেখানে এ ধরনের অর্থনীতি মোটেই উপযোগী নয়।

ইসলামী অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহও পাশ্চাত্য অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। ইসলামী অর্থনীতিতে এর মৌলিক ধারণাসমূহ চারটি উৎস থেকে উৎসারিত। তা হচ্ছে কুরআন মাজীদ, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও ক্বিয়াস।

---

৫. আল-কুরআন, ১১:১৪

৬. আল-কুরআন, ৩:৯২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদ হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ, আল্লাহ্ তা'আলা যা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি নাযিল করেন। কুরআন মজীদ অবিকৃতভাবে তার মূলরূপে বিদ্যমান রয়েছে।[৭] কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। এ গ্রন্থে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মানবজাতির জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত চূড়ান্ত, অলঙ্ঘনীয়, চিরন্তন ও অনন্য বিধান যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের, সকল স্থানের, সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

সুন্নাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়োজিত কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাকারী ও বাস্তবায়নকারী হিসেবে রাসূলে আকরাম (স.)-এর আচরণ, উক্তি ও অন্যের কাজের সন্দেহাতীত অনুমোদন। তিনি ছিলেন কুরআন মাজীদের প্রথম ধারক-বাহক এবং এর অনুধাবনের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পথনির্দেশপ্রাপ্ত।

হযরত রাসূলে আকরাম (স.)-এর আচরণ, উক্তি ও অন্যের কাজের সন্দেহাতীত অনুমোদন। তিনি ছিলেন কুরআন মজীদের প্রথম ধারক-বাহক এবং এর অনুধাবনের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পথনির্দেশপ্রাপ্ত।

হযরত রাসূলে আকরাম (স.) তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের বর্ণনা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিতে ও লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থসমূহ হাদীস গ্রন্থ নামে পরিচিত। রাসূলে আকরাম (স.)-এর নামে যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলোকে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বক্তব্য পরীক্ষা করে যেগুলো প্রকৃতই তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন বলে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে গ্রহণ করা যায়। ইসলামে হাদীস হচ্ছে হিদায়াত (পথনির্দেশ)-এর দ্বিতীয় অলঙ্ঘনীয় উৎস এবং এ কারণে ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই।[৮]

ইজ্মা ইসলামী অর্থনীতির তৃতীয় উৎস। ইজ্মা মানে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মতৈক্য। মুজতাহিদগণের মতৈক্য ইসলামী আইন বা বিধি-বিধানের অংশ বলে পরিগণিত।

ক্বিয়াস বা সদৃশ বিষয়ে ইসলামী শারী'আহর সদৃশ বিধান, অতএব ইহা ইসলামী অর্থনীতিরও চতুর্থ উৎস। যে বিষয়ে কুরআন মজীদে ও রাসূলে আকরাম (স.) সুন্নাহ কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না এবং মুজতাহিদগণের মধ্যে 'ইজ্মা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে বিষয়ে একজন মুজতাহিদ যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হন।

---

৭. আল-কুরআন, ১১:১৪
৮. মুহাম্মদ আকরাম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

এর মূলনীতি হচ্ছে, যে বিষয়ে উপরোক্ত তিন সূত্রের কোনটিতে বিধান রয়েছে, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে। অতএব অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব সমস্যার সমাধান উক্ত তিন সূত্রে নেই, সেসব সমস্যার সমাধান ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তবে ইজতিহাদের কাজ অবশ্যই শারী'আহ্‌র কাঠামোর আওতায় এবং 'এ কাজের জন্য যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী' লোকদের দ্বারা।

এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি পাশ্চাত্য অর্থনীতির অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু এক্ষেত্রেও উভয় অর্থনীতির মধ্যে মিলের বিষয়গুলোর চেয়ে অমিলের বিষয়গুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। সে যা-ই হোক, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তথা অতীতের ইজতিহাদসমূহ, অন্যদের (এমনকি অমুসলিমদেরও) সমকালীন তত্ত্বসমূহ এবং আধুনিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়া থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চারটি মৌলিক উৎস থেকে উৎসারিত ইসলামী অর্থনীতির পথনির্দেশসমূহ অর্থনীতির ওপর একটি স্বতন্ত্র আলোকসম্পাৎ করে। ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যাকে শারী'আহ্‌র আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং এর ফলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। এভাবে সর্বসম্মত সূত্র অর্থাৎ শরীআহর ওপর নির্ভরতার ফলে মতপার্থক্য সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

ইসলামী অর্থনীতিতে গবেষণার আওতা পাশ্চাত্য অর্থনীতির গবেষণার আওতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য অর্থনীতি যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই তার গবেষণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, তার পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি মানুষের 'ফালাহ্' বা কল্যাণের জন্য গবেষণা করে এবং এ লক্ষে উপনীত হবার জন্যে পন্থা বাতলে দেয়। 'ফালাহ্' মানে হচ্ছে এ পৃথিবীতে বস্তুগতভাবে অগ্রসর বা উন্নত জীবন এবং পরকালেও সফল জীবন। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জন্য 'ফালাহ্' নিশ্চিত করার লক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। তাই নিঃসন্দেহে এর গবেষণাক্ষেত্র পাশ্চাত্য অর্থনীতির গবেষণাক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত।

অর্থনীতি কি?:

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের গতিশীল জীবনধারার একটি অনিবার্য দিক, অবশ্যম্ভাবী বিভাগ। আল্লাহ মনোনীত 'A complete code of life' হিসেবে ইসলাম তাই এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যে কারণে ইসলামের রয়েছে স্বকীয় আদর্শে স্বতন্ত্র অসাধারণ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অব্যর্থ সনদ, অনবদ্য আয়োজন। প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে আগমণের সাথে সাথে যেমন ইসলামের আগমণ হয়েছে তেমনি ইসলামি অর্থনীতিরও পথচলা সেদিন থেকেই শুরু। প্রথম থেকেই মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা যেমন ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ছিল, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও একমাত্র অর্থনীতি ছিল ইসলামি অর্থনীতি। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামের নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ কখনই বাস্তবরূপ লাভ করেনি। বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও দেশে যেমন আলাদা ধর্ম, সভ্যতা ও জীবনধারা গড়ে উঠেছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সে ভিন্নতার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও সমকালীন চাহিদা বিবেচনা করে অর্থনীতিবিদগণ নতুন নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার জন্ম দিয়েছেন। আর এ সকল স্বতন্ত্র চিন্তাধারার ভিত্তিতে নানা রকম বিকল্প অর্থব্যবস্থা বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

অর্থনীতির সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতিও বিবর্তিত হয়েছে। এ বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পুরাতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। ড. জে. এন. কেইনস এ জন্যই বলেছেন, সংজ্ঞার ভারে অর্থনীতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। (Political economy is said to have strangled itself with definitions)[৯]

সাধারণ অর্থে অর্থনীতি হল অর্থ-সম্পদ সম্পর্কীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান। অর্থ সংক্রান্ত কাজ করার জন্যে মানুষ যে নীতি উদ্ভাবন করে অথবা যে বিধি-বিধানের আলোকে আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে তাকে অর্থনীতি বলে।[১০]

* অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলেন, 'জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণগত অনুসন্ধান পদ্ধতি হল অর্থনীতি।' (Economics is concerned with on enquiry into the natural and causes of the wealth of nations) তার মতে, অর্থনীতি হল সম্পদ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।[১১]

* অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (Proffesor Alfred Marshall) বলেন, 'অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজের সে সকল কার্যক্রমও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, যে সকল কাজের মাধ্যমে গুণ ও কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রি পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।' (Political Economy of Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action, which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites well-being.)[১২]

---

৯. J.M. Keyenss, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936, P. 4

১০. Adam Smith, An Enquiary into the Nature and causes of wealth of Nations, London, 1890, P. IV.

১১. Alfred Marshall, Principles of Economics, 1980

১২. Professor L. Robbins, The Nature and significance of Economics science, 2nd Edition-1935, P. 16

Dhaka University Institutional Repository

* অধ্যাপক এল. রবিন্স (Proffesor Lionel Robbins) বলেন, "অর্থনীতি হল একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানবীয় আচরণকে পর্যালোচনা করে।"[১২ (ক)] (Economics is the science, which studies human behavior as a relationship between ends and some means, which have alternative, uses)

* অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন বলেছেন, "Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society."[১৩]

স্যামুয়েলসনের এ সংজ্ঞাটি প্রবৃদ্ধিভিত্তিক সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সংজ্ঞাতে রবিন্সের বক্তব্য যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি আবার গতিশীল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটও বিবেচিত হয়েছে।

কাজেই বলা যায়, অর্থনীতি হল একটি বিশেষ শাস্ত্র যা জাতীসমূহের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (স.) প্রদত্ত জীবন বিধানই ইসলাম। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু এর অনুসারীদের জন্যে রয়েছে ব্যক্তি জীবন, গোষ্ঠী জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইন ও বিচার প্রভৃতি। অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্যে একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যেও একথা সত্য। তাই ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বোঝায় যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল ইসলামী আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়। এই অর্থনীতির মূলনীতি ও দিক-নির্দেশনা বিধৃত রয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে।

মুসলমানদের জীবনের সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ। অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মুসলিম উম্মাহর আকীদা হচ্ছে এই বিশ্বচরাচরের একজন মহান স্রষ্টা আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। একমাত্র তাঁরই নির্দেশিত পথে চললে মিলবে কল্যাণ ও মুক্তি। এই নির্দেশিত পথটি কি এবং

---

১২ (ক). উদ্বৃত: মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, লিজেন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০৯, পৃ. ১৬
১৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কেমন করে সেপথে চলতে হবে তা জানাবার জন্যে সেই বিশ্বস্রষ্টাই আবার যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলদের। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সেই ধারায় সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁরই মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।[১৪]

আল্লাহর এই একত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিকানাকেই ইসলামে বলা হয়েছে তৌহিদ এবং তাঁর পাঠানো নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই রিসালাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকন্তু এই জীবনই শেষ নয়, এর পরে রয়েছে এক অনন্ত জীবন বা আখিরাত। সেই জীবনে ইহকালীন সুকৃতির জন্যে জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির জন্যে রয়েছে শাস্তি। তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের এই সামষ্টিক বিশ্বাস মুসলমানের ঈমানের পূর্ণতা দান করে। এর তিলমাত্র ব্যতিক্রম শুধু তার ঈমান নয়, তার সমগ্র কর্মজীবনেই এনে দেয় নানা সংশয়, সন্দেহ ও অপূর্ণতা। শয়তান সেই সন্দেহের মধ্যে দিয়ে তাকে টেনে নেয় ধ্বংসের দিকে। মুসলমানের সমগ্র জীবন ও কর্মকান্ড তাই তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অর্থনীতি যেহেতু সেই জীবন ও কর্মকান্ডেরই এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রেও তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস ও তার দাবি সমভাবেই প্রযোজ্য, এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয় মুসলিমদের জীবনের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। গড়ে উঠে সমৃদ্ধ ও গতিশীল অর্থনীতি।

এই দার্শনিক ভিত্তিভূমিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ের কয়েকজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির একটি সুসংবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। সেসবের মধ্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলঃ

ড. এস.এম. হাসানউজ্জামানের মতে, "Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society."[১৫] (ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরীয়াহর বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ বা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ যেন এর ফলে মানবমন্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।)

ডা. এম. উমার চাপরার মতে, Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconmic and ecological imbalances."[১৬]

---

১৪. আল-কুরআন, ৫:৩

১৫. S.M. Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Wenter, 1984, P. 52

১৬. M. Umer Chapra, What is Islamic Economics, Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, Jeddha, 1996, P. 33

Dhaka University Institutional Repository

(ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টি অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।)

ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মত হলো, "Islamic economics is the Muslim thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience."[১৭] (সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রয়াসে তারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সহায়তা নিয়ে থাকেন।)

ড. এম.এ. মান্নান বলেন, "Islamic Economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam."[১৮] (ইসলামী অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।)

প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Islamic economics represents a systematic eftort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective. (ইসলামী অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক সমস্যা ও এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।)[১৯]

প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হামিদের মতে ইসলামী অর্থনীতি হলো "ইসলামী বিধানের সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রি উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।[২০]

---

১৭. M. Nejahullah Siddiqui, "History of Islamic Economics Thought" Lectures on Islamic Economics IRT/IDB, Jeddah, 1992, P. 69

১৮. M.A. Mannan, Islamic Economics: Theory and practice, The Islamic Academy, Cambridge, 1936, P. 18

১৯. Khurshid Ahmed, Nature and significance of Islamic Economics, Jeddha, IDB, 1992, P. 19

২০. এম. এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও সুন্নাহর শাশ্বত নির্দেশাবলীর পাশাপাশি উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী অর্থনীতির যে মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধকারে রেখেছে। উপরন্তু এদেশে দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের ফলে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন, মূলনীতি, রূপরেখা বা বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে ধারণা প্রসার লাভ করেনি।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি:

ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে বেশকিছু অনন্যধর্মী ও কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলোর নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সকল কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন-

সকল ক্ষেত্রে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার-এর নীতি বাস্তবায়ন:

আমর বিল মারুফ বা সৎ কাজে আদেশ (অন্য কথায় সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং নেহী আনিল মুনকার বা অন্যায় কাজে নিষেধ (অন্য কথায় দুর্নীতির উচ্ছেদ) ইসলামী সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেই সেই অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় ও মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ফরিয়াদে দিগন্ত হয়ে ওঠে সচকিত। আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের বিধান নেই বলেই পুঁজিবাদ মানুষের কাংখিত কল্যাণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু সেই অর্থনীতি সচল রাখার উদ্দেশ্যে কৌশল বদলানো হচ্ছে বারবার। কখনও বা মার্কেন্টাইলিজমকে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব, কখনও বা 'অদৃশ্য হস্ত'কে। কখনও গুরুত্ব পেয়েছে কল্যাণ অর্থনীতির (Welfare Economoics) ধারনা, আবার কখনও বা প্রাধান্য পেয়েছে উন্নয়ন অর্থনীতি।

কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। নৈতিকতা ও ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সৃষ্ট সংকট মোচনের দায়িত্ব শেষ অবধি রাষ্ট্রকে নিতে হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের (Structural Adjastment) কথা। কিন্তু ইতমধ্যেই এর বিপক্ষেও তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতিহাস তার সাক্ষি । এরই প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের মধ্যে, সমাজের সকল স্তরে সত্য ও মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তারই প্রতিবিধানের জন্যে সুনীতির সপক্ষে ও দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের এই নির্দেশ অমোঘ ও কালজয়ী। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একথা বেশী করে প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই নীতি প্রয়োগের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তার জীবন ও সমাজকে পবিত্র করা। খোদাভীতি বা তাকওয়া এরই ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিধানের মূল লক্ষ্য হলো ইহকালীন জীবনে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালনার মাধ্যমে তাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্যে তাকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ বা পবিত্র হতে হবে। খোদাভীতি এর অপরিহার্য সোপান। যার মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে সে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়া অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তার দ্বারা দুনিয়ার কোন অকল্যাণ সংঘটিত হবে না। আখিরাতেও সে আল্লাহর বা তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম। খোদায়ী বিধানের লক্ষ্যই হলো পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা অর্জনে মানুষকে সাহায্য করা।[২১] এজন্যে খোদাভীতি তা তাকওয়া সৃষ্টি জরুরী। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সকল অপরাধমূলক, নাশকতামূলক, হিংসাত্মক ও চরিত্রবিধ্বংসী কাজসহ খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত থাকা যেন মানুষ মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উসওয়াতুন হাসানা ও ইনসানে কামিলের প্রতিবিম্ব হতে পারে। তাকওয়া ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব।

এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা নিছক খেয়াল-খুশীর বশে মানুষ সৃষ্টি করেননি। তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এর পিছনে অন্তর্নিহিত ছিল।[২২] প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই তার গোচরীভূত। সকল কাজের পুরস্কার বা তিরস্কারের তিনিই মালিক, এই বোধ-বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কাউকে অসৎ কাজ হতে স্থায়ীভাবে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এজন্যেই ইসলামে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের সঙ্গেই তাযকিয়া ও তাকওয়ার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহের মধ্যে এটি সর্বাগ্রগণ্য স্থান পেয়েছে এ কারণেই।

সকল কর্মেই শরী'আহর বিধান মান্য করা:

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কিছু কিছু পেশা, খাদ্য ও পানীয় এবং কর্মকাণ্ডকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐসব কাজ করা এবং খাদ্য ও পানীয়ের ভোগ উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল কিছুই হারাম বা নিষিদ্ধ। অনুরূপ শরী'আহর সীমার মধ্যে বেশ কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ বলেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন অর্থনীতিতেই এই ধরনের বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের এই বিধান নেই। বরং সরকার বা আইন পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদেই কোন কাজকে বৈধ আবার কোন কাজকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করে থাকে। মানুষের মনগড়া মতবাদেই কেবল এই সুযোগ রয়েছে।[২৩] এক্ষেত্রে একই ধরনের কাজ একবার আইনতঃ নিষিদ্ধ আবার অন্য সময়ে আইনতঃ সিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ পান ও মদ তৈরি নিষিদ্ধকরণ ও পরবর্তীকালে পুনরায় অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

২১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী, ২০০৩, পৃ. ১১
২২. আল-কুরআন, ৫১:৫৬
২৩. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে এই ধরনের মনগড়া সিদ্ধ-নিষিদ্ধের সুযোগ রাখা হয়নি। যা সিদ্ধ বা বৈধ তা চিরকালের জন্যে ও সকলের জন্যেই বৈধ এবং যা নিষিদ্ধ বা অবৈধ তা চিরকালের জন্যৌ ও সকলের জন্যেই অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ পুনরায় মদেরই উল্লেখ করা যেতে পারে। গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আঠারো বছর বয়সের নীচে মদপান নিষিদ্ধ। কিন্তু যেদিন পরিবারের ছেলেমেয়ের কারো বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয় সেদিন ঘটা করে মদপানের উৎসব করা হয়। এই ধরনের দ্বিমুখী আচরণ ও মানসিকতার সুযোগ ইসলামে নেই। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অনুমতি থাকলে বা আইনের বিধান করে নিলে যেকোন সমাজবিধ্বংসী ও মানবতার জন্যে অবমাননাকর কাজও বৈধতার রূপ পেয়ে যায়। জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি এর জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। প্রথমটি সমাজবিধ্বংসী এবং পরবর্তীটি মানবতার জন্যে অবমাননাকর। কিন্তু যথোপযুক্ত ফি দিয়ে লাইসেন্স করে নিলে কি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই এ দু'টি কাজ শুধু বৈধতা নয়, সমাজেরও অনুমোদন পেয়ে যায়। বিপরীতক্রমে যা হালাল বা বৈধ তা প্রাপ্তির বা অর্জনের চেষ্টা করা এবং যা হারাম বা অবৈধ তা পরিত্যাগ বা বর্জনের চেষ্টা করা ইসলামী জীবন বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির দাবি।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী যেকোন ব্যক্তি হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং যে কোন পরিমাণ অর্থও উপার্জন করতে পারে। তার এই বৈধ মালিকানা থেকে তাকে বঞ্চিত করার কেউ নেই। তবে হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থায় এক কপর্দপকও উপার্জন করার তার অনুমতি নেই। বরং হারাম পদ্ধতিতে উপার্জন থেকে তাকে আইন প্রয়োগ করেই বিরত রাখা হবে। এক্ষেত্রে অপরাধের পর্যায় বা গুরুত্ব অনুসারে তাকে অবশ্যই কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড দেয়া যেতে পারে; এমনকি তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করা যেতে পারে।

আদল (ন্যায় বিচার) ও ইহসান (কল্যাণ)-এর প্রয়োগঃ

আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবেই প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন ইজমের অর্থনীতিতে সুবিচারের এই প্রসংগটি একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানে বরং মানুষের স্বাভাবিকতা বা ফিতরাতের বিরোধী নীতিই কার্যকর রয়েছে। ঐসব অর্থনীতিতে দুর্বলের, দরিদ্রের, বঞ্চিতের তথা সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের জন্যে স্বীকৃত কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দা এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রচণ্ড চাপের মুখে পরবর্তীকালে কিছু কিছু কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এই সমাজে একচেটিয়া কারবারী, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, ঘৃণ্য চোরাকারবারী, ধনী মজুতদার ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলার কথাই আইনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। দেশের আইনের আশ্রয় ও আনুকূল্য তাদেরই জন্যে। ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। ধনবৈষম্য হচ্ছে আরও প্রকট।[২৪]

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে সমাজে জবাবদিহিতার উপস্থিতি অপরিহার্য। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) আমলে মদীনার জনগণের মধ্যে বিলিকৃত কাপড় সকলেই পেয়েছিলেন এক খণ্ড করে। কিন্তু তিনি কিভাবে দুখণ্ড কাপড় ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন তার জবাব দিতে হয়েছিল জনতার সামনে খুতবা দেয়ার পূর্বেই। আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূল (স.) জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) কে হাজির হতে হয়েছিল কাযীর এজলাসে সাধারণ নাগরিকের মতোই। বর্মের মালিকানার সেই মামলায় তিনি হেরে গিয়েছিলেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের যুগেও বিচারের এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ন্যায়বিচারের অন্য অর্থ সমাজ হতে অন্যায় ও যুলুমের উচ্ছেদ এবং সবল প্রতিরোধ। ইসলামী শরী'আহর ব্যত্যয় যুলুমকেই ডেকে আনে। তার সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীই প্রতারিত ও নিগৃহীত এবং বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যেই ইসলামী অর্থনীতিতে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ ইসলামী বিধানের অপরিহার্য অঙ্গ।

একই সঙ্গে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটি ইসলামী অর্থনীতিতে যতখানি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে অন্য কোনও অর্থনীতিতে তা অনুপস্থিত। দুর্বলের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিতের প্রতি কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ এই কারণেই যাকাতের মতো একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উশর, সাদাকাতুল ফিতর ও করযে হাসানা। সমাজে যারা মন্দভাগ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তাদের সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হয় যদি যথোচিতভাবে যাকাত ও উশর আদায় ও বণ্টন হয়, ফিতরা প্রদান করা হয় এবং করযে হাসানার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়। দুর্বল, বঞ্চিত, ইয়াতীম, ঋণগ্রস্ত মুসাফির, পীড়িত ও আর্তজনেরা অর্থনৈতিক এই কল্যাণ ইসলামী সমাজে পায় তাদের অধিকার হিসেবেই, দয়ার দান হিসেবে নয়।[২৫]

ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাঃ

ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছে। আল-কুরআনে নিকট আত্মীয়দের অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়া আত্মীয়-স্বজনেরও হক রয়েছে। সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সহায়তা করা তার সামাজিক দায়িত্ব। এভাবে কোন জাতির বা দেশের এক-একটি পরিবার যদি স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেশ হতে দারিদ্র্য যেমন দূর হবে তেমনি পরমুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রাব্বুল আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।"[২৬]

"তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।"[২৭]

উপরের আয়াত দু'টি হতে সুস্পষ্টভাবে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া ঈমানী দায়িত্ব। যাকাতের অর্থ প্রদান সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের জন্যে বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে কুরআনুল করীমের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে তাদের জন্যে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের বঞ্চিত, ভাগ্যহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক। পৃথিবীর অন্য কোনও অর্থনীতিতে সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে এ ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বঞ্চিতের হতাশা ও কর্মদ্যোগ তাদের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়ে। সমাজে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঙ্খিত লক্ষ্য সেই লক্ষ্য কখনই অর্জিত হয়নি সমাজের নীচতলার লোকেরা সকলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বলেই। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে যখন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সর্বোচ্চ হয় তখন বিনিয়োগ চাহিদা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান একই সংগে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সমাজের অধিকাংশ লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকে। সেই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে আল্লাহ প্রদত্ত উপরের নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়াসঃ

ইসলাম সর্বস্ব ত্যাগের বা সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, আকণ্ঠ ভোগের বা চরম আসক্তির ধর্ম নয়। বরং ত্যাগ ও ভোগ-এ দুয়ের মাঝামাঝি জীবন যাপনের জন্যেই ইসলামে তাগিদ দেয়া হয়েছে। যে সংসারত্যাগী সে দুনিয়ার অর্থনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্যে আদৌ আগ্রহবোধ করে না। তাই দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করা তার সাধ্য বা ক্ষমতা বহির্ভূত। অপরপক্ষে যে ভোগী, যেকোন উপায়ে ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করাই তার একান্ত বাসনা। ভোগ করার জন্যে, নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে সব রকম উপায়ে সে ধন-সম্পদ উপার্জনে সচেষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে তার কাছে ন্যায়নীতি বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন যেমন তুচ্ছ তেমনি পরের কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা তার কাছে মূর্খতা। নিজে তো সে কৃপণতা করেই অন্যকেও কৃপণতা করতে প্ররোচিত করে। কৃপণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ব্যয় সংকুচিত হওয়া, ফলে চাহিদা সংকুচিত হওয়া এবং পরিণামে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সংকুচিত হওয়া। অর্থনীতিতে এর পরিমাণ নিদারুণ অশুভ।

২৬. আল-কুরআন, ৫১:১৯
২৭. আল-কুরআন, ১৭:২৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের মূল বক্তব্যই হলো নিজে সৎ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা করা, অন্যকেও সেভাবে বাঁচতে সহযোগিতা করা। প্রকৃত মুসলমান আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের জন্যে না নিজের সব মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনাকে বিসর্জন দেবে, না অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে। বরং কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে তারা যাত্রার সহযোগী করে নেবে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের। পক্ষান্তরে ধনলিপ্সা মানুষকে অন্যায়ের পথে প্ররোচিত করে। পরিণামে ডেকে আনে নিজের ও সমাজের অশেষ অমঙ্গল। অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে নিজের ধন জাহির করা এদের অনেকেরই কুৎসিৎ অভ্যাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এসবই নিন্দিত ও ঘৃণিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "সেই সব লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা তাদের দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে।"[২৮]

তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[২৯]

বরং তিনি ব্যয়ের ব্যাপরে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে,

"তারাই আল্লাহর নেক বান্দা যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এই উভয়ের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।"[৩০]

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অবশ্যই ধন-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করবে। নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তার। সেই সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনের ব্যাপারেও তার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত বা সাময়িকভাবে দুর্দশায় নিপতিত মানুষের জন্যে তার থাকবে আন্তরিক দরদ। সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ঘটবে তার বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি নিজে যেমন উচ্ছৃংখল ও বিলাসী জীবন যাপন করবে না তেমনি পরের দুঃখেও সে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। এই দুয়ের মধ্যবর্তী আচরণই ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্যেই অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের উপর ইসলাম এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা:

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পাঁচটি-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে ইসলাম ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে যে তাগিদ দিয়েছে তার নজীর আর কোন

---

২৮. আল-কুরআন, ৪:৩৭
২৯. আল-কুরআন, ১৭:২৭
৩০. আল-কুরআন, ২৫:৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিতে নেই। মূলতঃ এই প্রয়োজন পূরণের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ববোধ থেকেই ইসলামে বায়তুল মাল হতে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্যে ব্যয় করার বিধান রয়েছে।

ইবনে হাযম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুহাল্লাতে বলেন, "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এজন্যে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন।"[৩১]

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের মতো অপরিহার্য মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে একদিকে মানুষ যেমন অসুস্থ, অশক্ত ও রুগ্ন হয়ে পড়বে তেমনি শিক্ষার অভাবে সে খাঁটি মানুষ হতে পারবে না। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে। নবী মুস্তাফা (স.) বদরের যুদ্ধে শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যেকের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন মদীনার দশ জন বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান করা।[৩২] দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর পরে আজ বিশ্ববাসীর কাছে গণশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। অথচ এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে ইসলামে কত আগেই না তাগিদ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ ও নির্দেশনা তো মাত্র হাল আমলের। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পদ্ধতি নিয়ে রাসূলে করীম (স.) গাইড লাইন দিয়ে গেছেন সেই কতকাল আগে। অজ্ঞতার জন্যে সেসব শিক্ষা হতে আমরা বঞ্চিত রয়েছি।

যেকোন সমাজে আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। চুরি-ডাকাতি, ব্যাভিচার, মাদকাসক্তি হতে শুরু করে এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি সমাজে ছড়িয়ে পড়বে মহামারীর মতো। লক্ষ লক্ষ বনি আদম ঠাঁই নেবে ফুটপাতে, বস্তিতে। কিশোর অপরাধ হতে শুরু করে ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস হত্যা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ ও নৈরাজ্যের সূতিকাগার এসব বস্তি। এসব সর্বনাশ হতে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যথার্থ ব্যবস্থা। ইসলাম তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে এই প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।[৩৩] যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির সম্পদে সমাজের Have-nots-দের অধিকারের স্বীকৃতি, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ একযোগে এই গ্যারান্টিই দেয়।

---

৩১. ইবন হাযম, আল মুহাল্লা, মুয়াস সাতুর রিসালাহ, কায়রো, ১৪১০ হিজরী।
৩২. শাহ্ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনঃ

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহকালীন কর্মকাণ্ডের জন্যে পরকালীন মুক্তি বা শান্তির এমন দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে দুনিয়াকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে ইসলামে কর্মবীর হতে বলা হয়েছে। খৃষ্ট ধর্মে সকল পাপের ভারবহনকারী হবেন যীশু। পরকালে তিনিই হবেন পরম পরিত্রাতা। সুতরাং, তাঁর উপর বিশ্বাস ও দায়িত্ব অর্পণ করে দুনিয়ার সকল বৈধ-অবৈধ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার যেমন বাধা নেই, তেমনি বাধ্য-বাধকতা নেই উপায়-উপার্জনের এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান মেনে চলার। হিন্দু ধর্মে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুলিখিত অর্থনৈতিক আচরণ বিধিই নেই। খৃষ্টধর্ম পুঁজিবাদকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। ইহুদী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের তো কথাই নেই। রাব্বী, আচার্য ও পুরোহিতরা যাই বলুক না কেন এসব ধর্মের সাধারণ অনুসারীরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে জীবন ব্যবস্থা বলে সাদরে গ্রহণ করেছে। অন্যান্য ধর্মের অবস্থাও তথৈবচঃ।

এরই বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ ইসলামে অর্থনৈতিক সুকৃতি বা হালাল কাজের জন্যে ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় কর তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।"[৩৪]

অপরদিকে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, গরীব-দুঃখীদের উপকারে সচেষ্ট হবে না বরং হারাম কাজে অংশ নেবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"[৩৫]

মুমিন মুসলমান অদৃশ্য বা গায়েবে বিশ্বাস করে বলেই আখিরাতে বিশ্বাস তার ঈমানের অংগ। তাই ইসলামী জীবন বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতিতে আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রতি এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের শেষে মুনাজাতেও বান্দাহ আল্লাহর কাছে যুগপৎ দুনিয়অ ও আখিরাতের কল্যাণই প্রার্থনা করে। আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধে যার মনে এতটুকু ভয় ও আগ্রহ নেই তার দ্বারা দুনিয়ার যেকোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্ভব। অপরপক্ষে তার দ্বারা হালালকে অর্জন ও হারামকে বর্জন, সুনীতির

৩৪. আল-কুরআন, ৫৭:৭
৩৫. আল-কুরআন, ৯:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ এবং আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা কোনটাই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তাযকিয়া অর্জন ও তাকওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলে এবং আখিরাতকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে ইহকালের জীবনধারা খোদায়ী বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে বাধ্য এবং এই পথেই যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নীচে সংক্ষেপে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কোন অর্থনীতি ইসলামী অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হতে হলে সেই অর্থনীতিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা অপরিহার্য। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টিই ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা।

এটি স্বভাবানুকূল অর্থব্যবস্থা:

বস্তুত ইসলাম হল মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-দীনে ফিতরত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

আল্লাহর ফিতরত প্রকৃতির অনুসরণ কর: যে ফিতরত প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।[৩৬]

ইসলামের প্রতিটি আমলের মত অর্থনীতিতেও মানুষের স্বভাবের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে ও মধ্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য এক সুষম অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

ইসলামের প্রতিটি আমলের মত অর্থনীতিতেও মানুষের স্বভাবের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে ও মধ্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য এক সুষম অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

মালিকানা:

সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই।[৩৭]

অবশ্য বান্দাকে তিনি তাঁর নির্দেশিত ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন। এটাও এক ধরনের মালিকানা। একে 'আমানতী মালিকানা' বলা যায়। এখানেই পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির ব্যবধান। ইসলাম এক দিকে পুঁজিবাদের মত সম্পদে ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানাকে স্বীকার করে না; আবার সমাজতন্ত্রের মত সম্পদে ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকারও করে না। বরং ইসলাম উভয়বিধ ব্যবস্থার এক মধ্যবর্তী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

সম্পদের সুষম বন্টন ও আবর্তন:

ইসলামী অর্থব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এক স্থানে বা গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয়ে সমাজের মধ্যে সুষম আবর্তন ঘটতে থাকা। ইসলামে অবৈধভাবে সম্পদ কুক্ষিগত এবং পুঞ্জিভূত করণের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের

৩৬. আল-কুরআন, ৩০:৩০
৩৭. আল-কুরআন, ২:২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে ইহাই তা যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করতে এর স্বাদ আস্বাদন কর।[৩৮]

পক্ষান্তরে ইসলাম চায় সম্পদ যেন এক হাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।[৩৯]

অর্থ উপার্জনে ভোগ লিপ্সার অপনোদনঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল এখাবে ভোগ লিপ্সাই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য হয় না। পরকালীন সাফল্যই হল এখানে বড় কথা। সুতরাং পরকালীন সলফতা অর্জনই হল সব ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। এই মানসিকতাই মানুষকে তার কাজ যথাযথ এবং সুচারুরূপে করতে প্রেরণা যোগায়। অবহেলা, উদাসীনতা এবং আলস্য থেকে মুক্তি দেয়। পক্ষান্তরে ভোগ লিপ্সা মানুষকে ক্রমান্বয়ে নির্জীব ও উদ্যমহীন করে তোলে। ভোগের মানসিকতা বর্জন করে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন, এর দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।[৪০]

ইসলামে জাগতিক লাভালাভের স্থানঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আখিরাত অর্জনের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু জাগতিক প্রয়োজন ও লাভালাভকে উপেক্ষা করা হয়নি। সন্ন্যাসবাদকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদের উপর তা ফরয করিনি।"[৪১]

হাদীসেও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছেঃ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই।[৪২]

ইসলামের অর্থব্যবস্থায় জাগতিক বস্তুসমূহকে আল্লাহর নি'আমত হিসেবে গ্রহণ করে তা শরী'আত নির্ধারিত পন্থায় ভোগ করে শোকর আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ এবং তোমার জাগতিক হিস্যাকে তুমি ভুলে যেও না।[৪৩]

এই অর্থব্যবস্থায় জাগতিক ভোগকে অস্বীকার নয় বরং নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

তোমরা আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পসন্দ করেন না।[৪৪]

---

৩৮. আল-কুরআন, ৯ : ৩৪ – ৩৫
৩৯. আল-কুরআন, ৫৯:৭
৪০. আল-কুরআন, ২৮:৭৭
৪১. আল-কুরআন, ৫৭:২৭
৪২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ মুয়াস্সা সাতুর (৬ষ্ঠ খণ্ড), রিসালাহ, কায়রো-১৪১০ হিজরী, পৃ. ২২৬
৪৩. আল-কুরআন, ২৮:৭৭
৪৪. আল-কুরআন, ৭:৩১

Dhaka University Institutional Repository

হালাল-হারামের পার্থক্য:

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হালাল-হারাম তত্ত্ব। হালাল-হারামের ধারণা ইসলামের একটি অন্যতম বিষয়। ইবাদত থেকে রাজনীতি সর্বত্র এ নীতি পরিব্যাপ্ত। কিছু বিষয় ও প্রক্রিয়াকে ইসলাম মানুষের জন্য হালাল করেছে আর কিছু বিষয় ও প্রক্রিয়াকে হারাম করেছে। এক্ষেত্রেও মানুষের কল্যাণের প্রতিই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেসব বিষয় বা প্রক্রিয়ায় মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক কল্যাণ রয়েছে সেগুলোকে ইসলাম হালাল ঘোষণা করেছে।[৪৫] আর যেসব বিষয় ও প্রক্রিয়ায় মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক বা দৈহিক অকল্যাণ ও অঙ্গল নিহিত আছে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনীতিও এর ব্যতিক্রম নয়। একারণেই ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হাউজী, প্রতারণা এবং বস্তুর দোষ গোপন করার কোন অবকাশ নেই।

অর্থনীতিতে আযীমত ও রুখ্সত:

ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল আযীমত ও রুখ্সতের ধারণা। হালালের সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় আযীমত এবং জায়িযের সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় রুখসত।[৪৬] কেউ যদি তার অর্থসম্পদের বছরে শতকরা আড়াই ভাগ শরী'আত নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তবে তার ফরয তথা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম মু'মিনকে এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আবূ বকর, উমর (রা.) সহ উচ্চ পর্যায়ের সাহাবীগণ সকলেই এর উপর আমল করে গিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার অবস্থাই সৃষ্টি হতে দেননি।

নিয়ন্ত্রিত আয় ও ব্যয়:

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, আয় ও ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ। ইসলাম মানুষকে অবাধ ও যথেচ্ছাভাবে সম্পদ অর্জনের সুযোগ দেয় না। তেমনি হালালভাবে উপার্জিত অর্থসম্পদও যথেচ্ছা ব্যয় করার কাউকে অধিকার দেয় না। ফলে একদিকে যেমন আয়ের ব্যবস্থা হয় বহুমাত্রিক, অপরদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সব ধরনের অপচয় রোধ হয়।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।[৪৭]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।[৪৮]

---

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৪৬৬
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭
৪৭. আল-কুরআন, ১৭:২৭
৪৮. আল-কুরআন, ১৭:২৭

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের অধিকার সংরক্ষণ: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের প্রতি কেবল স্বীকৃতিই দেওয়া হয়নি বরং তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি সক্ষম নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (স.) জনৈক ভিক্ষুকের জন্য কুঠারের ব্যবস্থা করে জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতের আমলে জনৈক ব্যক্তিকে জিহাদে যাওয়ার জন্য মসজিদে নববীতে ভিক্ষা করতে দেখে নিজে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দিয়ে জনৈক ব্যক্তির খামারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।[৪৯]

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ:

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ। অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণীর অভাব এবং অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ন্যায্য পারিশ্রমিকের চেয়ে কম মজুরী দিয়ে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় তাদেরকে পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ইসলামে এই জাতীয় প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনার কোন সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে।[৫০]

জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা:

ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই জবাবদিহিতার মনোভাব গড়ে তুলতে চায়। ইসলামের অর্থব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। হাদীসে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সারকথা, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, সমাজে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার প্রচলন।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শোষণ, নিপীড়ন, দুর্বলকে নিঃশেষ করার প্রবণতা নেই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথেই ব্যয়:

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, ভোগ, বন্টন, উৎপাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউই স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যে সমস্ত বিষয় শরী'আহর দৃষ্টিতে হালাল বা বৈধ সেসবের উৎপাদন ভোগ বন্টন ও সেসব উপায়ে উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম চালিকা শক্তি হলো আমর বিল মারুফ বা সৎ কাজে আদেশ অর্থাৎ, সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং নেহী আনিল মুনকার বা অসৎ কাজে নিষেধ অর্থাৎ দুর্নীতির উচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

---

৪৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

"তারা (মুমিন মুসলমান) এমন ভাল লোক যে যদি আমি (আল্লাহ) তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজ করতে নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখে।"[৫১]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "মুমিন নর-নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে।[৫২]

হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের পছন্দসই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায় ও পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলামী অর্থনীতিতে সে সুযোগ কারো জন্যেই উন্মুক্ত থাকে না। যেসব সামগ্রীর ভোগ নিষিদ্ধ সেসবের উৎপাদন বিপণন ও বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। সুদ যেমন নিষিদ্ধ মদ ও জুয়াও তেমনি নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে অনৈসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে ইসলাম বর্হিভূত সকল মতাদর্শ বা ইজমাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ বন্টন, উৎপাদন, বিনিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই বৈধতা বিচার বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে বা উপযুক্ত ট্যাক্স দিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত নির্ধারিত কর ফি শুল্ক ইত্যাদি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন পরিমাণ আয়ই বৈধ গন্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে।[৫৩]

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ বন্টন, উপার্জন বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন শেষ সীমা বা নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন নেই। ভোগবাদী এই ব্যবস্থায় যেসব পন্থায় উৎপাদন বা যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রেও অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের স্বাধীনতা বিনিয়োগ ও বন্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্র দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখন অবশ্য সেই অবস্থা আর নেই। পুঁজিবাদের বিলাসী জীবন ও ইন্দ্রিয় আসক্তির মোহের জোয়ারে সমাজতন্ত্র ভেসে গেছে। ইসলাম এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করে না। বরং ইসলামের দাবীই হলো অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে শরী'আহর বিধান মান্য করা। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা হারাম বা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

---

৫১. আল-কুরআন, ২২:৪১

৫২. আল-কুরআন, ৯:৭১

৫৩. শাহ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জন, বন্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ অবৈধ উপায়ে আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুলুম চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রমসমূহ এসব অবৈধ বা হারাম অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফসল এবং তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন সম্পদ সাধারণতঃ অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন:

আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উপরেই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। বস্তুতঃ সমাজে কি ধরনের অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে আয় ও সম্পদ বন্টন সুষ্ঠু হবে, না বৈষম্যপূর্ণ হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সমাজে আয় ও ধনবন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আকিদা মুতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই এর স্রষ্টা মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। এখানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয় ও ভোগের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ব্যয়েরও সুযোগ নেই। এই মূল দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসে সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।"[৫৪]

"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।"[৫৫]

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।"[৫৬]

"অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"[৫৭]

সুতরাং, ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার আলোকেই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই একাধারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং বেইনসাফী হতে জনগণ রক্ষা পাবে।

---

৫৪. আল-কুরআন, ৪:২৯
৫৫. আল-কুরআন, ৫৯:৭
৫৬. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৫৭. আল-কুরআন, ৯:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন:

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব মিসকিন ঋণগ্রস্ত মুসাফির, ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম বিশ্বে আজ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফা-ই-রাশিদূন (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটা দপ্তর ছিল।[৫৮] রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্যে। রাসূলে করীমের (স.) মৃত্যুর পর বিরাজমান দুঃসময়ে মিথ্যা নবী দাবীকারীদের বিদ্রোহের মুখেও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "যদি কারও কাছে উট বাধঅর রশি পরিমাণ যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।[৫৯] এই ঘোষণার সুফল পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই। গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হলো সেদিনের আরবে সর্বহারা শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

উশরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় গ্রামীণ জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মাত্রাও হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থায় কৃষি পণ্যের আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হয়। এই পদ্ধতি এজন্যেই আরও উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। আজকের খাজনা ব্যবস্থায় বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের প্রদেয় খাজনা ও উৎপন্নের সঙ্গে ব্যবধান রয়েছে দুস্তর। পক্ষান্তরে উশর আদায় পদ্ধতিতে প্রান্তি চাষী, ক্ষুদে চাষী এমনকি বর্গাচাষীরাও রেহাই পায় সঙ্গত কারণেই। এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই নিশ্চিত হয়।

বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা:

বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত অর্থ-সম্পদই বায়তুল মাল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। অর্থাগমের উৎস ও ব্যবহার বিধির বিচারে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অর্থ সম্পদের উপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-এলাকা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে।

---

৫৮. S.A. Siddiqui, Public Fincance in Islam, 1962, P. 160

৫৯. উদ্ধৃতঃ শাহ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত না হয় সেজন্যে বায়তুল মাল হতেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। রাসূলে করীম (স.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুলাফা-ই-রাশিদূন (রা.) একে আরও সুসংহত করেছিলেন।

বায়তুল মালের অর্থ যেসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্যে নির্দেশ রয়েছে সেগুলো হলো:

১. সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন;

২. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ;

৩. ইয়াতীম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন;

৪. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান;

৫. জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ;

৬. করযে হাসানা প্রদান এবং ;

৭. দারিদ্র্য বিমোচনে ও সমাজকল্যাণ।

বায়তুল মাল হতে কোনক্রমেই অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বা শাসকের ভোগ-বিলাসের জন্যে ব্যয় করার বিধান নেই। অথচ আজ একদিকে বনি আদম ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায়, শীতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা জনগণের দেয়া টাকায় ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি এর প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। খলীফা হযরত উমার (রা.) তাঁর গভর্ণরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলমের নিব সরু করে নিতে আর কাগজের মার্জিনেও লিখতে।[৬০] উদ্দেশ্য ছিল সরকারী অর্থের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। অথচ আজ সরকারী অর্থ তছরূপের পাশাপাশি অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। এর প্রতিবিধানকল্পে আক্ষরিক অর্থেই বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে জনগণের তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ অবশ্যই বাধ্যতামূলক হতে হবে যেমন ছিল খুলাফা-ই-রাশিদার (রা.) যুগে।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন:

আজকের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দু'শ বছরের বেশী সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকা শক্তি। সুদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুদের মারাত্মক যেসব অর্থনৈতিক কুফল ইতিমধ্যেই ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেসব রীতিমত ভীতিপ্রদ। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:[৬১]

৬০. মাওলানা আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১, পৃ. ২৫৭

৬১. শাহ্ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪–২৫

Dhaka University Institutional Repository

১. সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে;

২. সামাজিক শোষণ বিস্তৃত, ব্যাপক ও অব্যাহত থাকে;

৩. ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়;

৪. মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়;

৫. সম্পন্ন ও সচ্ছল কৃষকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে পরিণামে ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হয়;

৬. একচেটিয়া কারবারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে;

৭. সুদের হার কখনও স্থির থাকে না, ক্রমেই এই হার বেড়ে যায়, ফলে শোষণের মাত্রাও বাড়ে;

৮. ব্যবসায় চক্র (Business cycle) সুদেরই সৃষ্টি যার ফলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ও সুস্থ বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়;

৯. সমাজে বিলাসপ্রিয়, অকর্মণ্য ও ভোগী লোকের সৃষ্টি হয়;

১০. কর্মসংস্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়, সুলভে মূলধন না পাওয়ায় বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগে ভাটা পড়ে;

১১. মজুদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সুদ অন্যতম প্রতিবন্ধক;

১২. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলাপী ঋণের বিপুল বোঝা শেষ অবধি জনসাধারণের কাঁধেই চাপে;

১৩. জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে;

১৪. বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায় সুদের কারণেই;

১৫. অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মুখ্য কারণ সুদ; এবং

১৬. অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকও সুদ।

এসব কারণেই রাসূলে করীম (স.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুদ উচ্ছেদের জন্যে জিহাদ করে গেছেন।

বিগত ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশে তো বটেই, এমনকি অমুসলিম দেশেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সফলতার সাথে চালু হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিপরীতে এই ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করে চলেছে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। তাই ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন একেবারে অপরিহার্য কর্মসূচীর

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে পড়ে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াহর আলোকে হালাল-হারামের পার্থক্য অনুসরণ, অংশীদারীত্বমূলক অংশগ্রহণ, শরী'আহ্ বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, যাকাত আদায় করা, লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের শর্তে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা এই ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

বীমার ক্ষেত্রেও ইসলামী পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কারণ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অতি অবশ্যই ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মানুষ তার ব্যবসায়ের, নিজের জীবনের ও পণ্যের নিরাপত্তা চায়। নিরাপত্তার এই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা। এই অবস্থার অবসানকল্পে গড়ে উঠেছে শরী'আহসম্মত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী।

করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তনঃ

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে করযে হাসানা ও মুদারিবাত অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে এ ছিল সমকালীন অর্থনীতিতে এক বলিষ্ঠ ও ভিন্নতর পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বৈপ্লবিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাসূলে করীমের (স.) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরের বেশী এ দু'টি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযত চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য।[৬২]

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, কৃষিকাজের জন্যে সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে করযে হাসানা নেবার প্রথা চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু হতে। এজন্যে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ মন-মানসিকতার দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া বায়তুল মাল হতেও করযে হাসানা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "কে সেই লোক যে আল্লাহ তা'আলা করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত আছে? কেউ যদি দেয় তবে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।"[৬৩]

মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য অবদান। মুদারিবাতের গুরুত্ব এজন্যে যে, এই পদ্ধতিতে ব্যবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অংশ বা হার অনুযায়ী উভয়ের

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬৩. আল-কুরআন, ২:২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু মুনাফা না হলে কেউ কিছু পাবে না। যদি কোন কারণে লোকসান হয় তাহলে তা বহন করবে সাহিব আল্-মাল বা মূলধন বিনিয়োগকারী। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, কল-কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে মূলধনের সংকট হ্রাস পাবে। ফলে সুদী ব্যাংক ও পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম, এমনকি অমুসলিম দেশে পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে মূলতঃ এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই। তবুও ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে সাধারণভাবে করযে হাসানা ও মুদারিবাতের সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক।

ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগঃ

শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই ভাই এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্য। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"- শ্লোগানসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এখানে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি জমির মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ[৬৪]

১. উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে;

২. মৌলিক মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে;

৩. কাজে নিযুক্তির পূর্বে শ্রমিকের সাথে যথারীতি চুক্তি হবে এবং তা যথাসময়ে পালিত হতে হবে;

৪. শ্রমিকের অসাধ্য কাজ তার উপর চাপানো যাবে না;

৫. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নীচে মজুরী নির্ধারিত হবে না;

৬. উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের দিতে হবে;

৭. পেশা বা কাজ নির্বাচন ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কে দর-দস্তুর করার পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রমিকের থাকবে;

৮. অনিবার্য কারণ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনার প্রেক্ষিতে কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে শ্রমিকের উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করা চলবে না;

৯. মালিকপক্ষ দুর্ঘটনা ও ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে;

১০. দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;

১১. অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের জন্যে উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে;

---

৬৪. শাহ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬–২৭

Dhaka University Institutional Repository

১২. পেশা পরিবর্তনের অধিকার শ্রমিকের থাকবে;

১৩. পরিবার গঠনেরও অধিকার তার থাকবে;

১৪. স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের অধিকার থাকবে;

১৫. শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের অধিকার থাকবে; এবং

১৬. শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপর্যুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এই নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য কোন অর্থনীতিতে এই ধরণের নীতিমালা অনুসরণ তো দূরের কথা, এই জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বা গ্রহণেরই প্রশ্ন ওঠে না। ইসলামী অর্থনীতির সাথে এখানেই অন্যান্য অর্থনীতির মৌলিক তফাৎ।

ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়নঃ

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নানা ধরণের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষি বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পায় তখন বহু বড় শিল্পপতি হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। নব্য জমিদাররা বহু ক্ষেত্রেই শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। কৃষি কাজে জমির পূর্ণ ব্যবহারে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে বহু দেশেই। একই সঙ্গে লর্ড মার্কুইস পীয়র মনসবদার জমিদার জায়গীরদার তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদের শোষণ বাড়তে থাকে।

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, ব্যক্তিকে জমি থেকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানা আনা হয়েছে। এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। বন্দী শিবির বা কনসেনট্রেন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে আরও বহু সহস্রকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। মালিকানা বঞ্চিত কৃষকদের রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারে জবরদস্তি করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে তাদের ভরণ-পোষণের ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি।

এই উভয় প্রকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্ট না হয় সেজন্যে ইসলাম তার অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিল। আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "জমি আল্লাহ তা'আলার। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারত্ব দান করে থাকেন।"[৬৫]

৬৫. আল-কুরআন, ৬:১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি ভূমি মালিকের সম্পর্ক। কোন প্রকার মধ্যস্বত্বের অবকাশ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ পঙ্গু অসুস্থ শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা নিজে চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে।

আজ কিছু দেশ প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে ফসলের দাম কমে যাবার ভয়ে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। এর প্রতিবিধানের জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত না রাখতে ইসলামে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ইসলাম।

উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নঃ

মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর আর্বিভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। কোন কোন ধর্মে পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। হিন্দু ধর্মে চালু ছিল যৌথ পরিবার প্রথা। এই প্রথা দু'টির মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ম নজর ছিল হিন্দু, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মের। কেননা সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে না বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে যারা অর্থ বলেই সমাজের প্রভূত্ব লাভে সমর্থ হবে। এরাই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরণের সমাজবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়।

এরই প্রতিবিধানের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল-কুরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন।[৬৬] অথচ দেখা যায় মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ আইন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে না। ছলে-বলে-কৌশলে ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধুদের, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের, বোনদের, খালা-ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এর প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত সমাজে যুলুম ও বঞ্চনা চলতেই থাকবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয়ে রইবে হাজার হাজার বনি আদম। এ অবস্থা নিসরনের জন্যে ইসলামী মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্চনীয় তার সঠিক প্রেক্ষিতেই।

---

৬৬. আল-কুরআন, ৪:১১–১২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়িক অসাধুতা ও সব ধরণের জুয়া উচ্ছেদঃ

সকল প্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেশের সরকার খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ব্যবসায়ীরা হয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করে অথবা দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। কোন কোন দেশে তো ব্যবসায়ীরা অবৈধ সুযোগ লাভের জন্যে সরকারকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে থাকে অথবা মোটা অংকের ঘুষ দেয়। অবস্থার আজ এতদূর অবনতি হয়েছে যে কয়েকটি দেশে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়ীরা রীতিমতো ছোট-খাট সেনাবাহিনী পুষে থাকে এবং সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। ইসলামে মাদক দ্রব্য ও নেশার সামগ্রীর ব্যবসায় শুধু নিষিদ্ধ নয় বরং চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরীও নিষিদ্ধ। ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেয়া, নকল করা প্রভৃতি জঘন্য ধরনের অপরাধ। মজুতদারীর মাধ্যমে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয় এবং হেন বস্তু নেই যা ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই মজুত করে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনগণের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বারবার। ব্যবসায়িক অসাধুতার ফলেই জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে নিদারুণ দুর্ভোগ। এমনকি বুলেটের আঘাতে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সরকারের রাজস্ব হ্রাস পায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, "যারা ওজনে কম দেয়, পরের জিনিস ওজন করে নিলে পুরো গ্রহণ করে কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয় তখন পরিমাণে কম দেয় এরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।"[৬৭]

মজুতদারী থেকে ক্রমেই মুনাফাখোরীর মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। উপরন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে চোরাকারবার ও কালোবাজারের যোগফল যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে তলাহীন পাত্রের মতো করে ফেলতে সক্ষম। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে সব ধরণের ব্যবসায়িক অসাধুতা শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং যারা এসব গণস্বার্থবিরোধী ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাজে লিপ্ত তাদের সমুচিত শাস্তিরও বিধান রয়েছে। কেননা কেবলমাত্র এভাবেই আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে জুয়াকে তার সর্ববিধ রূপে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্র হতে এর উচ্ছেদ না হলে ইসলামী অর্থনীতি তার প্রকৃত কল্যাণধর্মী রূপ বাস্তবায়নে পুরোপুরি সমর্থ হবে না। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "হে মুমিনগণ! জেনে রাখ মদ, জুয়া, মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।[৬৮]

---

৬৭. আল-কুরআন, ৮৩:১–৩

৬৮. আল-কুরআন, ৫:৯০

Dhaka University Institutional Repository

মুখ্যতঃ

তিনটি কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে সব রকমের জুয়া ও ফটকাবাজারী (Speculation) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ জুয়ার কারণে প্রভূত অর্থের অপচয় ও মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয়। দ্বিতীয়তঃ জুয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অপরাধের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র জুয়ার কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ, মারামারি এবং খুন-জখম সংঘটিত হচ্ছে এরকম উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। তৃতীয়তঃ জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোককে প্রতারণা করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই ইসলামে সকল ব্যবসায়িক অসাধুতা নিষিদ্ধ ও সব ধরণের জুয়া উচ্ছেদের জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নেহী আনিল মুনকারের এই নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতেরও কল্যাণ ও নাযাতও নিশ্চিত করে।

ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপঃ

ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুবিচার তথা আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার এবং আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণও গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারুফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে।[৬৯] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুনীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং একই সঙ্গে আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরণের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। রাষ্ট্র এই উপায়েই সুদ-ঘুষ-মুনাফাখোরী মজুতদারী চোরাচালানী, কলোবাজারী পরদ্রব্য আত্মসাৎ সব ধরনের জুয়া হারাম সামগ্রীর উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সকল প্রকারের অসাধুতা প্রভৃতি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল নিপীড়ন ও শোষণমূলক কাজ সমূলে উৎপাদন করতে পারে।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকলে তার ব্যবহার সর্বোত্তম হবে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই তা থেকে সুবিধা বা উপকার পাবে সে সকল উপায়, উপকরণই রাষ্ট্রের জিম্মাদারীতে থাকতে পারে। রাষ্ট্র যাকাত ও উশর আদায় এবং তার উপযুক্ত বিলিবন্টন, বায়তুলমালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির যথাযথ প্রয়োগ, করযে হাসানা ও মুদারিবাত ব্যবস্থার জন্যে আইন তৈরী এবং নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একাজে রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং সমাজে যুলুম ও বঞ্চনার সয়লাব বয়ে যাবে।

---

৬৯. আল-কুরআন, ৩:১০৪/৩:১১০

Dhaka University Institutional Repository

একারণেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান রয়েছে ইসলামী অর্থনীতিতে। একই সাথে বেশ কিছু সম্পদের সামাজিক মালিকানাও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে।

সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা:

যেকোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সমাজকল্যাণ কর্মসূচী ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই ইসলামী অর্থনীতির সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাত্মক জোর এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে বায়তুল মাল হতে ন্যূনতম মাসোহারা দেয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধা প্রদানও সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে যে নির্দেশ রয়েছে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে পরলে গোটা সমাজদেহে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর।

জনকল্যাণের জন্যে ইসলামে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পদে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। ইসলামেই সর্বপ্রথম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।"[৭০]

"তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।"[৭১]

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণের তথ্য জনসাধারণের হক আদায়ের জন্যে এই রকম জোরালো তাগিদ বা নির্দেশনা নেই। সেখানে রাষ্ট্র বা সরকার জনকল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করে মর্জিমাফিক। কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শরীয়াহর দাবী অনুসারেই রাষ্ট্র ও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবেই দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য। এই সমাজে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যেমন বৈধ ও অবৈধের বা হালাল-হারামের প্রশ্ন তুলে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তেমনি সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে সমাজে সব বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানও নিশ্চিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

---

৭০. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৭১. আল-কুরআন, ১৭:২৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। তিনিই মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা করেছেন। এই মহান দায়িত্ব (খিলাফত) পালনের জন্য আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন এক অজেয় শক্তি-'জ্ঞান' (হিকমত)। এই 'জ্ঞান'-শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জীব এবং আল্লাহর ফিরিশতা থেকেও মানুষকে বড় ও মহৎ করেছে। জ্ঞান বিশিষ্ট দায়িত্বশীল প্রাণী হিসেবে মানুষকে দিতে হবে তার আজীবন কাজের হিসেব-নিকেশ আল্লাহর কাছে। কাজেই মানুষকে এক সুনির্দিষ্ট জীবন-ব্যবস্থা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে চলতে হবে এ দুনিয়াতে; অসৎ প্রবৃত্তির তথা শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হবে, উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে জীবনের এক মহা পরীক্ষায়, জয়ী হতে হবে এই সংগ্রামে। আল্লাহর প্রতিটি বান্দার নিকট জীবন ও মৃত্যু বিশেষ অর্থপূর্ণ। মৃত্যু দ্বারা সীমিত এই পার্থিব জীবন বৃহৎ এবং অনন্ত জীবনের একাংশ। কিন্তু এই পার্থিব ও কর্মময় জীবনের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করছে বৃহৎ জীবনের সাফল্য।

আল্লাহর জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে, কে মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৎ কর্মশীল।[৭২] এই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি মানবকে পথও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, "তারা (মানুষ) আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না এবং আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন কাজে তারা আদিষ্ট হয় নাই।"[৭৩] যে ব্যক্তি নিজের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম, স্বপ্ন-সাধনা সব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয়, আল্লাহর 'ইবাদতে' সে নিযুক্ত রয়েছে; আল্লাহর সে প্রকৃত সেবক।

একজন মুসলমান ও তার সমাজ:

মুসলমান একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া আর কারোর দাসত্ব করবে না। মুসলমানের মস্তক শুধু একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে অবনত হয়। আল্লাহ তার একমাত্র প্রভু ও উপাস্য। সমাজে তার অধিকার ও অন্য মুসলমান বা মানুষের অধিকার একই। সে বিশ্বাস করে "মনুষ্য সম্প্রদায় এক পরিবারভুক্ত" এক মানব ও মানবী হতে সৃষ্ট; বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পরিবারভুক্ত হলেও সব মুসলমান ভাই ভাই, একে-অপরকে ভাই বলে জানতে হবে। বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোন ভেদাভেদ নেই। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের পেশা থাকতে পারে, কিন্তু সেই পেশাগত পার্থক্য শ্রেণীগত পার্থক্যে পরিণত হবে না। ইসলামী সমাজ এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা হবে যেখানে বিভিন্ন পেশাগত লোক এমন এক মৈত্রী ও আত্মীয়সূত্রে আবদ্ধ থাকবে যে, সেখানে থাকবে কেবল একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায় 'মানুষ'।

---

৭২. আল-কুরআন, ৬৭:২
৭৩. আল-কুরআন, ৯৮:২

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত যোগ্যতা, দৈহিক শক্তি এবং উপার্জনক্ষমতা দিয়ে মানুষের মূল্য এখানে নিরূপিত বা সমাজে তার স্থান নির্ণীত হবে না। আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি যে কৃতকর্মের দিক দিয়ে উত্তম এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। সমাজে সে-ই হবে সম্মানিত ব্যক্তি যে কর্তব্যকর্মে সচেতন এবং কৃতকর্মে উত্তম। অর্থের মাপকাঠি, বংশগৌরব বা কল্পিত আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে সমাজ শাসন করবার কোন অধিকার কারো নেই। সৎকর্মশীল, দায়িত্ববোধে সচেতন, কার্যগত যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ঈমানদার ব্যক্তিই হবে সমাজ সেবার উপযুক্ত এবং সমাজে বরণীয়।[৭৪]

একজন মুসলমানের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলো সমষ্টির কাজেই নিয়োজিত হতে হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি-অধিকারবোধ কোনক্রমেই জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারকে খর্ব বা হ্রাস করবে না। যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে বিরোধ বাধবে সেখানে সমষ্টির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যক্তি যখন তার নিজস্ব অনুভূতি ও প্রতিভাকে সুশৃংখলিত করে বৃহত্তর অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে, প্রতিভাবে জনগণের তথা আল্লাহর কার্যে নিয়োজিত করবে, তখনই ব্যক্তি-অনুভূতি হবে ধন্য, প্রতিভা হবে সুষমামণ্ডিত এবং ব্যক্তিত্ব হবে ভাস্বর।

ইসলামী সমাজ একটি দালান ঘর সদৃশ। কতকগুলো ইটের সাজানো সমষ্টি নিয়ে যেমন দালান ঘর, বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত মুসলমান নিয়েও তেমনি গঠিত হবে একটি ইসলামী সমাজ। ইটের আকৃতির উপরে দালান ঘরের যেরূপ প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিস্বত্তার উপরে তেমনি সমাজের প্রকাশ ঘটবে। সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে খুব কমই পার্থক্য থাকবে। ইসলামী সমাজ একটি দেহ। মুসলমানগণ এর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ। একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে যেমন সম্পূর্ণ দেহ অসুস্থ হয় তেমনি একজন মুসলিমের অসুবিধে হলে সেটা গোটা সমাজেরই অসুবিধে। ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থ এখানে এক। একজন মুসলমান নিজের জন্য যেটা ভাল মনে করবে অপর মুসলমানের জন্যও তা ভাল মনে করতে হবে। এ যদি সে করতে না পারে সে প্রকৃত মুসলমান নয়, আল্লাহর প্রতি সে প্রকৃত বিশ্বাসীও নয়। মুসলমানগণ নির্বিশেষে একে অপরের সহায়ক ও রক্ষক।[৭৫] বিশ্বাসীরা একে অন্যের ভাই ছাড়া কিছুই নয়।[৭৬]

সমাজে ব্যক্তির যে কাজ হবে তা আত্মকেন্দ্রিক নয়; ব্যক্তির স্বার্থ, ব্যক্তির সুখ ও সুবিধার জন্যই ব্যক্তি কাজ করবে বা কাজের প্রেরণা পাবে এরকম ধারণা কোন কালেই মনে স্থান পাবে না। ইসলামী সমাজ ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিযোগিতার উপর স্থায়ী হতে পারে না। ব্যক্তি কর্মের প্রেরণা পাবে, তার স্বপ্ন ও সাধনা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর নির্দিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যক্তির লক্ষ্য হবে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, এমন এক সমাজ স্থাপন, যেখানে "সবাই সুখে থাকতে পারে, সকল জনতাই যেন বৃহত্তর কল্যাণের সুখ আস্বাদন করতে পারে।"

---

৭৪. অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, 'ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা', ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৫৬

৭৫. আল-কুরআন, ৯:৭১

৭৬. আল-কুরআন, ৪৯:১০

Dhaka University Institutional Repository

"যে পর্যন্ত তোমরা (বিশ্বাসীরা) ভালবাসার বস্তুকে অকাতরে আল্লাহর জন্য দান ও ব্যয় করতে সক্ষম না হবে সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে না।"[৭৭]

"জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে এই সব লোকই বাস্তবিক কল্যাণবর্তী।"[৭৮]

আল-কুরআনের এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক কাজের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন এবং তাহলে সেই কাজ হবে জনকল্যাণমূলক। ভালবাসার বস্তুকে অকাতরে দান ও ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ অভাবমুক্ত। আল্লাহর জন্য ব্যয় করার নির্দেশের অর্থ হল মানবসমাজের উন্নতির জন্য ব্যয় করা। মুসলমানদের লক্ষ্য হবে একই আল্লাহর আনুগত্যে এমন একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পৃথিবীর লোক নিজেদেরকে একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করবে।

পদগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের সৃষ্টি করবে না। কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে আপাতত একজন অপর জনের চেয়ে সে সমাজের বৃহত্তর কাজে লাগার জন্য নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করবে। সমাজের ক্ষুদ্রতর কাজ যারা নিয়ে থাকবে, তাদের কাছ থেকে কোন অবস্থাতেই বিশেষ মর্যাদার ও সুযোগ-সুবিধার দাবিদার সে হবে না। প্রভূত্ব ও দাসত্বমূলক মনোভাব সমাজে থাকবে না। কর্মদক্ষতা ও পদগত মর্যাদার দিক দিয়ে একজন রাষ্ট্রনায়ক ও একজন উষ্ট্রচালক হতে পারে। কিন্তু তারা পরস্পর ভাই, একই আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষ হিসেবে একই রকম সুখ-সুবিধার ভাগীদার। একজন অপরজনের কাছে হীনমন্যতা স্বীকার করবে না, উভয়েই সমাজের সেবক, আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের জন্য উভয়কেই জবাবদিহি করতে হবে। বরং যারা অধিকতর কর্ম ও যোগ্যতার অধিকারী, সমাজের প্রতি কর্তব্যও তাদের বেড়ে যাবে বেশি, আল্লাহর কাছে নিজের কাজের জবাবদিহির জন্য তারা বেশি ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকবে।[৭৯]

'তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন; তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনিই ক্ষমাশীল দয়ামত।'[৮০]

ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী:

আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে এবং এই দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে সবই আল্লাহর। আলো, বাতাস, বৃষ্টি, সাগর, নদী, গিরি-পর্বত,

---

৭৭. আল-কুরআন, ৩:৯২
৭৮. আল-কুরআন, ৩:১১৪
৭৯. অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৮০. আল-কুরআন, ৬:১৫

Dhaka University Institutional Repository

দিবস-রজনী, চন্দ্র-সূর্য সবই আল্লাহর সৃষ্টি; আর এই সৃষ্টিসমূহ সকল মানুষের জন্য। এসবের মালিক আল্লাহ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর দেয়া এই সম্পদসমূহের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং নিজেদের প্রয়োজনে সেগুলো কাজে লাগাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্পদ হল 'মানুষের সৃজনী ক্ষমতা ও কর্মশক্তি'। আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের সৃজনী শক্তির ছোঁয়া পেয়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী ঐশ্বর্যে পরিণত হয়। প্রায় প্রত্যেক লোকই কম বেশি এই কর্মক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে আসে। মানুষের এই সৃজনীশক্তি সব মানুষের তথা সমগ্র সমাজের জন্য। "মানুষ সম্প্রদায় একই জাতি", বিশ্বাসীরা একে অপরের ভাই, রক্ষক ও সহায়ক। মানুষের যুগান্তকারী প্রতিভা গোটা জাতি তথা সমগ্র মানুষেরই সম্পদ।[৮১]

সমাজ হল ব্যক্তির সমষ্টি। ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ হবে এক। সমাজের জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন, আবার সমাজ ছাড়া একক হিসেবে ব্যক্তির অস্তিত্ব হবে দুঃসাধ্য ও নগণ্য। কাজেই ব্যক্তির জন্য সমাজের প্রয়োজন। ইসলামী সমাজের গুরুত্ব অসীম। সমাজ ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক শক্তি সমৃদ্ধির সহায়তা করবে। ব্যক্তি যখন শিশু হয়ে পৃথিবীতে আসে, পিতা-মাতা তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সভ্যরা তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দায়িত্ব নেয়। পিতা-মাতা, শিক্ষক, ডাক্তার এবং সমাজের অন্যান্য সভ্যদের ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেই সে কর্মক্ষমতা অর্জন করে। ব্যক্তির সৃজনীশক্তি উন্মেষের এবং কর্মশক্তি বিকাশের জন্য সমাজে সুযোগ করে দিতে হবে এবং এই জন্য ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীল। যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার উন্নতির পূর্ণ সুযোগ রয়েছে সেই সমাজই কাম্য এবং সেটাই ইসলামী সমাজ। সেই সমাজেই চরম উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হবে। সুযোগের অভাবে ব্যক্তি-প্রতিভার সেখানে অপচয় হবে না বা তা অবহেলিত থাকবে না। ইসলামী সমাজেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদ "মানুষ ঐশ্বর্যের" উন্নতি ও উৎকর্ষ ঘটবে সমগ্র মানুষের তথা সমাজের কল্যাণের জন্য।[৮২]

প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর এবং তা সমগ্র সমাজ বা মানুষের জন্য। আর সমগ্র এই মানুষ হল যারা বর্তমানে রয়েছে ও যারা ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে আসবে তারা সবাই। কেবল বর্তমান মানুষই আল্লাহর দেওয়া সম্পদের সমষ্টিগতভাবে একচ্ছত্র দাবিদার হতে পারে না, ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরও অধিকার থাকবে এই সম্পদে। বর্তমান মানুষ তার উন্নত জ্ঞান ও শ্রমের দ্বারা আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদকে শুধু তাদের প্রয়োজনের জন্যই কাজে লাগাতে পারে; অপচয় বা অপ্রয়োজনীয় বিলাস-ঐশ্বর্যে, ধ্বংসাত্মক কাজে আল্লাহর সম্পদকে বিনষ্ট করবার অধিকার বর্তমান মানুষের নেই।

---

৮১. অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সম্পদসমূহ সমগ্র সমাজ তথা মানুষের জন্য। ব্যক্তি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আল্লাহর সম্পদে দাবিদার। সমাজ ব্যক্তিকে তার প্রতিভা ও কর্মশক্তি কর্মোপযোগী করে তুলতে সাহায্য করবে। ব্যক্তি তার শক্তি ও শ্রম প্রকৃতির সম্পদে কাজে লাগিয়ে যা কিছু অর্জন করবে, এই অর্জিত আয়ের ও সম্পদের উপর সম্পূর্ণ বা একচ্ছত্র অধিকারী সে হবে না বা হতে পারে না যদিও সে নিজের শ্রমেই এইসব অর্জন করেছে। কাজোপযোগী শ্রমের সুযোগ ও প্রতিভা বিকাশের জন্য সে সমাজের কাছে ঋণী। অর্জিত আয়ের কিছু অংশ সমাজেরও প্রাপ্য। ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত উপার্জিত সম্পদের অংশ আল্লাহ তথা সমাজের প্রাপ্য। অনর্থক কাজে, বিলাসে এবং অপ্রয়োজনে তা খরচ করবার অধিকার তার নেই। ব্যক্তির সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ সমাজে যাদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের এবং মানবজাতির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হবে।[৮৩]

এই নীতিই সত্য এবং মনুষ্য-সমাজের জন্য মঙ্গলকর। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "তাহাদের (যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি থাকবে) সম্পদে যাঞ্চাকারী ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে।"[৮৪]

"কত দান করিবে'? বলিয়া দাও, 'যাহা উদ্বৃত্ত তাহাই,"[৮৫]

"আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ আছে তার উচিত, যাহার ধনসম্পদ নাই তাকে দিয়ে দেয়া, যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আছে তার উচিত যার নেই তাকে দিয়ে দেয়া-রাসূলুল্লাহ (স.) এইভাবে বিভিন্ন ধনসম্পদের বর্ণনা দিলেন, যাতে আমাদের মনে হল যে "কারোই নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের উপর কোন অধিকার নেই।"[৮৬]

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আল্লাহর ভালবাসার জন্য তাদের জীবিকা থেকে আত্মীয়স্বজন, পথচারী এবং দাসের মুক্তিসাধনের নিমিত্ত নির্বিশেষে ব্যয় করবে।[৮৭] বিশ্বাসীরা অনর্থক ফুর্তি বা অপচয় করে ধনসম্পদ নষ্ট করতে পারবে না।[৮৮] কেননা অপরিমিত ব্যয়ীরা শয়তানেরই ভাইবেরাদার।[৮৯] এসব অনাচারী-অমিতব্যয়ী-অপব্যয়কারী শয়তানেরাই তাদের বিলাসভোগ চরিতার্থ করবার জন্য আল্লাহর সম্পদ নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত রাখবার চেষ্টা করে, সমাজে সৃষ্টি করে অভাব-অনটন। এই অপব্যয়কারীরা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে তাদের বিলাসিতা ও

---

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৮৪. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৮৫. আল-কুরআন, ২:২১৯
৮৬. উদ্বৃত: মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৮৭. আল-কুরআন, ৬:৬
৮৮. আল-কুরআন, ৪:২৯
৮৯. আল-কুরআন, ১৭:২৯

Dhaka University Institutional Repository

খেয়ালখুশীর লিপ্সা মেটায়। অপরপক্ষে সমাজের অধিকাংশই দারিদ্র্যের নির্মম আঘাতে পিষ্ট হয়, সমাজে সৃষ্টি হয় শ্রেণীভেদ। এক শ্রেণী ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও বিলাসের লোভে আরো বেশি পেতে চায় এবং আরো বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করে। আর এক শ্রেণী দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানসিক ঔদার্য এবং জীবনের কোমল ও সদগুণগুলি হারাতে বসে।

অভাব-অনটনই সমাজে পাপ কার্যের বৃদ্ধি ঘটায়; মানুষের মনে সদা-জাগ্রত অভাব-অনটন তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ অন্যায় কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সমাজে আসে অধঃপতন।[৯০]

কিন্তু আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা ও অপর্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহর করুণা ও দান সর্বপ্রসারী। আল্লাহ তাঁর সকল বান্দার জন্যই এই বিশ্বজগতের সৌন্দর্যসম্ভার উদঘাটিত করেছেন। পৃথিবীর উত্তম ও উপাদেয় বস্তুসমূহের উপভোগ থেকে আল্লাহর বান্দাদের বঞ্চিত করবার বা এগুলো মুষ্টিমেয়ের একচ্ছত্র ভোগের বস্তু হিসেবে রাখার ক্ষমতা ও অধিকার কারোর নেই।[৯১]

ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার "পূর্ণ ক্ষমতা ও সম্ভাবনার" বিকাশের সুযোগ পাবে; তার কর্মক্ষমতা ও শক্তি ব্যবহার করবার ক্ষেত্রও করে দেবে রাষ্ট্র। তার শক্তি ও শ্রমের দ্বারা উপার্জিত আয় থেকে প্রয়োজনানুসারে তার প্রাপ্য অংশগ্রহণ করবে। সমাজে থাকবে অপর্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্য; অভাব-অনটনের অভিশাপ সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে।

পৃথিবী ও আকাশসমূহে যে সম্পদ রয়েছে, আল্লাহই তার মালিক। ব্যক্তি হিসেবে 'মানুষ' বা ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে 'সমাজ' পৃথিবী ও আকাশসমূহের সম্পদসম্ভারের মালিকানা দাবি করতে পারে না। আল্লাহ্ এই সম্পদ-সম্ভার পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষ হল যারা বর্তমানে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে এবং যারা ভবিষ্যতে আসবে তারা সবাই। মানুষ এ দুনিয়ার মালিক বা বাদশা হতে পারে না। যে তা দাবি করবে সে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মুসলমানদের শত্রু। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনেই তা সমগ্র সমাজ তথা গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাবে। আল্লাহর সম্পদে প্রত্যেক লোকেরই শ্রম নিয়োগ করে জীবিকা নির্বাহের অধিকার থাকবে। উপার্জিত আয় থেকে নিজের প্রয়োজন মতো রেখে উদ্বৃত্ত অংশ তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।

প্রত্যেক মানুষকে মেনে নিতে হবে যে, পৃথিবীর ও আকাশসমূহের সম্পদ মানুষের কাছে আল্লাহর আমানত। নিজ স্বার্থ ও খামখেয়ালীর জন্য এই আমানত নষ্ট করবার অধিকার কোন মানুষের নেই। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে উপার্জন করবার এবং সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বাঁচবার অধিকার পাবে।[৯২]

---

৯০. আল-কুরআন, ২:২৬৮

৯১. আল-কুরআন, ৭:৩১–৩২

৯২. মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজ শান্তিপূর্ণ সমাজ। এ সমাজে মানুষ সবাই ভাই ভাই, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। মানুষ শুধু আল্লাহকেই প্রভু বলে স্বীকার করবে। মানুষ মানুষের গোলামী করবে না বা করতে দেবে না। ইসলামী সমাজে কোন শ্রেণী বিদ্বেষ থাকবে না। ইসলামী সমাজের লক্ষ্য হবে একই আল্লাহর আনুগত্যে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের কর্ম ও সাধনা থাকবে গোটা মানুষের কল্যাণের জন্য। সমাজ হবে সম্পদ ও মানব-ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ। সমাজের লক্ষ্য হবে অন্যায়-অসত্যের দলন করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠাসাধন। এই সুন্দর সমাজে মানুষ বিভিন্ন সুন্দর নামেই এক আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে সমাজে ব্যক্তি-মানুষের লক্ষ্য।[৯৩]

একটি অরাজকতা ও অশান্তিপূর্ণ সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিণত করতে হলে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে সকল কিছু শক্তি ও সম্পদের মালিক আল্লাহ-ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ নয়। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম কাজই হবে ব্যক্তি ও সমাজের মালিকানা অস্বীকার করে সেখানে আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করে নেয়া। সমাজের সকল প্রকার সম্পদ এবং সম্পদ থেকে সৃষ্ট উৎপাদন যন্ত্রসমূহে আল্লাহর মালিকানা-কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তা গোটা সমাজের কল্যাণে লাগাতে হবে। আল্লাহর সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জন করবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যক্তি তার উপার্জিত সম্পদ প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ করবে, এরপরে কোন উদ্বৃত্ত থাকলে তা আল্লাহর পথে তথা সমগ্র সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

আল্লাহর সম্পদের তত্ত্বাবধানের ভার নেবে সমস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র। সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র আল্লাহর সম্পদে কাজ করবার সুযোগ দিয়ে শ্রমগত যোগ্যতানুসারে জীবিকা নির্বাহের অধিকার নিশ্চিত করবে।

শ্রম ও বুদ্ধিগত পার্থক্য অনুসারে ব্যক্তি বিশেষের আয়-ব্যয়ের তারতম্য থাকবে। রাষ্ট্রের লক্ষ হবে যাকাত, সাদকা ও বিভিন্ন করের মাধ্যমে ব্যক্তির উদ্বৃত্ত আয় (প্রয়োজনীয় খরচ বাদে) সংগ্রহ করা। এই উদ্বৃত্ত আয় হলো মু'মিনদের কাছ থেকে আল্লাহর প্রাপ্য অংশ। এই অঅঅর্থ ব্যয় হবে আল্লাহর সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের কাজে, রাষ্ট্ররক্ষা, অভাবগ্রস্ত, অক্ষম প্রভৃতির প্রতিপালনে এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আল্লাহর সম্পদ কাজে লাগিয়ে জনজীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করলেই চলবে না, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধে করে দিয়ে ব্যক্তির তথা সমাজের নৈতিক মানোন্নয়ন করে খাঁটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতির দ্বারাই সম্ভব হবে এক ভারসাম্যময় (Equilibrium) সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

---

৯৩. আল-কুরআন, ৭:১৮০

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারণের জন্য জীবিকার্জনের অধিকার বনাম সম্পত্তি অর্জনের অধিকার:

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।[৯৪] প্রত্যেক মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন ধারণের সংস্থান এ পৃথিবীতে আল্লাহ করে দিয়েছেন।[৯৫] পৃথিবীর ও আকাশসমূহের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও ধনসম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করবার সমান অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। আল্লাহর এই সম্পদে প্রত্যেক মানুষই শ্রম নিয়োগ করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। আল্লাহর সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে প্রয়োজন মতো জীবিকার্জনের অধিকার হল মানুষের সামাজিক জন্মগত অধিকার। মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কোন মানুষ বা উৎপাদন ব্যবস্থার নেই।

নিজের পরিবার পরিজনের আবশ্যকীয় অভাবসমূহ মেটানোর জন্য পরিশ্রম করা এবং প্রয়োজনীয় জীবিকার্জন করা প্রত্যেক মানুষের তথা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। একজন লোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত সম্পদ শুধু জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যেই তা পারবে। বিলাস, জাঁকজমক বা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে উপার্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তুলবার জন্য।[৯৬] আল্লাহর সম্পদে প্রত্যেক মানুষকেই শ্রম নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় জীবিকার্জনের অধিকার ইসলাম দিয়েছে। নিছক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য কিংবা ব্যক্তিক ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য সম্পদ সংগ্রহের অধিকার ইসলামে নেই।

"পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বা ভূ-স্তরের নিচে যা কিছু ধনসম্পদ রয়েছে সব আল্লাহর।"[৯৭]

আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। এই সম্পদসমূহ আল্লাহ সকল মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমরা বলেছি যে, আল্লাহর এই সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় জীবিকার্জনের অধিকার সকল মানুষেরই রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহর এই সম্পদসমূহের তত্ত্বাবধান ব্যক্তির অধিকারে থাকবে, নাকি ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে?[৯৮]

আল্লাহর সম্পদের কর্তৃত্বভার এমন এক সংস্থার উপর থাকবে যা সমাজের প্রত্যেকের জীবিকার্জনের পথ নিশ্চিত করে দিয়ে সুন্দর, সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করবে। বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভার ও উপাদেয় বস্তুসমূহ আল্লাহর প্রত্যেক বান্দা যাতে উপভোগ করতে পারে, তার উপায় করে দিতে হবে; প্রত্যেক মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর ও শক্তিসমূহের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে তাকে আল্লাহর একজন উপযুক্ত বান্দাহ হিসেবে বাঁচবার পথ সুগম করে দিতে হবে। এই মহান ও বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যক্তির উপর

---

৯৪. আল-কুরআন, ২:২৯
৯৫. আল-কুরআন, ১১:৬
৯৬. আল-কুরআন, ৭:৩২
৯৭. আল-কুরআন, ২০:৬
৯৮. মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সম্পদের কর্তৃত্বভার ছেড়ে দেয়া তাই কোন মতেই চলে না। একক হিসেবে ব্যক্তি মানুষ দুর্বল, তার পক্ষে কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন, "বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারগুলির অধিকারী যদি তোমরা হইতে, তাহা হইলে তোমরা হাত গুটাইয়া নিতে-ফুরাইয়া যাওয়ার ভয়ে; বস্তুত, মানুষই হইতেছে কৃপণ-স্বভাবের।"[৯৯]

"তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধদিগের হাতে অর্পণ করিওনা; বরং উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।"[১০০]

মানুষ স্বভাবতই কৃপণ, মানুষ বেশির ভাগই অনুমান ও কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে; বিপথে পরিচালিত হওয়ার প্রবণতাই তাদের বেশি।

কাজেই আল্লাহর সম্পদের তত্ত্বাবধানের ভার ব্যক্তি-মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। সমাজপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উপরই থাকবে আল্লাহর সম্পদের তত্ত্বাবধানের ভার। রাষ্ট্র ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই রাষ্ট্রের ভার তারাই নেবে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। নিখিল মানুষের কল্যাণসাধনের জন্যই তাঁরা কাজ করবেন; তাঁরা সৎকাজের নির্দেশ দানের এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে জনগণকে বিরত রাখার এবং আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান সুদৃঢ় করার দায়িত্ব নেবেন।[১০১] ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাগণই পৃথিবীতে রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি বা খলীফা হবেন এবং তাঁরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।[১০২] ইসলামী রাষ্ট্র কোন বিভীষিকার বস্তু নয়। ইহা ব্যক্তি-মানুষের নিকট নিষ্পেষণযন্ত্র হবে না, এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে নিখিল মানুষের কল্যাণসাধন। আল্লাহর সম্পদের প্রাচুর্যের স্বাদ প্রত্যেক লোকই যাতে পায় তার বন্দোবস্ত করাই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

আমাদের নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বেশি দিন টিকে না থাকলেও, আমরা খুলাফা-ই-রাশিদীনের খিলাফত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা পেতে পারি। মুহাম্মদ (স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হযরত 'উমরের (রা.) শাসনামলে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে, যদিও পরবর্তীকালে তা আর পূর্ণ বাস্তবায়নের সুযোগ পায় নি। হযরত 'উমরের (রা.) দিওয়ান (পেনসন ব্যবস্থা) থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র জনগণের জীবিকা সংস্থানের বন্দোবস্ত করে দেয়া রাষ্ট্রেরই একটি কাজ ছিল। তৎকালীন মুসলমানদের আরেকটি প্রধান উপায় ছিল জিহাদ। আর জিহাদ পরিচালনার ভার ছিল রাষ্ট্রের উপর। সমস্ত মুসলমান সমাজ ছিল মুসলিম সেনাবাহিনী। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিই জিহাদের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারতো। যুদ্ধ হতে লব্ধ ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও

---

৯৯. আল-কুরআন, ১৭:১০০

১০০. আল-কুরআন, ৪:৫

১০১. আল-কুরআন, ৩:১১০

১০২. আল-কুরআন, ২১:১০৫

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের (স.) জন্যে (রাষ্ট্রের জন্য) রেখে বাকী সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও যুদ্ধে শহীদ সৈনিক পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো। আর তা হত রাষ্ট্রেরই তত্ত্বাবধানে।

আরব উপমহাদেশে কৃষিযোগ্য ভূমি খুব কমই ছিল। হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে যখন সিরিয়ার ও ইরাকের বহু কৃষিযোগ্য ভূমি মুসলমানদের অধিকারে আসে তখন হযরত উমর এই কৃষিযোগ্য ভূমি ব্যক্তি-তত্ত্বাবধানে না রেখে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন। তাঁর সে ব্যবস্থা ছিল মানবিক ও কুরআন কর্তৃক সমর্থিত যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এটাই ছিল তাঁর ঘোষণা: জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের জন্যই শুধু জমি নয়, বরং ভবিষ্যতে মুসলমানদের বংশধরদের জীবিকা সংস্থানের জন্যই এ জমি থাকবে; তা না হলে ভবিষ্যতে জীবিকা সংস্থানের জন্য তাদের কোন জমিই থাকবে না। আগুন, পানি এবং পশুচারণ ভূমিও ছিল সর্বসাধারণের জন্য।[১০৩]

আরব ছিল মরুময়, কৃষি ছিল নগন্য, পশু পালন ছিল এর প্রধান উপজীবিকা। এমতাবস্থায় ঘাস, পানি ও পশু চারণের ভূমি জীবিকা সংস্থানের জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন ছিল। কাজেই ব্যক্তির হাতে এসব ছেড়ে না দিয়ে জনগণের জীবিকা সংস্থানের জন্য এগুলোকে রাষ্ট্রের অধীনে রাখা হয়েছিল। তৎকালীন আরবের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। জটিল শ্রম-বিভাগ (Division of Labour) ও যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্যা তখন ছিল না। সেই সরল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘাস, পানি, আগুন, পশুচারণ ভূমি, কৃষিযোগ্য জমি এবং তৎকালীন উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আয়ের সংস্থান (জিহাদ) রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল-এসব তথ্য থেকে আমরা এই সত্যই পাই যে জনগণের জীবিকা সংস্থানের জন্য আল্লাহর সম্পদ (উৎপাদন ব্যবস্থার উপায় ও যন্ত্রসমূহ) রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেই থাকবে, ব্যক্তির অধীনে নয়।

হযরত উসমানের (রা.) খিলাফতকালে তাঁর দুর্বল নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের ফলে আবার গোষ্ঠীগত পুরানো দ্বন্দ্ব মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের এক পক্ষে দাঁড়ায় সে সব মানুষ, যাঁরা প্রথম থেকেই ধন, মান, প্রাণ দিয়ে ইসলামের প্রচার এবং সাম্যবাদী ইসলামী শাসন ও রাষ্ট্রের পত্তনে সাহায্য করেছিলেন (মুকাতিলা)। অপরদিকে দাঁড়ায় শেষ মুহূর্তে যারা ইসলাম কবুল করেছিল তারা, যারা এককালে ছিল ঘোরতর ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের কুৎসায় রত। এই শেষোক্ত দলটি মক্কার একচেটিয়া ব্যবসায়ী, পুঁজিবাদী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা জীবনমরণ সংগ্রাম করেছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য। অবশেষে সংগ্রামে না পেরে বাধ্য হয়ে তাঁরা ইসলামের অনুগত হয়, বিনষ্ট হয়ে যায় তাঁদের এতদিনের সমাজবিরোধী প্রতিপত্তি। হযরত উমরের (রা.) শাসনকাল পর্যন্ত তাঁরা বাধ্য হয়ে এবং সুযোগ না পেয়ে শান্ত ছিল, যদিও তাঁদের অন্তরে পূর্বপ্রতিষ্ঠা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। হযরত উসমানের (রা.) খিলাফত তাঁদের সে সুযোগ করে

---

১০৩. Raihan Sharif, Islmic Social Frame Work, P. 148

Dhaka University Institutional Repository

দিল। ভূমি ছিল এতদিন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন সম্পদ। হযরত উসমান এই সুযোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রবর্তন করলেন "ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠা"। এই ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল, বাধ্য হয়ে যারা ইসলামে দাখিল হয়েছিল তারা ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে। সম্পদ কুক্ষিগত হতে থাকে তাঁদের মধ্যে, সৃষ্টি হয় প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র। সূত্রপাত হয় শ্রেণী বিদ্বেষ, বিদ্রোহ ও দ্বন্দ্বের; এই দ্বন্দ্বে প্রথম দলের পরাজয় ঘটে, শেষ হয় ইসলামী গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ। হযরত উসমানের (রা.) দুর্বলতার সুযোগে হযরত মু'য়াবিয়া সিরিয়ার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় জমির মালিক হয়ে উঠেন; এই মু'য়াবিয়াই নব লব্ধ সম্পদ দ্বারা হযরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পান এবং সেই শক্তি দ্বারাই তিনি চিরতরে বিনষ্ট করেন ইসলামী গণতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজ।[১০৪] ব্যক্তির হাতে সম্পদ চলে যাওয়ার কী বিষময় ফল!

রাষ্ট্র কর্তৃক আল্লাহর সম্পদের তত্ত্বাবধান কি?

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হল মানবতার উন্নতি সাধন। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হবে সমাজ থেকে অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের উচ্ছেদ সাধন করে সমাজের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে আল্লাহর সম্পদ, বিশেষ করে উৎপাদন যন্ত্রসমূহ (Means of production) সমাজ তথা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আল্লাহর এই সম্পদ থেকে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের শ্রম নিয়োগ করে জীবিকা সংস্থানের অধিকার থাকবে। ইসলামী বিধান অনুসারে উপার্জিত আয় জীবন ধারণের ও দক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যাপারে খরচ করবার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে। প্রয়োজনীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত যা থাকবে তা থেকে যাকাত, সাদকা, ট্যাক্স হিসাবে রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হবে। প্রয়োজন হলে সমস্ত "উদ্বৃত্তই" জনগণের কল্যাণে আল্লাহর পথে দিয়ে দিতে হবে। জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ থাকবে ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে তার বংশধরগণ। ভিটেমাটি, ঘরবাড়ী, বাগান, আসবাবপত্র, গহনাপত্র, গৃহপালিত পশু, গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি সম্পদ এবং কিছু সঞ্চিত অর্থ (যাকাত, ট্যাক্স ইত্যাদি দেয় দেওয়ার পর) প্রভৃতি ব্যক্তির কাছে থাকবে। এই সমস্ত সম্পদ ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার আইন অনুসারে তার বংশধরগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ায় কোন অসুবিধে থাকবে না।[১০৫]

দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজবাদ। সমাজবাদের ধারণা পৃথিবীর আদিম কাল থেকে বর্তমান থাকলেও এর বাস্তব রূপায়ণ অতি অল্পকাল থেকে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হল ব্যক্তিক শোষণের উচ্ছেদ সাধন করে সমাজের সম্পদ জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করে প্রত্যেক লোকের জীবিকার সংস্থান করে দেয়া। এখানে বেকার সমস্যা, অভাব-অনটনের অভিশাপ থাকবেনা।

---

১০৪. মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এই মানবীয় লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব তখনই যখন উৎপাদন-যন্ত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সমাজবাদের এই রূপায়ন মানুষের এতদিনের ধ্যানধারণাকেই পাল্টিয়ে দিয়েছে, একদিন মানুষ যাকে অসম্ভব বলে আখ্যা দিয়েছিল, তা এখন সম্ভব হতে চলেছে।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষয়িক লক্ষ্যও ছিল তাই। ইসলামের সামরিক সমাজবাদী (Military Communistic) রাষ্ট্রের জনগণের জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ববোধকে, বিশেষ করে, হযরত ‘উমরের দিওয়ান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকে অনেক ঐতিহাসিক অসম্ভব ও স্বপ্নচারিতা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, কিন্তু আজকের যুগের ঘটনা নিয়ে বিচার করলে তা মোটেই অসম্ভব কিছু বা স্বপ্নচারিতা ছিল না। বর্তমান পৃথিবীর কয়েকটি সমাজবাদী দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ করেছে যে খোলাফায়ে রাশেদার ব্যাপক ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী মোটেই স্বপ্নচারিতা ছিল না। বরং সেগুলোই ছিল অধিকতর বাস্তব ও কল্যাণকর।

ইসলামী অর্থনীতির সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে একটি মধ্যম পন্থা বের করবার প্রচেষ্টা করে তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হল নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানা যেমন খারাপ, তেমনি সামগ্রিক সমাজ মালিকানাও খারাপ। কাজেই তাঁরা এই দুয়ের মধ্যে গড় বের করেছেন; গড় হল এই নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানা না থেকে সেখানে থাকবে সীমিত ব্যক্তি মালিকানা এবং উৎপাদন যন্ত্রের উপর পূর্ণ সমাজ মালিকানা না থেকে থাকবে প্রয়োজন মাফিক সমাজ মালিকানা।

নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা এবং প্রয়োজনীয় সমাজ মালিকানার সীমা কোথায়, কিসের দ্বারা তা নির্ধারিত হবে এবং কেন? এসব প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে তারা তত নিশ্চিত নন। আসলে এ এক জগাখিছুড়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল্পনা। ইসলামী অর্থনীতির রূপ এটা নয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষ কাজের প্রেরণা পাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তথা সমগ্র মানবের মুক্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্য। অবশ্যি নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সে অচেতন থাকবে না। “এবং আল্লাহ পরকালের যাহা তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে (কল্যাণ) অনুসন্ধান করিতে থাক এবং সংসারের আপন অংশ তুমি ভুলিও না এবং আল্লাহর তোমার প্রতি যেরূপ হিত সাধন করিয়াছেন তুমি তদ্রূপ হিত সাধন করে এবং জগতে অশান্তি উৎপাদন করিও না নিশ্চিয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।”[১০৬]

ব্যক্তি-মানুষের দু'টি বোধ থাকবে-নৈতিক ও মানবিক। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের জন্য আল্লাহ ও সমাজের কাছে দায়ী থাকবে। এই দায়িত্ববোধ মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তাতে জনগণের কল্যাণ সাধনে সে অধিকতর তৎপর হবে। মানুষ

---

১০৬. আল-কুরআন, ২৮:৭৭

Dhaka University Institutional Repository

যদি তার কাজের জন্য শুধু সমাজের কাজে দায়ী (Constitutional Obligation) থাকে এবং এই ভাবে তাকে শিক্ষিত করে তোলা হয়, তাহলে তার দ্বারা অনেক অন্যায় বাজে কাজও সম্ভব হবে। কেননা, সমাজে প্রচলিত আইন বা শাসনতান্ত্রিক বিধান অনেক কৌশলে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু তার যদি আল্লাহর কাছে (Accountability to God) নিজ কাজের জওয়াবিদিহির ভয় থাকে এবং এভাবে তার মনোভাব গড়ে তোলা যায়, তাহলে সামাজিক আইনবিধি ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থাকলেও আল্লাহর কাছে স্বীয় কার্যাবলীর হিসেবনিকেশ দেওয়ার ভয়ে সে অন্যায় কাজ করতে সাহস পাবে না। ইসলামের প্রথম যুগে যে সমস্ত মহান নেতা জন্মেছিলেন তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ভয়েই সন্ত্রস্ত থাকতেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা দীনহীনের মত জীবনযাপন করেছেন। সমাজ নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার সমতা রক্ষা করতে পারে, সে সমাজই কাম্য বা আদর্শ সমাজ।

রাসূলুল্লাহ (স.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ

তৎকালে আরবে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল আদিম গোষ্ঠীগত সমাজবাদী ও স্বাভাবিক অর্থনীতির (Natutal or tribal communistic) অনুরূপ। ইহা ছিল বেদুঈন ও যাযাবরদের অর্থনীতি। আর উপমহাদেশে ছিল মরুময়, বালি ও পাথরে ভরা। স্বভাবতই এই পরিবেশে সাধারণ চারণভূমি, জলাশয় ও গোষ্ঠীগত অধিকার ছাড়া, তাদের জীবনধারণ কষ্টকর ছিল। মদীনা, খাইবার, ফাদাক প্রভৃতি স্থানে যেখানে সামান্য কৃষিকার্য সম্ভব ছিল সেখানেও তারা গোষ্ঠীগতভাবে জমি চাষ করত। কিন্তু মক্কা ও তায়েফে গোষ্ঠীগত প্রাধান্য থাকলেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদী ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক অর্থনীতি। বিরাট সুদের কারবার, একচেটিয়া ব্যবসা প্রাধান্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অর্থনীতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছিল; শহরে দূরবর্তী বেদুঈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে শহরের অধিবাসীদের যে ব্যবসা হতো তাতে শহরবাসীরা সব সময়ই পাওনাদার থাকতো। বর্ধিত হারে সুদসহ পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে তারা ব্যবসা চালিয়ে যেত। এই বর্ধিত সুদের বোঝা ও ঘাটতি বাণিজ্যের ফলে তারা শোষিত হয়ে ক্রমেই তাদের অধীনস্থ ভূমিদাসে পরিণত হতে চলেছিল।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এসে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে শোষণের যন্ত্রকে দিলেন ভেঙ্গে। পুঁজি হল বন্ধ। উৎপাদনে শুধু শ্রম ও সংগঠনের গুরুত্বকে দিলেন স্বীকৃতি, একচেটিয়া ব্যবসাকে নিয়ে এলেন জনগণের কল্যাণে। 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে সকলের সম্পত্তিতে ব্যবসায় ব্যতীত পরস্পরের সম্পত্তি গ্রাস করনা।'[১০৭]

"তোমরা তোমাদের মধ্যে মিলিতভাবে সরাসরি (উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে) বাণিজ্য কায়েম করবে।" ব্যবসা যেন জনগণকে শোষণ করতে না পারে তজ্জন্য তিনি ব্যবসাকে নিজের

---

১০৭. আল-কুরআন, ৪:২৭

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিয়ে এলেন। নবী (স.) বাজারে গিয়ে দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করে লক্ষ্য করতেন ভেজাল দেয়া হয়েছে কিনা; 'উমর (রা.) খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি গুদামজাত না করা, ঠিকমত ওজন দেয়ার জন্য ও ভেজাল না দেয়ার জন্য কতকগুলি কড়া আইন প্রবর্তন করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) বিবদমান, বিভক্ত উপজাতি, শহরবাসী ও দূরবর্তী অঞ্চলের বেদুঈনদের নিয়ে এমন এক সমাজ (ummah) প্রতিষ্ঠা করলেন যার ভিত্তি হল "বিশ্বাস" (ঈমান)। দূর হল দ্বন্দ্ব, কোলাহল। গোষ্ঠীগত আভিজাত্য, বংশ গৌরব, ধন ও ঐশ্বর্যের প্রাধান্য বিনষ্ট করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন "ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ"- যেখানে সবাই ভাই ভাই। তিনি ঘোষণা করলেন, "এক ভাই অপর ভাইকে শোষণ করতে পারবে না; একজন অপরজনকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।" পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে যে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ রয়েছে, আল্লাহ তার মালিক, আল্লাহর এক একজন বান্দা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের সেই সম্পদে অধিকার রয়েছে। আমাদের নবী স্বীকৃতি দিলেন, আল্লাহর একজন বিনীত বান্দা হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই মানুষের মত বাঁচবার অধিকার রয়েছে। নারী-পুরুষ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিরই আল্লাহর সম্পদে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের অধিকার রয়েছে।

পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ ....।[১০৮]

465923

আল্লাহর সম্পদ থাকবে গোটা মানুষের কাছে জিম্মা (trust) হিসেবে, সমাজ বা সমাজ কর্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্র সে সম্পদ কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায় নিশ্চিত করে দেবে। শ্রমানুসারে জীবিকার্জনের উপায় নিশ্চিত করে দিলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হবে না। ইসলামী সমাজে ব্যক্তির তার পরিশ্রমলব্ধ আয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে আয় সেই আয়ে সমাজের অন্যান্যদের অধিকার রয়েছে। আর এই অতিরিক্ত আয়-ব্যয় হবে আল্লাহর পথে, অর্থাৎ মানবতার উন্নতির জন্য।

"তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের হক নির্ধারিত হয়েছে।"[১০৯]

রাষ্ট্র জনসাধারণের কাছ থেকে সেই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করবে যাকাত, সাদকা, ট্যাক্স ইত্যাদি আকারে; তা ব্যয়িত হবে সমাজের সমৃদ্ধির জন্য। সমাজের সমৃদ্ধি শুধু দারিদ্র বিতাড়ন বা দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি নয়; ব্যক্তি তথা গোটা সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা হিসেবে পরবর্তী জীবনেও যেন প্রত্যেক মানুষ গৌরবের সঙ্গে কাল কাটাতে পারে তার বন্দোবস্ত করাও হবে রাষ্ট্রের বা সমাজের লক্ষ্য। ইসলামী অর্থনীতির ইহাই হল মূলনীতি। আমাদের নবী (স.) এই নীতিরই ভিত্তি স্থাপন

---

১০৮. আল-কুরআন, ৪:৩২

১০৯. আল-কুরআন, ৫১:১৯

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন এবং হযরত উমরের (রা.) সময় তা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। প্রত্যেক লোকের জীবিকার্জনের পথ সুগম করার জন্য তিনি জীবিকার্জনে বা উৎপাদনে সাহায্যকারী আল্লাহর সম্পদ-যেমন পশু চারণের ভূমি, ঘাস, পানি, আগুন ও লবণ ইত্যাদি-সমাজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। আরব হল মরুময় দেশ। কৃষিকার্য এক রকম নগণ্য ছিল। সাধারণ মানুষের জীবিকার জন্য পশুচারণ ভূমি, পানি ও আগুন ছিল অতীব প্রয়োজনীয়। নতুন ইসলামী সমাজে জীবিকার্জন ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য আর একটা প্রধান উপায় ছিল "জিহাদ"। যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল বা গনীমাহ ছিল আল্লাহ ও রাসূলের তথা সম্পূর্ণ সমাজের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য।[১১০] যুদ্ধপ্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হত সমাজের সর্বসাধারণের জন্য। বাকী অংশ সৈনিকদের মধ্যে তাদের রণকৌশল প্রদর্শন ও প্রয়োজন বিবেচনা করে বন্টন করে দেওয়া হত। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ জাতিই ছিল সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনীতে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিই ছিল সৈন্য। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার অধিকার গোটা জাতিরই ছিল এবং ইহা থেকে সব কিছু প্রাপ্য গোটা জাতিরই প্রাপ্য, স্পষ্টতই বোঝা যায়-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহর এবং তত্ত্বাবধান করত রাষ্ট্র। আরবে কৃষিযোগ্য ভূমি খুব কমই ছিল, যেটুকু কর্ষণযোগ্য ভূমি ছিল তা গোষ্ঠীগতভাবে চাষবাস হত, অধিকাংশ ভাল কৃষিযোগ্য ভূমি ছিল ইয়াহুদীদের অধীনে। যে সমস্ত ইয়াহুদী ইসলামী শাসনের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক অংশ খারাজরূপে রাষ্ট্রকে প্রদান করত। যারা পরাজয় বরণ করে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের জমি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে এনে সেই জমির (ফাদাক) আয় জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয়েছিলো।[১১১]

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে সিরিয়া ও ইরাকের বহু কর্ষণযোগ্য উর্বর ভূমি মুসলিমদের অধিকারে আসে। এই জমির বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়। আরবে কৃষিযোগ্য ভূমি তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল না, কাজেই ব্যক্তির বা সমাজের তত্ত্বাবধানে ভূমি থাকা না থাকার সমস্যার গুরুত্ব দেখা দেয়নি। হযরত উমর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবাদের পরামর্শ নিয়ে ঘোষণা করলেন, "জমি ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকবে না; যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে জমি বন্টন না করে দিয়ে আল্লাহর উৎপাদনে সাহায্যকারী তৎকালীন এই প্রধান সম্পদকে তিনি রাষ্ট্রের জিম্মায় রেখে দিলেন।" তিনি বললেন, "জনগণের মধ্যে যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, জমি শুধু তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নয় বরং পরে যারা আসবে তাদেরও জীবিকার্জনের অধিকার রয়েছে এই জমি থেকে। এ না হলে আগামীকালের বংশধরদের জন্য জীবিকার্জনের কোন সংস্থান থাকবে না।' জমি থেকে উৎপন্ন আয় ছিল সম্পূর্ণ গোটা সমাজের। ইহা ছাড়াও যে সমস্ত ছোটখাট কৃষিযোগ্য জমি ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল বা দেয়া হয়েছিল সেখানেও তিনি "জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে জমির ব্যবহার নীতি" অবলম্বন করেছিলেন। কারো অধীনে জমি অকর্ষিত বা অযত্নে পতিত থাকলে, তিনি সে জমি তার কাছ থেকে নিয়ে অন্য

১১০. আল-কুরআন, ৮:১
১১১. মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকের তত্ত্বাবধানে দিতেন সমাজের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই কারণেই তিনি হযরত বেলালের (রা.) কাছ থেকে জমি নিয়ে তা সমাজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন।[১১২]

এছাড়া কেউ অসৎ উপায়ে রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যবহার করে সম্পদ আহরণ করলে, সেই অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থ রাষ্ট্রের অধীনে আনা হত, কারো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকলে তা জনগণের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করা হত।

মিসর বিজয়ী 'আমর বি আল-'আসের অর্ধেক সম্পত্তি এবং মুতা যুদ্ধের বীর সেনানী সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ী খালিদের বৈদেশিক সম্পত্তিও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল।[১১৩]

আল্লাহর সম্পদে জনগণের জীবিকা অর্জনের যৌথ অধিকার স্বীকৃত ও বাস্তবায়ন মানব ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম হল। অ-ইসলামী সমাজে থাকবে দারিদ্র, মনুষ্যত্বের হবে অবমাননা ও তার বিকাশের পথ হবে রুদ্ধ। কুৎসিত কদাচারে সে সমাজ থেকে আচ্ছন্ন। কিন্তু ইসলামী সমাজে দারিদ্র হবে বিতাড়িত, মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ হবে প্রশস্ত, সম্ভাবনাময় পৃথিবীর সৌন্দর্য সম্ভার ও প্রাচুর্য হবে সবারই উপভোগ্য, সুন্দরের সাধনায় প্রত্যেকের মন হবে আলোকিত। এই পৃথিবীতেই সে পাবে পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিত।

হে নবী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অমিতাচার করিবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।

বল, 'আল্লাহর স্বীয় দাসদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিন এই সমস্ত তাহাদের জন্য যাহারা বিশ্বাস করে।' এইরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।

বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধীতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা-যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই।'[১১৪]

কোন অ-ইসলামী সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিণত করতে গেলে দারিদ্র এবং মনুষ্যত্ব ও প্রগতির বিরুদ্ধে বহু সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হবে। এসব সমস্যা দূরীকরণের দায়িত্বও হবে রাষ্ট্রের কর্তার। এজন্য প্রয়োজন অর্থের। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা। আমাদের নবী জনগণের তহবিল বা বায়তুল মাল স্থাপন করলেন এবং ইহাতে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হল। জনগণ তাদের 'উদ্বৃত্ত' (যাকাত, সাদকা ও ট্যাক্স) দিয়ে জনগণের তহবিল সমৃদ্ধ করত।

---

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১১৩. ডা. হাসান জামান, "ধন সম্পদ জাতীয়করণ ও ইসলাম", ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন: ১৯৬৯, পৃ. ৪৭২

১১৪. আল-কুরআন, ৭:৩১–৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের নবী করীম (স.) ও হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাসনকালে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় খরচ বাদে বায়তুল মালে খুব বেশি সম্পদ থাকতো না, কারণ নিকটবর্তী ও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তা বিতরণ করে দেয়া হত। হযরত উমরের (রা.) সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় বেড়ে গেল, তিনি বায়তুল মালকে একটি সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিক সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন; সরকারের শাসনতান্ত্রিক ও প্রতিরক্ষার করচ বাদে যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকত সেগুলো বিশ্বাস, ইসলামের প্রতি দরদ ইত্যাদির ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এভাবে জনগণের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকার স্বীকার করে নিল। ইসলামের সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হল সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে।

হযরত উসমান (রা.):

খিলাফত গ্রহণ করবার পূর্বে ইসলামে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তৎকালীন প্রতিপত্তিশালী, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় উমাইয়া বংশের মধ্যে তিনিই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর 'খিলাফত' গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে একটি বিষাদময় ঘটনা। খিলাফত গ্রহণকালীন তাঁর বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বলতার সুযোগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পুরাপুরি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে অবলম্বন করেই তাঁরা আবার রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামী গণতন্ত্র ও সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে অ-ইসলামী সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের যে সংগ্রাম তা মূলত ছিল একদিকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ এবং অপরদিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও সুযোগ-সুবিধার দাবিদার (উমাইয়া ও মকজুম)দের মধ্যে। ইসলামের বাণী ছিল নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার বাণী। কাজেই মক্কার অত্যাচারী অভিজাত সম্প্রদায়েরা (যারা ব্যবসায় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার একচেটিয়া অধিকারী) ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মরণ কামড় দিয়েছিল। আর অভিজাতদের নেতৃত্ব দিয়েছিল উমাইয়া বংশের প্রধানগণ। ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা হল এই অভিজাতদের নেতৃত্ব দিয়েছিল উমাইয়া বংশের প্রধানগণ। ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা হল এই অভিজাত তথা উমাইয়াদের পরাজয়। তারা "শেষ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শেষ পন্থা হিসেবে উপায়ান্তর না দেখে।" কাজেই, ইসলাম ছিল তাঁদের কাছে ধর্মের চেয়ে সুবিধে। ইসলামের নিকট তাঁদের আত্মসমর্পণ, সেটা হল বাহিরের, অন্তরের নয়। তাঁরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, পূর্বপ্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য। হযরত উসমান (রা.) শেষকালে শাসনকার্যে আত্মীয়-স্বজনদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে তাঁদের সে সুযোগ করে দিলেন। তিনি হলেন তাঁদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এক মহা মর্মান্তিক কুরবাণী।[১১৫]

---

১১৫. সংকলন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহঃ

শাসক মু'য়াবিয়ার সময় থেকে সোলায়মানের সময় পর্যন্ত ভাল ভাল এলাকা, উর্বর জমি (যেগুলো ইসলামী নীতি অনুসারে বায়তুল মালের সম্পত্তি) শাহী সনদের বলে উমাইয়া বংশের লোকদের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি গেড়েছিলেন, আর উমাইয়াদের সময় তা মজবুত হয়ে উঠে। তিনি নিজ বংশের সকল জায়গীর এবং রাজকীয় জায়গীরের শাহী দলিল ও সনদ সমূহ জনগণের সম্মুখে কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে সম্পত্তিসমূহ প্রকৃত তত্ত্বাবধায়কদের ফিরিয়ে দিলেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তিই বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি নষ্ট করে দিয়ে ভূমির উপর আল্লাহর মালিকানা তথা জনগণের জীবিকা নির্বাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

মারওয়ানের বংশের রাজপুত্রগণকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, পূর্ববর্তী শাসকদের (উমাইয়া) এবং আবদুল মালেকের পরস্পর বিরোধী কার্যাবলী ও দলিল হাজির করা হলে, তখন কোন দলিলের ভিত্তিতে বিচার মীমাংসা করা হবে? উত্তরে তারা বলতেন "যেহেতু মু'য়াবিয়ার দলিল প্রাচীন, তার ভিত্তিতেই বিচার মীমাংসা হবে।"[১১৬]

দ্বিতীয় উমরের এসব ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন পেশ হলে তিনি জানালেন যে তিনিও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, তিনি প্রাচীনতম দলিল "কুরআন" মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে বাপের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি যদি জোরপূর্বক অধিকার করে তাহলে জনসাধারণ ও বিচারকের কাজ হবে-কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাতে তার ন্যায্য অংশ পায় তার বন্দোবস্ত করা। তিনি বলতেন যে, "খুলাফা-ই-রাশিদীনের পর যাঁরা শাসনভার নিয়েছেন, তাঁরা দরিদ্র জনগণের অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়েছেন, কাজেই তিনি সেই (সম্পত্তির) অধিকার জনসাধারণকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন।"[১১৭] তিনি নিজ বংশের লোকের ও আপন পরিবারবর্গের রাজকীয় দান ও বিশেষ অনুগ্রহ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত প্রজাবর্গের "বায়তুল মালের" উপর যে অধিকার তাঁদের অধিকারও ঠিক তাই। নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ছিল।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের সময় অমুসলিমদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করা হত। কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হত এবং সে বায়তুল মালের অধিকারী হয়ে 'মুকাতিলার' অন্তর্ভুক্ত হত। তার জমি অমুসলিম আত্মীয়গণ চাষবাস করত ও খারাজ প্রদান করত।

---

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়াগণ নও মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে ভাতা বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করতেন। ফলে আরবও অনারব মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ ও ভেদাভেদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় উমর খারাজ দেয় জমি মুসলমানদের চাষ করা বন্ধ করে দিলেন। যাঁরা পূর্ব থেকে চাষবাস করত তাদেরকে "উশর" দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন; যে সমস্ত নও মুসলিম মুকাতিলাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদের জমি অমুসলিম আত্মীয়রা চাষ করবে ও খারাজ প্রদান করবে ঠিক করলেন। নও মুসলিমদের খারাজ ও জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দিলেন। তবে কোন নও মুসলিম যদি শহরে না যেয়ে নিজের জমি-জমা চাষ করে তবে তাকে শুধু উশর প্রদান করতে হত। তিনি বায়তুল মালে নও মুসলিমের জন্য ভাতা নির্ধারিত করলেন।

এইভাবে তিনি হযরত উমরের (রা.) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। নও মুসলিমদের প্রতি পূর্বের শাসকদের বিভেদমূলক নীতি উঠিয়ে দিয়ে ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রবর্তন করার ফলে দলে দলে লোক সত্য ধর্মের আশ্রয় নেয়া শুরু করে দিল। ইহার ফলে রাষ্ট্রের আয় কমে গেল-এই অভিযোগ করা হলে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে মানবের মুক্তিদাতা ও পথ প্রদর্শক করে পাঠিয়েছিলেন, কর আদায়কারী তহশীলদার হিসেবে নয়। আল্লাহর শপথ, যদি সমস্ত লোক মুসলমান হয়ে যায়, আমি খুশি হব। তারপর তুমি (অভিযোগকারী সরকারী কর্মচারী) ও আমি নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করব।"[১১৮] তিনি সকল বেকার ও কর্মে অক্ষম লোকের জন্য রাজকোষ থেকে বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিষদ আদেশ দিল যে, "রাজ্যের মধ্যে কেউ যেন অনাহারে না থাকে।" অনেকে এর প্রতিবাদ করলে তিনি বলেছিলেন "আল্লাহর সম্পদ যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ তা তাঁর বান্দাহদিগকে দিতে থাকব।"[১১৯]

তিনি লক্ষ্য করলেন, সরকারী কাজে কর্মচারীবৃন্দ কাগজ, কলম ইত্যাদি অপব্যয় করছে। তাই তিনি শাসন কার্যে অপচয় ও ব্যয় বাহুল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবু বকর ইবনে হাযাম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লিখেছিলেন, "তোমরা সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন মুসলমানগণ তৈলের (বাতি) অভাবে অন্ধকারে মসজিদে নববীতে গমণ করতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের অবস্থা আজ ভাল। সরকারী কাজে ব্যয়বাহুল্যের নীতি পরিহার কর। আমি এরূপ কাজে মুসলমানদের অর্থ ব্যয় করতে চাই না যদ্বারা তাঁদের কোন সত্যিকার উপকার হয় না।"[১২০]

উমাইয়াদের শাসননীতি অনৈসলামিক ছিল, রাজনীতিতে জবরদস্তিই ছিল তাদের মূলনীতি। নিজেদের শাসনের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য।

---

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শাসন নীতির ইসলামীকরণ করলেন, সকল অন্যায়-অত্যাচারমূলক আইন উঠিয়ে দিলেন, আদর্শচ্যুত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বরখাস্ত করলেন। পক্ষপাতহীন, ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা জবরদস্তির স্থান গ্রহণ করল। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে জনসাধারণ অনুভব করল "আসমান-জমীনের মধ্যে ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশ্ব প্রকৃতি যেন নিজেই মানুষকে স্বাধীনতা প্রেম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মুকুট পরিয়ে দেবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছে। ভিখিরি দাতার পেছনে ছুটতো না বরং দাতাই ভিখিরীর পেছনে ফিরত।"[১২১]

উমাইয়া শাসকেরা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশধরগণ ও তাঁর ভক্ত সাহাবীগণ ও মদীনার অধিবাসীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল, তাঁদের অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার ফলে আরব ও অনারবদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছিল বহু, বিভিন্ন, বিরুদ্ধ দলের উৎপত্তি হয়েছিল। তাঁর ইসলামী শাসন নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল, আরব ও অনারবদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হল। তিনি হযরত আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি খোৎবায় উমাইয়াদের প্রবর্তিত অভিশাপ বর্ষণ প্রথা বন্ধ করে দিয়ে তৎপরিবর্তে দিলেন কুরআনের আয়াত পাঠ বা ভালো কথা আবৃত্তির নির্দেশ। বিরোধ ভুলে সব এক হল, বিদ্রোহী খারিজীগণ অস্ত্র কোষবদ্ধ করে তাঁকে প্রকৃত খলীফা বলে স্বীকৃতি দিলেন।

শাসক উমরের চেয়ে মানুষ উমর ছিলেন আরও মহৎ। পূর্ববর্তী শাসকদের (উমাইয়া) রাজকীয় গৌরব ও জাঁকজমক বর্জন করে দৈনিক মাত্র ২ দিরহাম বায়তুল মাল থেকে ভাতা নিয়ে অতি সাধারণ দীনহীনের মত তিনি জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তি জীবনের সুখ-সুবিধে ও আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধের চেয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তালিযুক্ত এক প্রস্থ পোষাক ছিল তাঁর আড়ম্বর। এমতাবস্থায় তিনি জনসাধারণের সঙ্গে এমন খোলাখুলিভাবে মিশতেন যে, লোকে তাঁকে অনেক সময় চিনতে পারতো না। জনসাধারণের ভাল-মন্দের জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করতেন। জনগণের "জিম্মাদার" হিসেবে তিনি আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন এজন্য সব সময়ই সতর্ক ও চিন্তাকুল ছিলেন। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা ও জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এই মহান হৃদয় ইসলামী সমাজের শেষ প্রদীপ উমাইয়া খান্দান ও পুঁজিবাদী চক্রান্তের হাতে শহীদ হন অতি অল্প বয়সে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয় নাই এখনও তিনি বেঁচে আছেন পৃথিবীর জনগণের সংগ্রামের মাঝে।

"যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করে তাদের মত বলো না।

তারা জীবিত, তোমরা তা বুঝতে পার না।"[১২২]

---

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১২২. আল-কুরআন, ২:১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসী খিলাফতের অবদানঃ

এইভাবে খিলাফতে রাশিদার আমল শেষ হয়ে বনু উমাইয়ার শাসনকাল নিঃশেষ হয়ে আব্বাসী বংশের শাসনকাল সূচিত হয়। এই সময় মুসলিম শাসনের রাজধানী ছিল বাগদাদ এবং তা ছিল আব্বাসীয় শাসনের চরম উন্নতি লাভের সু-উচ্চ পর্যায়। পৃথিবীর বিশাল অংশ তখন মুসলিম শাসনের অধীন। পূর্বদিকে চীন ও সিন্ধু উপত্যকা, পশ্চিমে লিবীয় বিশাল মরু-প্রান্তর, উত্তরে সীহূন নদী ও ককেশাস পর্বতমালা এবং দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা ও ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদানীন্তন সময় এই মুসলিম সাম্রাজ্যেই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ইউরোপ ও ভারতের সাথে এ রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক গভীরভাবে সংস্থাপিত ছিল। এসব রাষ্ট্র থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকর্তা খলীফা হারুনুর রশীদের (১৭০–১৯৩ হিজরী ৭৮৬ – ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) দরবারে মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি প্রেরিত হত। দেশের প্রশাসন নিয়ম, শৃঙ্খলা, যোগাযোগ, সংবাদ আদান-প্রদান ও ডাক বিভাগের ব্যবস্থা অতীব উন্নত মানের গড়ে উঠেছিল। দুই ডজন প্রদেশে বিভক্ত ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং খলীফা কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্নরগণ প্রদেশসমূহ খুবই সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করতেন। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারাদির প্রতি খুবই গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখা হত। সাধারণ জনকল্যাণের কাজে সরকারী ধন-সম্পদ উদারভাবে ব্যয় করা হত। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সর্বত্র সচ্ছলতা ও বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করছিল। এককথায় যুগটি ছিল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার সোনালী যুগ। বাগদাদ নগরটি ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এই সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতা ও বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিস্তৃত ছিল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ছিল খুবই স্বল্প ও একান্তই সামান্য।

এহেন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ইসলামী সমাজ-জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এদিকেই জনগনের দৃষ্টি আকৃষ্ট ছিল। ফলে পূর্বের ন্যায় সরলতা ও সহজ জীবনযাত্রা এবং প্রাথমিক যুগের ন্যায় পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অনেকখানি লোপ পেয়ে যায়। তবে এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এবং বিশেষভাবে দীন-বিশেষজ্ঞ উলামা এ অবস্থায়ও খুবই সাধাসিধা জীবন যাপন করতে অভ্যস্থ ছিলেন, দীন সম্পর্কে অবহেলিত লোকগণই ছিলেন এই অনাড়ম্বর জীবন-ধারার সত্যিকার প্রতিনিধি। তাঁরা স্বল্পে সন্তুষ্ট ও ঘরমুখী জীবন যাপনেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা কিছু সংখ্যক লোকের আয়েশ আরাম, বিলাস-ব্যাসনের, সুবিধাভোগী ও ভোগবাদী লোকদের প্রতি চরম অনীহা ও বীতশ্রদ্ধা পোষণ করতেন।[১২৩]

---

১২৩. ইসলামী অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এই আমলেই মুসলিম সমাজে বিপরীতমুখী চিন্তাভিত্তিক নানা দল-উপদল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। শীয়া, খাওয়ারিজ, মুর্জিয়া, জুহামিয়া, কাদরীয়া ও মু'তাজিলা প্রভৃতি অশান্তি সৃষ্টিকারী উপদলগুলি দীনি আকীদা, বিশ্বাস, রাষ্ট্রাদর্শ বা বিশেষ ধরনের দার্শনিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে চরম সাংঘর্ষিক চিন্তাবাদের কারণে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আব্বাসীয় যুগে আরবদের শাসন-ব্যবস্থায় অনারব লোকেরা যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তারা মন্ত্রীত্ব ও খলীফার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে খালিদ ইবনে বারমাক (মৃ. ১৬৩ হিজরী) ও তদীয় পুত্র ইয়াহইয়া ইবনে খালিদ বারমাক (মৃ. ১৯০ হিজরী)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইয়াহইয়া ইবনে খালিদ খলীফা হারুনুর রশীদের প্রাথমিক ষোলটি বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও প্রশাসন বিভাগের যাবতীয় ব্যাপারে কার্যত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রেও অনারব লোকেরা বিশেষ মর্যাদাবান হয়ে উঠেন। তাঁদেরই প্রভাবাধীন অনারব দর্শন, শাসন পদ্ধতি, ধর্ম বিশ্বাস, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যামিতি ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। যদিও এই অনুবাদের কাজটি শুরু হয়েছিল উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে; আব্বাসী খিলাফতের প্রাথমিক দিনগুলোতেও তা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। আর মামুনুর রশীদের (১৯৮—২১৮ হিজরী/ ৮১৩—৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফত আমলে এই কাজ পূর্ণত্ব লাভ করে। এভাবেই ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার সাথে দার্শনিক চিন্তাধারা সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। এর ফলেই ইসলামের সরল-সহজ শিক্ষার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও আকীদা-বিশ্বাসের বুদ্ধি বৃত্তিক (Rational) বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নিষ্ঠাবান ঈমানদার ও বিপর্যয়কামী মুনাফিক প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানসিকতা নিয়ে, এই কাজ করতে শুরু করে দিল। এর দরুন-সমসাময়িক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দার্শনিক সূক্ষ্মাতি-সুক্ষ্মতা ও জটিলতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের রুচিশীলতা প্রবল হয়ে উঠল। স্বার্থপর ও অসদুদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তিরা এই সময়ই নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা রাসূলের হাদীস নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করতে শুরু করে।[১২৪]

এই যুগেই তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্ ও যুদ্ধের বিস্তারিত কাহিনী সম্বলিত ইতিহাস সংকলন শুরু হয়। নবী করীম (স.) ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের 'সুন্নাত' ও সাহাবায়ে কিরামের (রা.) কথা ও কাহিনীসমূহ সংকলন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামী আইন বিধান বা'র করার (Contrivance) কাজের একটি বিরাট আন্দোলন শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকে। বিপুল সংখ্যক সৎ মন-মানসিকতা ও মেধা-প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কাজে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়োগ করেন। ঘরে ঘরে ইসলামী জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়ে যায়। ফলে কুরআন মজীদের নির্ভুল অর্থ ও তাৎপর্য রক্ষার জন্য তাফসীর রচিত হয়। এই কাজে নবী করীম (স.), সাহাবায়ে ও তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন। পরে সহীহ্ ও কল্পিত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ ও কল্পিত জিনিসগুলিকে সনাক্ত

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

করে ঝেড়ে ফেলার একটি নির্ভরযোগ্য মানদন্ড তৈরী হল। আর ফিকাহবিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শরী'আতের হুকুম আহকাম সম্বলিত গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। নিত্য সমুচিতি নবতর ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশ জানবার জন্য ইজতিহাদি প্রতিভাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো হয়। এ হিসেবে এ যুগটাই ছিল মুজতাহিদের যুগ। এই যুগেই চারজন প্রধান ও প্রখ্যাত ফিকাহ্ বিদদের School of thought গড়ে উঠে। কিন্তু তখনও অন্ধ অনুসরণের প্রবণতা মুসলিম জনগণের মধ্যে দেখা দেয়নি।

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ও প্রয়োজন প্রচলন প্রেক্ষিতে বিরচিত ফিকাহ্-ই গোটা আব্বাসী খিলাফতের Law of the Land ছিল। ইসলামী সমাজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক এক কথায় সমগ্র জীবন-ব্যাপারই এই ইসলামী ফিকাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশের সর্ব পর্যায়ের বিচারালয়ে বিচারকমন্ডলী এই ফিকাহর ভিত্তিতেই যাবতীয় বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন।[১২৫]

ইসলামী অর্থনীতি পর্যায়ে গ্রন্থ প্রণয়নঃ

উমাইয়া বংশের খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়। এই অভিযান দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলে; কিন্তু ঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ তখনও শুরু হয়নি। আব্বাসী খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা মনসূর-এর খিলাফত আমলে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। মক্কায় ইবনে জুরাইজ, মদীনায় ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রা.), সিরীয়ায় ইমাম আওযায়ী, বাছরায় ইবনে আবু আরুবা ও হাম্মাদ ইবনে মালামা, ইয়েমেনে মা'মার, কূফায় সুফিয়ান সওরী হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। ইবনে ইসহাক যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারাদির ইতিহাস এবং ইমাম আবু হানীফা (র.) ফিকাহ্ শাস্ত্র প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খলীফা মনসূর ইমাম মালেক (র.) কে প্রয়োজনীয় হাদীস সম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর কথা ছিল: 'হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি জানেন, বর্তমান সময়ে আপনার ও আমার অপেক্ষা ইসলাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু আমি নিজে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও ব্যস্ততায় মশগুল হয়ে আছি। আপনার যথেষ্ট অবসর। অতএব আপনি লোকদের জন্য এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করুণ যা থেকে জনগণ বিশেষ উপকৃত হতে পারবে।...... এ করে আপনি লোকদের জন্য গ্রন্থ প্রণয়নের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত করুন।

এই কথা শুনে ইমাম মালেক (র.) বলেছিলেন: 'মনসুর এই কথা বলে আমাকে যেন গ্রন্থ প্রণয়নই শিখিয়ে দিলেন।[১২৬]

---

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯ – ১০০
১২৬. আকবর খান নাযিব আবাদী, তারিখুল ইসলাম, ২য় খন্ড, ২২১

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা মনসূরের পর তাঁর পুত্র আল-মাহদী খলীফা হন। তিনি রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। সুন্নাত পরিপন্থী অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাদি যা এতদিন পর্যন্ত চলে আসছিল খতম করে দেন। তিনি নিজে নামাযে ইমামতি করতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করতেন। জুমু'আর খুতবা দিতেন।[১২৭]

এই খলীফা আল-মাহদীর উজীর মু'য়াবিয়া ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়ামার আল-আশ'য়ারী (১৭০ হিজরী) 'কিতাবুল খারাজ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইসলামের অর্থনীতি পর্যায়ে এই গ্রন্থই যে সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ, গ্রন্থ প্রণয়ন ইতিহাস থেকে তা জানা যায়। অতীত কালের গ্রন্থ প্রণয়নের তিন খানি প্রামাণ্য ইতিহাস প্রখ্যাত। তা হচ্ছে, হাজী খলীফা রচিত কাশকুজজুনন, ইবনে নাদীম রচিত আল-ফাহরাসাত এবং সাজমাউল আদাবা'ই (ইয়াকূত রুমী প্রণীত) তাবারীর ইতিহাস থেকেও এই পর্যায়ে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মু'য়াবিয়া ইবনে উবাইদুল্লাহ্ লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থখানির কোন উল্লেখ কাশফুজজনুন ও ফাহরাসাত এ পাওয়া যায় না। তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'মু'জিমুল-উদাবা' তালিকা গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১১ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ রয়েছে। তাবারীর গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে বলে ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি কোন পৃষ্ঠার উল্লেখ করেননি। এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে খলীফার কোন আহবান-উদ্বোধন ছিল কিনা এবং এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব কী, তা জানবার উপায় নেই। বর্তমানে এই গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাও জানা যায়নি। তবে ইসলামী অর্থনীতি পর্যায়ে এটিই যে প্রথম বিরচিত গ্রন্থ, ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী তা বলিষ্ঠভাবে বলেছেন।[১২৮]

এরপর এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম আবু ইউসুফ লিখিত তা খলীফা হারুনুর রশীদের (১৭০–১৯৩ হিজরী/৭৮৬ – ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখিত হয়েছিল। খলীফা হারুনুর রশীদ জনগণের কল্যাণ ও তাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কে সেজন্য পথ প্রদর্শন করার অনুরোধ জানালেন। সেই সঙ্গে তিনি বহু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থ সংক্রান্ত কতগুলি প্রশ্ন ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করেছিলেন। 'কর' সংক্রান্ত বিষয়ে শরী'য়াতের বিধানও জানতে চেয়েছিলেন। ইমাম সাহেব দিন-রাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ রচনার পর তিনি বিশেষজ্ঞদের একটি মজলিশ আহবান করে সর্বপ্রথম তার সম্মুখেই তা উপস্থাপিত করেন। এই গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে আইন-বিধান 'ইস্তেম্বাত' (To contrive) করা হয়েছে। সরকার জনগণের নিত্যকার ব্যাপারাদিতে তা পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম।

---

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১২৮. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইসলাম কা নিযাম, নওল কিশোর, লক্ষ্মৌ, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

'কিতাবুল খারাজ' নামে মোট ২০ খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'আল ফিহরিস্ত' তালিকা গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ডে তন্মধ্যে কয়েকখানির নাম উল্লেখিত রয়েছে। ড. এ. ইবনে শামস্ তার Islamic Taxation নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এর অনেকগুলি গ্রন্থেরই উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থখানি হচ্ছে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম আল-কুরাশী লিখিত 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। তিনি 'মু'জিমুল-উদাবা ইয়াকুতরুমী' আল-ফখরী ও তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অন্যান্য বই'র নাম সংগ্রহ করেছেন। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

১. আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আদম ইবনে সুলাইমান আল-কুরাশী আল-উমায়ীর (মৃ. ২০৩ হিজরী, ৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), 'কিতাবুল খারাজ'। এই গ্রন্থখানি খলীফা মামূনুর রশীদের (১৯৮–২১৮ হিজরী/৮১৩–৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফতকালে লিখিত হয়েছিল।[১২৯]

২. আবূ আলী হাসান ইবনে জিয়াদ আল-লু'লূয়ী (মৃ. ২০৪ হিজরী/৮১৯ খ্রিস্টাব্দ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-র প্রখ্যাত ছাত্র। তিনিও 'কিতাবুল খারাজ' নামের একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

৩. প্রখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিক আবূ উস্মান আমর ইবনে বহর ইবনে মাহবুব আল-জাহেজ (মৃ. ২৫৫ হিজরী/৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) 'রিসালাতু আবি আন্নাজমু বিল খারাজ' নামের গ্রন্থখানির লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আব্বাসী খলীফা আল-মুহ্তাদী (২৫৭–২৫৮ হিজরী/৮৭০–৮৭১ খ্রিস্টাব্দ) প্রখ্যাত ফিকাহবিদ কাজী আহমাদ ইবনে উমার আশশাইবাণী আল-কাশশাফ (মৃ. ২৬১ হিজরী/৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) কে 'কিতাবুল খারাজ লিল মুহতাদি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫. আবু আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে বশর আল-কাতেব (মৃ. ২৭০ হিজরী/৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হাজার। 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে এই লেখকেরই 'আল-খারাজ' নামক আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ড. এ. ইবনে শামস্ মনে করেন যে, মূল গ্রন্থ একখানা-ই, দুই খানা নয়।

৬. ইমাম আবূ সুলাইমান দাউদ ইবনে দাউদ ইবনে খালফ আল-ইসফাহানীও (মৃ. ২৭০ হিজরী/৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) 'কিতাবুল খারাজ' নামীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

৭. কুদামাহ্ ইবনে জা'ফর ইবনে-কুদামাহ্ যায়দ (মৃ. ৩৩৭ হিজরী/৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) রচিত গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল খরাজ ওয়া সানাআতুল কিতাবাতু'।

---

১২৯. মুহম্মদ আবদুর রহীম, "ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ", ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

৮. আবুল কাশেম উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কালদানী আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদির (২৯২ – ৩২০ হিজরী/৯০৪–৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর মন্ত্রী ও সওয়াদ অঞ্চলের প্রশাসক ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' নামে গ্রন্থের দুইটি খন্ড প্রকাশ করেন। একটি খন্ড ৩২৬ হিজরীতে এবং অপরটি ৩৩৬ হিজরীতে।

৯. আল-মুকতাদির খলীফার আমলেই আবুল হাসান আলী ইবনে হাসান ওরফে ইবনুল মুশাইতাও 'কিতাবুল খারাজ লতীফ' নামের একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১০. ইবনে নাদীম তাঁর সমসাময়িক আবুল হাসান আলী ইবনে আলী ইবনে ওয়াবিফ আল-কাতেব লিখিত 'কিতাবুল আসফা ওয়া তাসকিফু ফিল খারাজ ওয়া রুসুমিহী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

১১. খলীফা আল-মুত্তাকী (৩৩০–৩৩৩ হিজরী/৯৪১ – ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ)-র উজীর আবদুর রহমান ইবনে ঈসা 'তারিখু আহকামুল খারাজ' নামের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বিরাট ও বিস্তারিতভাবে 'কিতাবুল খারাজ' নামের আর একখানি গ্রন্থ রচনাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

১২. ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সুরাইহ্ আন-নাছরানী আল-কাতেব ইবনে নাছরানী তিনি একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ। তিনি 'খারাজ' সম্পর্কে দুই খানা কিতাব রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একখানা দুই খন্ডে হাজার পৃষ্ঠায় বিস্তীর্ণ বিরাট গ্রন্থ। আর অপর খানা মাত্র একশ' পৃষ্ঠার অতীব সংক্ষিপ্ত পুস্তক।

১৩. হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুজ-জুনুয' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নসর ইবনে মুসা আর রাজী আল-হানাফী 'কিতাবুল খারাজ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৪. আল-বিস্ত-এ আবদুল্লাহ ইবনে আল মারিম আবুল কাশেম রচিত 'কিতাবুল খারাজ'-এ এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে খিয়াল আল-কাতেব-এর 'কিতাবুল খারাজ' এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৬. 'মু'জিমুল-উদাবা' বা 'ইরশাদুল-আরীব ফী মা'রিফাতিল আদীব' গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় ইয়াকূত আর-রুমী উল্লেখ করেছেন, আলী ইবনে আহমাদ ইবনে বুস্তাম একজন 'খারাজ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা বড় আলিম।

১৭. আবু নসর মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ আল-আইয়্যাম শিয়া মতাবলম্বী মনীষী 'কিতাবুল যিযিয়া ওয়াল খারাজ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলে আল-ফিহরিস্ত এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. ইবনে রজব 'ইসতিক খারাজু আহকামুল খারাজ' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে হাফেজ মুজীবুল্লাহ নদভী তাঁর তাবঈ তাবিঈন নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।[১৩০]

---

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩ – ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

এই পর্যায়ে আরও যে ছয় জন মনীষী ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এখানে তাদের উল্লেখ করা হলোঃ

(১) মু'য়াবিয়া ইবনে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে ইয়ামার আল-আশ'য়ারী (মৃ. ১৭০ হিজরী/৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)।

(২) আবূ আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করীম। তাঁর কিতাবের নামও 'কিতাবুল খারাজ'।

(৩) আবু বকর আল খাল্লাল আল-বাগদাদী (মৃ. ৩১১ হিজরী/৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)।

(৪) কাযী ইসমাঈল ইবনে ইসহাক (মৃ. ২৮২ হিজরী/৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল আমওয়াল ওয়াল মাগাজী'।

(৫) আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনে জানূজাভীয়া (মৃ. ২৫১ হিজরী/৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)।

(৬) আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে নছর আদ্-দাউদী (মৃ. ৪০২ হিজরী/১০১১ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম "কিতাবুল ফিহিল আমওয়াল।"

গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাসে ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার পর্যায়ে এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সবের বর্তমান সময় মাত্র তিনখানি ছাড়া আর কোন গ্রন্থেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই প্রসংগে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসের এই দুঃখময় ও মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক প্রাচীনকালের গ্রন্থাবলীর প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতার পাদপীঠ বাগদাদ, মিশর ও আন্দালুসিয়ার বিশাল গ্রন্থাগারসমূহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বমানব এক মহামূল্যবান সম্পদ থেকে যে চিরকালের তরে বঞ্চিত হয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান সময়ে যে তিনখানি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ

(ক) ইমাম আবূ ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ'।

(খ) ইয়াহইয়া ইবনে আদাম আল-কুরাশী রচিত "কিতাবুল খারাজ" এবং

(গ) কুদামাহ ইবনে জা'ফর ইবনে কুদামাহ্ ইবনে যায়েদ প্রণীত 'কিতাবুল খারাজ ওয়াসানাআতুল কিতাবাতু'।

অবশ্য বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে আবূ উবাইদ আল-কাসেম ইবনে মালাম (মৃ. ২২৪ হিজরী/৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত 'কিতাবুল আমওয়াল' এবং আল্লামা আবুল হাসান আল-মা'আর্দি (মৃ. ৪৫০ হিজরী/১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানীয়া' এই দুই খানি গ্রন্থকেও ইসলামী অর্থনীতি পর্যায়ে গণ্য করা চলে। কেননা এ গ্রন্থদ্বয়ে 'খারাজ' বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ইমাম শাফেয়ী (র.) রচিত 'কিতাবুল উম্ম'-

Dhaka University Institutional Repository

এও 'খারাজ' সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কুদামাহ ইবনে জা'ফর-এর সমসাময়িক ইবনে খাজরুয়াবা নামক এক ভূগোল-পারদর্শী মনীষী তাঁর 'আল মামালিক ওয়াল মাসালিক' নামক গ্রন্থেও এই পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। ইবনে মুকাফ্ফা খলীফা মানসূরের নামে লিখিত 'রিসালাতুস সানআ' গ্রন্থেও 'খারাজ' ও খারাজ সম্পর্কিত ব্যাপারাদির সংগঠন পর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[১৩১]

মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দীন আর-রীস্ একালের একজন মিশরীয় ইসলামী অর্থনীবিদ। তিনি তাঁর লিখিত 'আল খারাজু ফিল দাওলাতুল ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: মা-'আর্দীর আহকামুস সুলতানীয়া' গ্রন্থে খারাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাপক, সুষ্ঠ ও সুসংবদ্ধ আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন বলে এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কাজী আবূ ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-ফাররা (মৃ. ৪৫০ হিজরী / ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ)-র ও 'আল-আহকামুস-সুলতানীয়া' নামের একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তাতেও 'খারাজ' সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই দুইখানি গ্রন্থ মূলত ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে হলেও প্রাসংগিকভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public Finance) পর্যায়ে 'খারাজ' সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে জুমা'য়ার কিতাব তাহরুরুল আহকাম ফি তাদবিরুল ইসলাম-এর উল্লেখ অপ্রাসংগিক হবে না। তিনি অষ্টম হিজরী শতকের (মৃ. ৭৩৩ হিজরী) লোক। মিশরের অধিবাসী ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এই গ্রন্থখানি মূলত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিরও বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সে আলোচনা প্রধানত, 'গণীমত' পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। তাঁর মোট আলোচনাকে তিনি দশটি অনুচ্ছেদে বিস্তৃত করেছেন। এক কথায় বইখানি যেন একটি 'ইসলামী রাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্র'। বিশেষত, ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এই গ্রন্থখানির গুরুত্ব চিরকালই অনস্বীকার্য হয়ে থাকবে। আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান বা অর্থনীতি দু'টি বিষয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অবিচ্ছিন্ন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা অর্থশাস্ত্র-ও এর ব্যতিক্রম নয়।

মুসলিম মনীষী ও ফকীহগণের ভূমিকা:

মুসলিম মনীষী ও ফকীহগণ ইসলামের সকল পর্যায়ের আইন বিশ্লেষণের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ, গবেষণা ও নীতি উদ্ভাবন অব্যাহত রাখেন। তারা সুনির্দিষ্টভাবে অর্থনৈতিক নীতিমালা আবিষ্কার ও বিন্যস্ত করতে যেয়ে এ কাজগুলো করেননি। বরং তাদের অন্যান্য গবেষণার অংশ হিসেবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক রীতিনীতি পর্যালোচনা করেন। তাদের গবেষণা ও পর্যালোচনা ইসলামি অর্থনীতির যাত্রা সুগম করে তোলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকজন ফকীহ এবং মুসলিম মনীষীর কথা উল্লেখ করা যায়। যাদের গবেষণা ও রচনা ইসলামি অর্থনীতির শাস্ত্রীয় যাত্রায় প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে। যেমন:

---

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪ – ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.): দ্বিতীয় পর্যায়ের ফকীহগণ এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসূফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি 'কিতাবুল খারাজ' নামে ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ক একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যাকে ইসলামি অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল বিবেচনা করা হয়। এ গ্রন্থে তিনি বিধান বর্ণনার সাথে সাথে কর নির্ধারণে ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা, কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি জমির উপর কর আরোপের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করেন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।[১৩২] বলা যায়, কিতাবুল খারাজের মাধ্যমে ইসলামি অর্থনীতির প্রথাসিদ্ধ যাত্রা শুরু হয়।

(খ) ইমাম মুহাম্মদ (স.): কিতাবুল খারাজ স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক গ্রন্থ রচনায় একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এ ধারায় মুহাম্মদ বিন হাসান রচনা করেন 'কিতাব আল আসল'। নিজ গ্রন্থে তিনি ভাড়া (ইজারা), ব্যবসায় (তিজারা), কৃষি (মুযারাআ) এবং শিল্প (সিনআ) কে হালাল উপার্জনের পদ্ধতি হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং এগুলোর প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। মুমিন হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য পবিত্র উপার্জনের ভূমিকা ইমাম মুহাম্মদের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। বায় সালাম বা অগ্রিম বিক্রয়, বায় মুশারাকা বা অংশীদারী কারবার, বায় মুদারাবা বা শ্রম-পুঁজির অংশীদারী ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিধি-বিধানসহ তিনিই প্রথম বিন্যস্ত করেন।[১৩৩]

(গ) আবু উবায়দ: আবু উবায়দ আল-কাসিম বিন সাল্লাম 'কিতাব আল-আমওয়াল' নামে একটি গ্রন্থ রচজনা করেন। এটি ছিল মূলত মুসলিম শাসনামলের সরকারি অর্থব্যবস্থার অনবদ্য দলীল। এতে তিনি শাসক-শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য, যাকাত, উশর, খুমুস, ফাই, খারাজ, জিযিয়া ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন। গ্রন্থটি মুসলিম শাসনের প্রথম দু'শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।[১৩৪]

(ঘ) আল মাওয়ারদী: আরব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল মাওয়ার্দীর লেখা 'আল আহকামুস সুলতানিয়া' সাধারণ বিবেচনায় রাষ্ট্র, সরকার ও শাসন ব্যবস্থা ভিত্তিক গ্রন্থ হলেও এতে সরকারি আয়-ব্যয়, সরকারি জমি, খাস জমি, বাজার ব্যবস্থা, পণ্য পরিমাপ, ব্যবসায়ীদের লেনদেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৩৫]

---

১৩২. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, দারুল কুরআন ওয়া উলুমিল ইসলাম, লাহোর, ১৯৮৬

১৩৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.), কিতাব আল-আসাল, দায়েরায়ে মাযারিফ, হায়দারাবাদ।

১৩৪. আবু ওবায়িদ আল-কাসিম, কিতাব আল আমওয়াল দ্রষ্টব্য, অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৯

১৩৫. ইমাম আল মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

কথা অধিকাংশ মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়করা পর্যন্ত অস্বীকার করেন। এমন দারুন দুঃসময়েও একদল সাহসী মানুষ হতাশ হননি। তাঁদের অব্যাহত চেষ্টা-গবেষণায় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকেই প্রচলিত অর্থনৈতিক গবেষণার পাশাপাশি ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা শুরু হয়।[১৪০]

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে (১৯২১–৩০) ইসলামি অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুসলিমদের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তোলেন ড. মুহাম্মদ ইকবাল, সইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, হাসান আল বান্নার মত কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য মনীষী। চল্লিশের দশকে (১৯৩১–৪০) এসে তাঁদের চিন্তা বাস্তবায়নের চেষ্টা অধিকতর সংগঠিত রূপ লাভ করে। এ সময়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামি অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে দাবি ও উদ্যোগ জোরদার হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকে (১৯৪১–৫০) পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে (১৯৪৭) এ দাবি বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কেননা ইসলামি আদর্শ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার নিয়েই পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল। এমনকি ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইসলামি আদর্শের আলোকে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু বাস্তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগেনি। ফলে পঞ্চাশের দশকে ইসলামি অর্থনৈতিক আন্দোলন আলাপ-আলোচনা, গবেষণা, লেখালেখি ও জনমত তৈরির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

পরবর্তীতে ড. মুনজের কাহফ, ড. এম উমর চাপড়া, ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকি, ড. আব্দুল হামিদ, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ-সহ আরো কয়েকজন মুসলিম অর্থনীতিবিদ আধুনিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি অর্থনীতির বাস্তব রূপরেখা পেশ করেন। কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে বিন্যস্ত এ রূপরেখার আলোকে এবং ইসলামি অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংকিং ধারা সূচিত হয়েছে। এ ব্যাংকিং কেবল একটি নতুন ধারার ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেনি বরং ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকেই বাস্তব করে তুলেছে। এখন বিশ্বের অধিকাংশ সচেতন মানুষই জানে, ইসলামের একটি স্বতন্ত্র অর্থনীতি আছে। সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয়, যেদিন মানুষ তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রচলিত ধারার সকল অর্থনীতির শঠতার বেড়াজাল ছিন্ন করে, শোষণের নাগপাশ থেকে সত্যিকারের মুক্তি পেতে ইসলামি অর্থনীতি চালুর সংগ্রামে নিবেদিত হবে।[১৪১]

ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব:

বর্তমান বিশ্বে যে সব অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এগুলোর কোনটিতেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণ সফলতা নেই। বরং সব কটিতেই রয়েছে চরম প্রান্তিকতা। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি, উন্নতি এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ আল্লাহর বিধান ও মহানবী (স.)-এর আনীত

---

১৪০. মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টিই বিভিন্ন মতবাদের আদর্শিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তবেই আমরা ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। বস্তুত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল:

১. পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজ মালিকানায় রাখারই কেবল সুযোগ রয়েছে তা নয়। বরং এতে সকল প্রকার উৎপাদন উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান আছে। নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থ উপার্জন করা এবং যে কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহার করার এমন কি সম্পদ ধ্বংস করার সুযোগ রয়েছে। এমনিভাবে যেখানে ইচ্ছা কল-কারখানা স্থাপন করা এবং যথেচ্ছা মুনাফা হাসিল করারও এতে অবাধ ব্যবস্থা রয়েছে। এতে যেমন শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে শোষণ করে যতদূর ইচ্ছা মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।[১৪২]

২. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা কেবল বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যেই নয়, বরং একই শ্রেণী এবং একই দলের বিভিন্ন লোকদের মধ্যেও তা কার্যকর রয়েছে। মূলত এটা বাঁচার লড়াই নামক দার্শনিক শ্লোগান হতেই উদ্ভূত।[১৪৩]

৩. মালিক ও শ্রমিকের অধিকার পার্থক্য করণ এই ব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি।

৪. চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে, রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন এবং আয় উৎপাদনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, জনগণের অর্থ উপার্জনের জন্য অবাধ সুযোগ করে দেওয়া। জনগণ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে, এর বাস্তব ব্যবস্থা করে দেওয়াই রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্তব্য।[১৪৪]

৫. সুদ, জুয়া এবং প্রতারণামূলক কর্মকান্ড পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। বিনা সুদে কাউকে কিছু দিনের জন্য কোন অর্থ দেওয়া পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন হোক কিংবা অভাব অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হোক কিংবা অর্থ উপার্জনের উপায় স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্য হোক, কোন প্রকারের লেনদেন বিনাসুদে সম্পন্ন করা পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক।[১৪৫]

---

১৪২. মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রশীদ, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ১০
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোন নীতি কল্যাণজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে রয়েছে মানবতার অকল্যাণ। এ কারণেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে তা মানুষের মধ্যে যথেষ্ঠ আলোড়ন সৃষ্টি করে বটে কিন্তু এর প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এর অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও ক্ষতিকর দিকগুলি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উপার্জিত ধনসম্পদের একচ্ছত্র মালিক। এতে অন্য কারো অধিকার নেই। নিজের উপার্জিত সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে মওজুদদারীও করতে পারে। এতে প্রতিবাদ করার কারো অধিকার নেই। আর এই মতবাদের ফলে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল লোক গোটা সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধনসম্পদ এ উপায় উপাদান গ্রাস করে নিয়ে রাতারাতি ধনকুবের হয়ে বসে। অপরদিকে দেশের কোটি কোটি অসহায় মেহনতী মানুষ শ্রম দিয়ে কোন মতে জীবন যাপন করতে থাকে। এরূপ অর্থব্যবস্থা প্রচলিত সমাজে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মায়া-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী কোনভাবেই বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। যারা এ মতবাদের আবিষ্কারক ছিল তারা পুঁজিবাদী সমাজের মাযলূম-শোষিত মানুষকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, ব্যক্তি মালিকানাই সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই ব্যক্তি মালিকানাকে উচ্ছেদ করতে পারলেই সকল অশান্তি এবং শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটবে। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপাদান ও যন্ত্রপাতি জাতীয় মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯১৭ সনে রাশিয়ার এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে আর্থ-সামাজিক উন্নতির পরিবর্তে দেশে এক ভয়াবহ অবস্থার সূত্রপাত ঘটায়। সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার জনসাধারণের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেওয়া হয়। বস্তুত এ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সামষ্টিক যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত নয়। মোদ্দাকথা, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র কোনটিই মানুষের প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হয়নি। বরং উভয়বিধ ব্যবস্থায় মানব জীবনকে আরো অধিকতর জটিল করে তুলেছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম এই দুই পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী, এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে। তবে এ মালিকানা অবাধ এবং শর্তহীন নয়, বরং শর্তযুক্ত। আর সেই শর্ত হল, ব্যক্তি মালিকানা সর্বদা সামাজিক স্বার্থের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তির আয়ের খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে তেমনিভাবে ব্যয়ের খাতসমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম কিংবা ধনবৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এরই ফলে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হল যে, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার জন্য কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।[১৪৬]

---

১৪৬. মাওলানা হাফিজুর রহমান (অনু.) মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ২৭–৩২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ, মালিকানা ও এর গুরুত্ব

* সম্পদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
* সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
* ইসলামে সম্পদের মালিকানা
* ইসলামে সম্পদের মালিকানার ধরণ ও প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ উপার্জন ও সুষম ব্যয়-বণ্টনের উপর একটি জাতি বা দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন অঢেল সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে না পারে তা মূলত রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। মানুষের আয়-উপার্জন ও ব্যয়ে কি নীতি অবলম্বিত হবে তাও নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুই অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারাম প্রসঙ্গে পুরোপুরি উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত বিধায় উপার্জনে অসততা এবং ব্যয়ে অনৈতিকতার সুগোগ থেকে যায় এবং কার্যত তা করাও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এই দুই অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতিতে সীমিত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত বিধায় সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা হচ্ছে আমানতী মালিকানা এবং সম্পদের মূল মালিকানা হচ্ছে আল্লাহর। তাই ব্যক্তিকে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল মালিকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে বিধায় সচেতন থাকতে হয়। সম্পদের অপব্যয় ইসলামে নিষিদ্ধ, পক্ষান্তরে মানবতার কল্যাণে ব্যয়ের প্রতি রয়েছে বিপুল অনুপ্রেরণা। ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, যার মাঝে পুঁজিবাদী শোষণ কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের সুযোগ থাকে না।

সম্পদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য:

আরবী 'মাল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ধন-সম্পদ, সম্পত্তি ইত্যাদি। মানুষের মারিকানাধীন বস্তুকে 'সম্পদ' বলে। অর্থাৎ 'সম্পদ' এমন বস্তু যার প্রতি মানুষ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং যা সঞ্চয় করা যায়। যেমন: নগদ জিনিসপত্র (টাকা-পয়সা; সোনা-রূপা ইত্যাদি) এবং যা নগদ জিনিসের বিকল্প হতে পারে।[১] যেমন বলা হয় তুমি যে সমস্ত জিনিসের মালিকানা লাভ করেছ তাই 'সম্পদ'।[২]

কোন বস্তুর মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে তাকে 'সম্পদ' হিসাবে গণ্য করা হয়। (ক) জিনিসটি ব্যবহারযোগ্য হবে, অন্য কথায় বলা যায়, জিনিসটি মানুষের জন্য উপকারী হতে হবে এবং (খ) জিনিসটির ব্যবহার শরী'আত অনুমোদন করে-এমন হতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, শরী'আত জিনিসটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেনি। অতএব যে জিনিস ব্যবহারযোগ্য নয় অথবা যার ব্যবহার শরী'আতে সরাসরি নিষিদ্ধ তা 'সম্পদ' নয়। যেমন: মদ, শূকর ইত্যাদি।[৩]

সম্পদের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

সাধারণ কথায় সম্পদ বলতে টাকা-পয়সা, জমিজমা ও ধনসম্পত্তিকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে অর্থনৈতিক দ্রব্যকে

---

১. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও হামিদ সাদিক, মু'জামুলুগাতিল ফুকাহা, করাচী, পৃ. ৩০৬

২. ইবন মানযূর, লিসানুল আরাব, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৩, পৃ. ৪০৩

৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বুঝায়। যে সকল দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, যার উপযোগিতা আছে, যোগান সীমাবদ্ধ, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তর মূল্য আছে অর্থনীতিতে একে সম্পদ বলা হয়।[৪] অর্থনীতিতে বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় ধরনের দ্রব্যই সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে সম্পদ হতে হলে দ্রব্যের অবশ্যই বিনিময় মূল্য থাকতে হবে, যেমন কলম, জমি প্রভৃতি বস্তুগত এবং ব্যবসায়ের সুনাম অবস্তুগত সম্পদ। এদের বিনিময় মূল্য আছে বলেই এগুলো সম্পদ। আবার যেসব দ্রব্য সহজলভ্য অর্থাৎ সহজেই পাওয়া যায় সেগুলো সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না; যেমন আলো, বাতাস ইত্যাদি। এর উপযোগিতা আছে কিন্তু চাহিদার তুলনায় এগুলোর যোগান অসীম এবং এদের জন্য কোন মূল্য প্রদান করতে হয় না বলে এমন সম্পদ নয়। এক কথায় বিনিময় মূল্য আছে এমন সব দ্রব্যকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে, মানুষের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা প্রভৃতি যা হস্তান্তরযোগ্য নয় কিন্তু এর দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জন করতে পারে তাকে নিজস্ব সম্পদ বলা যতে পারে।[৫] এক কথায় মানুষ যা অর্জন করে তাই সম্পদ।

অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায়-যে সব দ্রব্য সামগ্রী বাহ্যিকভাবে পরিদৃষ্ট, হস্তান্তরযোগ্য, মানুষের প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে অথচ তার যোগান সীমাবদ্ধ এমন দ্রব্য সামগ্রীকে সম্পদ বলে। আধুনিক কালে অবস্তুগত কিছু কিছু বিষয় দ্বারাও মানুষ অর্থ উপার্জন করে থাকে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সেগুলোকেও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন ব্যবসায়ের সুনাম, নার্সের সেবা ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তু থেকে পৃথক করা যায় না এমন বিষয়কে শরীয়ত মাল বলে স্বীকার করে না।[৬]

যদিও অনেকেই মানব প্রকৃতি যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকেই মাল বলেছেন। কিন্তু আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' এ থেকে বুঝা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের বিদ্যমান সব কিছুই মানুষের প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে, অতএব ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। তবে সব বস্তু সব কালে মানুষের নিকট সমান প্রয়োজনীয় থাকে না। এক কালে মানুষ যা প্রয়োজনীয় মনে করে; যা আহরণে প্রবৃত্ত হয়, অন্যকালে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আবার কে কালে যা প্রয়োজনীয় নয় বলে ফেলে দেওয়া হয়, অন্য কালে তাই হয়ত মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়। যেমন: পশু-পাখী ও মানুষের মল-মূত্র, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি। এক কালে এগুলোর কোনই মূল্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এগুলো থেকে বায়ুগ্যাস তৈরী হচ্ছে। ফলে এগুলো মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আবার এক দেশের মানুষের কাছে যা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়, অন্য দেশের মানুষের নিকট তা হয়রত অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। অতএব কোন বস্তু মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় হওয়া না হাওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক।[৭]

---

৪. মোঃ আবু তাহের, ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং, তামান্না পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৮৪
৫. Alfred Marshal, Principles of Economics, London, 1890, P. 90
৬. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৫০
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সম্পদ কী?

সাধারণভাবে মানুষ যা অর্জন করে তাই সম্পদ হলেও ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মানুষ যেসব হালাল বস্তু বৈধ বা হালাল পন্থায় অর্জন করে এবং নিজ আওয়াতধীনে থাকে তাকেই ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জনের দুটো দিক থাকতে হবে। একটি প্রক্রিয়া, অপরটি বস্তু। এ দুটোই হালাল বা বৈধ হতে হবে। যদি প্রক্রিয়া বা নীতি-পদ্ধতি অবৈধ হয় এবং অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয় তবে তা যেমন হালাল হবে না, বরং নীতি-পদ্ধতিও হালাল বা বৈধ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, বস্তু বৈধ ও হালাল হতে হবে। বস্তুর মধ্যে হারামের অংশ থাকলে তাকেও সম্পদ বলা যাবে না। যেমন শরীয়ত ঘোষিত হারাম পশু শুকরের মাংস যত বৈধ প্রক্রিয়াতেই ক্রয় বা অর্জন করা হোক না কেন তা বৈধ বা হালাল হবে না এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সম্পদ বলে পরিগণিত হবে না, যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের বেলায় তা সম্পদ হিসাবে গণ্য।[৮]

সম্পদের বৈশিষ্ট্য: অর্থনীতির ভাষায় কোন বস্তুর সম্পদ হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য ৪টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে হবে।[৯]

১. বাহ্যিকভাবে পরিদৃষ্ট হওয়া:

যে বস্তু বাহ্যিভাবে পরিদৃষ্ট হবে না কিংবা যার বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব থাকবে না; তা সম্পদ হওয়ার যোগ্য নয়। জামা, কাপড়, আসবাব-পত্র ইত্যাদি বাহ্যিকভাবে পরিদৃষ্ট বলে সম্পদ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু মানবীয় গুণাবলী, প্রতিভা, দক্ষতা ইত্যাদি (ব্যক্তি থেকে যা পৃথক করা যায় না) সম্পদ হওয়ার যোগ্য নয়। বায়বীয় পদার্থগুলোর অবস্থিতি খালি চোখে পৃরিদৃষ্ঠ না হলেও তার বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং এগুলোও সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।

২. হস্তান্তরযোগ্য হওয়া:

অর্থাৎ বস্তুটি এমন হতে হবে যার মালিকানা হস্তান্তর সম্ভব। (কোন দ্রব্য) ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা সম্ভব না হলে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে না। জমির মালিকানা হস্তান্তর সম্ভব বলে তা সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু কারো ব্যক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষতা হস্তান্তর করা যায় না বলে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না। এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখি, নদী ও সাগরের মাছ এগুলোও হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে অর্থনীতির ভাষায় এগুলো মাল বা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না।

৩. উপযোগ বা প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা থাকা:

কোন বস্তুর প্রয়োজন পূরণের যোগ্যতা ও অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য বস্তুর উপযোগ থাকা অপরিহার্য। কেননা যে বস্তুর কোনরূপ উপযোগ নেই তা অর্থের বিনিময়ে কেউ ক্রয় করতে চায় না। সুতরাং তা সম্পদ

---

৮. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৯. আবু ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১–৫২

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে গণ্য হয় না। অবশ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোন বস্তু মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় হওয়া না হওয়ার বিষয়টি স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে আপেক্ষিক। তাই এক কালে কোন বস্তু সম্পদ বলে গণ্য না হলেও অন্যকালে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

৪. যোগান সীমাবদ্ধ হওয়াঃ

অর্থাৎ কোন বস্তু মানুষের প্রয়োজনে যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই রাখুক, আর তার বাহ্যিকতা যতই সুস্পষ্ট হউক এবং যতই হস্তান্তরযোগ্য হউক; কিন্তু তার যোগান যদি চাহিদার তুলনায় সীমিত না হয়, বরং তার যোগান যদি এমন পর্যায়ে থাকে যে, মানুষ তা বিনা আয়েসেই অর্জন করতে পারে; তাহলে সে দ্রব্যও কেউ পয়সা দিয়ে কিনতে যায় না। অতএব তাও সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে না। যেমনঃ নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগরের পানি, বাতাস ইত্যাদি। তবে কেউ যদি নদী পানির বোতলজাত করে বিক্রি করে তখন অবশ্য তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তখন তার মূল্যমান দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে প্রকৃতি থেকে অক্সিজেন আহরণ কর কেউ যদি সিলিন্ডারে আবদ্ধ করে মুমূর্ষ রোগীর জন্য সরবরাহ করে, তখন তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সিলিন্ডারে ভরা অক্সিজেন ও বোতলজাতকরা বিশুদ্ধ পানির যোগান সীমাবদ্ধ। তাই এগুলোকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগঃ

সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার-১. অস্থাবর সম্পদ ২. স্থাবর সম্পদ।

অস্থাবর সম্পদ : যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব তাকে অস্থাবর সম্পদ বলে। যেমনঃ গৃহপালিত জীবজন্তু, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা ইত্যাদি। এককথায় যা সহজেই স্থানান্তরিত করা যায় তাকে অস্থাবর সম্পদ বলে।[১০]

স্থাবর সম্পদঃ

যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং তার প্রকৃতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে স্থানান্তর করা যায় না তাকে স্থাবর সম্পদ বলে। যেমনঃ জায়গা-জমি, দালান-কোঠা ইত্যাদি।[১১]

মূল্যমান বিচারে সম্পদের বিভাজনঃ

প্রাচীন ইসলামী অর্থনীতিবিদরা মূল্যমান বিচারে মাল-সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

১. এমন সম্পদ যার মূল্য রয়েছে।

২. এমন সম্পদ যার মূল্য নেই।

জামা-কাপড়, খাদ্য দ্রব্য, আসবাব সামগ্রীর যেহেতু মূল্য রয়েছে অতএব এগুলো মূল্যমান বিশিষ্ট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ড্রেনের ময়লা পানি, আবর্জনা, মৃত প্রাণী এগুলো মূল্যহীন মালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

১০. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও হামিদ সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭
১১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য কোন কোন দ্রব্য অতি সম্মানী বিধায় শরীয়ত সেগুলোকে মূল্য নির্ধারণের উর্ধে মনে করে। অতএব সেগুলোকেও অমূল্য সম্পদ বা মূল্যবিহীন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আবার কোন কোন দ্রব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি জঘন্য বিধায় ইসলামী বিধানে সেগুলোকেও মূল্যহীন সম্পদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনঃ শুকর, মৃত প্রাণী ইত্যাদি।

কোন কোন পদার্থ জীবন রক্ষাকারী ও মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিধায় শরীয়ত তার মূল্য নির্ধারণ করতে স্থায়ীভাবে নিষেধ করেছে। যেমনঃ আগুন, পানি, বাতাস, লবণ, প্রাকৃতির লতা-পাতা ও ঘাস যা খেয়ে পশু জীবন ধারণ করে। এক হাদীসে আছে, সকল মুসলমান তিন বস্তুতে সমানভাবে শরীক; যথাঃ আগুন, পানি ও ঘাস।[১২] কোন কোন বর্ণনায় লবণের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

মৌলিক দিক বিচারে সম্পদের বিভাজনঃ প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা মৌলিক দিক বিচারে সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ ১. জৈব সম্পদ ২. জড় সম্পদ।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এইসব বিভাজন মূলতঃ আলোচনার সুবিধার্থে গবেষকদের উদ্ভাবিত বিভাজন। সুতরাং প্রসারমান অর্থনীতির আলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য ভিন্ন কোন আঙ্গিকে বিভাজন করতে কোন অসুবিধা নেই।[১৩]

মালিকানার বিচারে সম্পদের বিভাজনঃ

মালিকানার বিচারে সম্পদকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

১. ব্যক্তিগত সম্পদ ২. সমষ্টিগত সম্পদ

৩. জাতীয় সম্পদ ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।[১৪]

১। **ব্যক্তিগত সম্পদ :** ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমনঃ ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত, জমি-জিরাত, ঘর-বাড়ী, আসবাব-পত্র, যানবাহন, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পদের উপর সম্পদের মালিকেরই অধিকার থাকে, অন্য কারো তাতে স্বাভাবিকভাবে থাকে না।

২। **ক. সমষ্টিগত সম্পদঃ** সমাজের মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য জনগণের উদ্যোগে বা সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে সম্পদ গড়ে উঠে তাকে বলা হয় সমষ্টিগত সম্পদ। যেমনঃ রাস্তাঘাট, পুল-বাধ, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, হাসপাতাল, পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। সমাজের সকল মানুষেরই এগুলো ব্যবহারের সমান অধিকার থাকে।

২. খ. রাষ্ট্রীয় সম্পদঃ সম্পদের যে অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে। যেমনঃ বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, রেল, বিমান, রাষ্ট্রীয়করণকৃত মিল, কারখানা ইত্যাদি। মূলতঃ

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহও সমষ্টিগত সম্পদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর সুযোগ-সুবিধা ও লভ্যাংশ দেশের জনগণই ভোগ করে থাকে।

৩. জাতীয় সম্পদঃ একটি দেশের মোট সম্পদের সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। অতএব দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ এসব কিছুর সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়ে থাকে। এ কারণেই দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পদকে জাতীয় সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবার দেশের নাগরিক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিদেশে বিদ্যমান সম্পদকে জাতীয় সম্পদের হিসাবের সাথে যোগ করা হয়। সমগ্র জাতি সামষ্টিকভাবে এই সম্পদের মালিক।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পদঃ বিশ্বচরাচরে যে সব সম্পদ কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মালিকানাধীন নয়; বরং বিশ্বের সব দেশই সম্পদ সমানভাবে ভোগ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে; তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক সম্পদ। পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদ-নদী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পদ বলে গণ্য হয়।

উৎপত্তিগত দিক বিচারে সম্পদের বিভাজনঃ

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা উৎপত্তিগত দিক বিচারে সম্পদকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. প্রাকৃতিক সম্পদ   ২. মানুষ্য সৃষ্ট সম্পদ।

বস্তুতঃ বিশ্বচরাচরে বিদ্যমান সব কিছুই সম্পদ। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[১৫]

কুরআনে সকল সম্পদের মৌলিক উপকরণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতির যেসব বস্তু সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে কিংবা মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করে থাকে; সেগুলোকে বলা হয় প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমনঃ নদ-নদী, বনভূমি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। আর প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মানুষ তার বুদ্ধিমত্ত্বা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করে; তাকে বলা হয় মানুষ্যসৃষ্ট সম্পদ। যেমনঃ কৃষিপণ্য, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যানবাহন, পথঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।

অবশ্য অনেকেই মানবিক সম্পদ নামে সম্পদের একটি ভিন্ন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং মানুষের মানবিক গুণাবলী যথাঃ স্বাস্থ্যগত ফিটনেস, প্রতিভা, দক্ষতা, উদ্যোগ, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কেননা এগুলোর দ্বারাও মানুষ আয় উপার্জন করে থাকে। কমপক্ষে এগুলোর দ্বারা তার অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হয়, বেতন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি থেকে পৃথকভাবে এর কোন অস্তিত্ব নেই এবং এগুলো হস্তান্তরযোগ্য নয়, অতএব এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ বলে গণ্য হবে না।

---

১৫. আল-কুরআন, ৩১:২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক সম্পদের বিভাজন

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়।

কৃষি সম্পদঃ

ভূমি উৎকর্ষণ, চাষাবাদ, বপণ, রোপণ করে যে সম্পদ আহরণ করা হয়; তাকে বলা হয় কৃষি সম্পদ। ভূমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী ও উন্নত প্রযুক্তিকে কৃষি উৎপাদনের সহায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। আল-কুরআনে এই কৃষি সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিস্তর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–যমীনে বিভিন্ন শষ্যক্ষেত্র রয়েছে, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আছে আঙ্গুরের বাগান এবং রয়েছে শস্যাদি ও খেজুরবৃক্ষ; যার একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত, আবার কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটিকে চাইতে উৎকৃষ্ট করে দেই। এসবের মাঝে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[১৬]

আল্লাহই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীণ হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে নির্গত করেন।[১৭]

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা আমি উদ্ভিদের চারা উদগম করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা জন্ম দেই, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের আটি হতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আর আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বগু; যার কতিপয় একে অন্যের সদৃশ্য ও কতিপয় বৈসাদৃশ্য। লক্ষকর তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং লক্ষ কর তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। নিশ্চয়ই এসবে মু'মিন সম্পদ্রায়ের জন্য নিদর্শন রছেছে।[১৮]

মানুষ তার খাদ্য সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করুক (তার উৎপাদনের জন্য তো) আমিই পর্যাপ্ত বারি বর্ষণ করি, অতপর আমি ভূমিকে যথার্থভাবে বিদীর্ণ করি এবং তথায় আমিই শস্যাদি, আঙ্গুর, শাকসবজি, যায়তুন, খেজুর এবং বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ উদ্যান, ফলমূল ও গবাদী পশুর আহার্য উৎপন্ন করি। এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর ভোগের জন্য।[১৯]

তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখ। অতঃপর আমি যখন তাতে বারি বর্ষণ করি তখন তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং তা উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[২০]

সাহাবীদের অনুপম আদর্শের উপমা দিতে যেয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত একটি চারার ন্যায় যা প্রথমে কচি কিশলয় উদ্গত করে, অতপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় ও পরে কান্ডের উপর সুদৃঢ় হয়ে দাড়ায়, যা চাষীকে অবিভূত করে। এদ্বারা কাফেরদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টিই উদ্দেশ্য।[২১]

---

১৬. আল-কুরআন, ১৩:৪
১৭. আল-কুরআন, ৬:৯৫
১৮. আল-কুরআন, ৬:৯৯
১৯. আল-কুরআন, ২৪:৩২
২০. আল-কুরআন, ২২:৫
২১. আল-কুরআন, ৪৯:২৯

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা কৃষি কাজের মাধ্যমে যা উৎপাদন কর তার প্রতি লক্ষ করেছ কি? তোমরা কি তা উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্ন করি।[২২]

অনুরূপভাবে কুরআনের বহু আয়াতে কৃষি ক্ষেত, শস্যাদি, বাগান, ফলমূল ও গবাদী পশুর আহার্য এবং এগুলোর উৎপাদনের প্রক্রিয়া ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে হয়েছে। যেগুলো দ্বারা মূলতঃ কৃষি সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া মহা-নিয়ামত, তারই কুদরতের মহা-নিদর্শন একথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কৃষি সম্পদ আহরণের জন্য কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে অনুগত কর দিয়েছেন (অর্থাৎ কর্ষণ দ্বারা বারবার তাকে উৎপীড়ন করা হলেও সে কিছু বলে না, অবাধ্য হয় না) অতএব তোমরা যমীনের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তাঁর দেওয়া রিয্ক আহার করা। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।[২৩]

অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।[২৪]

হে মানব জাতি! ভূমি উৎপন্ন বৈধ ও হালাল বস্তুসমূহ আহার কর।

এইসব আয়াতে মূলতঃ কৃষির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের উৎসাহই প্রদান করা হয়েছে। কেননা মানব জাতির যাবতীয় আহার্য মৌলিকভাবে ভূমি থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। পরে এগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রসেস করে বিভিন্ন ধরনের আহার্য তৈরি করা হয়। শিল্পকারখানা থেকে উৎপাদিত পণ্য মানুষের জীবনকে আয়েশ বহুল করে বটে, তবে বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষের খাদ্যসম্ভার ভূমি থেকে কৃষিকর্মের মাধ্যমেই উৎপাদন করা হয়। শুধু মানুষ কেন পশু পাখির খাদ্য চাহিদাও ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে পূর্ণ হয়।

এ কারণেই ইসলাম কৃষি উৎপাদনের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করেছে। রাসূল (স.) ও কৃষি কর্মকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, 'কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা কোন কৃষি পণ্য উৎপাদন করে, আর তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ কিংবা প্রাণী কিছু আহার করে; তাহলে তা তাঁর জন্য সাদাকাহ্ হিসাবে গণ্য হবে।[২৫]

বাযযারে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রাসূল (স.) ইরাশাদ করেছেন, 'যদি কিয়ামত সংঘটিত হতেও শুরু করে; আর তোমাদের কারো হাতে একটি চারাও থাকে তাহলেও সে যেন তা রোপণ করে ফেলে।'[২৬]

২২.. আল-কুরআন, ৫৬: ৬৩–৬৪

২৩. আল-কুরআন, ৬৭:১৫

২৪. আল-কুরআন, ৬২:১০

২৫. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০, পৃ. ৯৪৮

২৬. উদ্ধৃত: আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল হাদীস থেকে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া কৃষি কাজ যে একটি পবিত্র পেশা এবং উৎপাদনের নির্ভেজাল ও পবিত্রতম পন্থা তাও বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায়। বুখারী বর্ণিত এক হাদীসে নবী (স.) ইরশাদ করেছেন,'স্বহস্তে উৎপাদিত আহার্যের চেয়ে উত্তম আহার্য কেউ কখনও খায়নি।[২৭] আল্লামা মাওয়ারদী তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আহকামুস্ সুলতানিয়্যায়' উল্লেখ করেছেন যে, উৎপাদনের মৌলিক বিষয় হল দুটি; কৃষি ও ব্যবসা। তবে কৃষি আমার নিকট উত্তম।

আর কৃষি এ কারণেও উত্তম হবে, মানব জাতির জীবনের অস্তিত্ব এর উপর নির্ভরশীল। কৃষি পণ্যের অনেক কিছুই বর্তমানে কল কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের ৭৫% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের জাতীয় আয়ের ৪০% কৃষি থেকে আসে।

খনিজ সম্পদঃ

পরিভাষায় খনিজ সম্পদ বলা হয়, 'ভূমির অভ্যন্তরে এবং ভূমির বিভিন্ন স্তরে জলভাগ বা স্থল ভাগে মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ সন্নিহিত করে রেখেছেন তাকে বলা হয় খনিজ সম্পদ।[২৮] সোনা, রূপা, লোহা, তামাসহ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, তেল, পেট্রোল, কয়লা, লবণ, গন্ধক, চুনা পাথর, চীনা মাটি, কঠিন শিলা, সিলিকন বালু বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি খনিজ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন সূরায়ে যুলযালে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং ভূমি যখন তার খনিজ পদার্থসমূহ বের করে দিবে, তখন মানুষ বলবে এর কি হল?'[২৯]

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা যা উৎপাদন কর এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা নির্গত করে তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান কর।[৩০]

এইসব খনিজ সম্পদ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে। মানুষের জৈব জীবনের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থ মাটির সাথে মিশে আছে। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ মানুষের জৈব জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। খনিজ পদার্থসমূহ মুদ্রা, গহনা, আসবাব সামগ্রী, আহার্য, জ্বালানী ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া খনিজ পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করা হয়। বলতে গেলে মানব সভ্যতার স্থিতি ও অগ্রগতির পথে খনিজ পদার্থের ভূমিকা বিস্ময়কর। এইসব পদার্থের অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করেই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মাটির গভীর তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের পরতে পরতে জিবীকার অনুসন্ধান কর।[৩১] লৌহ ও লৌহজাতীয় পদার্থসমূহই আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিকাশের

---

২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. আল-কুরআন, ৯৯ : ২ – ৩
৩০. আল-কুরআন, ২:২৬৭
৩১. তাবারানীর উদ্ধৃত: আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মেরুদন্ড, যা মূলতঃ খনিজ পদার্থ। লোহার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করেই আল-কুরআনে ইরাশাদ হয়েছে, 'আমি লৌহকে সৃজন করেছি, তাতে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে এবং রয়েছে মানুষের প্রভূত কল্যাণ।'[৩২]

খনিজ পদার্থের বিধি-বিধান সম্পর্কে ফিকাহ-এর গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তথায় দৃষ্টব্য।

বনজ সম্পদ:

ভূ-পৃষ্ঠে মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বন জঙ্গল সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই বন জঙ্গলগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে এই বনভূমি ও জঙ্গলগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক বিজ্ঞানের জরিপ অনুসারে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের বাস উপযোগী ও স্বাভাবিক রাখার জন্য মোট ভূখন্ডের ২৫% ভাগ বনাঞ্চল থাকা একান্ত অপরিহার্য। এছাড়াও বন জঙ্গল থেকে মানুষ প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকে। বন জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করা যায়; যা ঘর-বাড়ী নির্মাণ, দরজা, জানালা, ফার্ণিচার, রেল লাইন, নৌকা, পুল নির্মাণসহ অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ মাটির নীচে চাপা পড়ে কালান্তরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়, যা জ্বালানী হিসাবে বহুবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কাঠ সরাসরি জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার হয়। বনাঞ্চল থেকে মানুষ ও গবাদি পশুর আহার্যও পাওয়া যায়। আল-কুরআনে এই বনজ সম্পদের উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর আমি তথায় (ভূ-পৃষ্ঠে) শস্যাদি, আঙ্গুর, শাক-শজী, যয়তুন, খেজুর এবং বৃক্ষলতায় পূর্ণ বন-উদ্যান, ফলমূল ও গবাদি পশুর আহার্য উৎপন্ন করি। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত গবাদি পশুর ভোগের জন্য।'[৩৩]

এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর তদ্দ্বারা আমি বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ বৃক্ষলতা ও শাকসব্জী উৎপন্ন করে থাকি। তোমরা তা থেকে আহার করে এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারগুলোকে তাতে চারণ করো।[৩৪]

বনজঙ্গলে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কাষ্ঠ বিক্রি করে মানুষ মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার যোগান দিতে পারে। এদিকে আলোকপাত করলেই রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহর শপথ, রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা এবং নিজ কাঁধে বহন করে এনে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা, অপরের সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা অপেক্ষা উত্তম।'[৩৫]

তাছাড়া বনজ প্রাণী বিক্রি করেও বহু অর্থ উপার্জন করা যায়।

প্রাণীজ সম্পদ:

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তা'আলা বহু প্রজাতির পশু-পাখি ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এগুলোও মানুষের কল্যাণেই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ

---

৩২. আল-কুরআন, ৫৭:২৫

৩৩. আল-কুরআন, ৮০: ২৪–৩২

৩৪. আল-কুরআন, ২০ : ৫৪

৩৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, সহীহ বুখারী, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০, পৃ. ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রয়েছে। যেসব প্রাণী বাহ্যত মানুষের জন্য ক্ষতিকর সেগুলোও অন্যভাবে মানুষেরই কল্যাণ করে যাচ্ছে। গভীর অরণ্যে যে বাঘ, ভাল্লুক ও বিষাক্ত সাপ বাস করে, সেগুলো না হলে মানুষ কবেই অরণ্য কেটে উজাড় করে ফেলত। অথচ অরণ্য ছাড়া পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেত না। তাই বাঘ, ভালুক আপন অস্তিত্ব দিয়ে অরণ্য সংরক্ষণ করছে। যে তেলাপোকা, ইঁদুর বাহ্যত আমাদের ক্ষতি ছাড়া উপকার করছে না তারাও অন্যভাবে আমাদেরই উপকার করে যাচ্ছেন। এগুলো থেকে জটিল ব্যাধির প্রতিষেধক তৈরী করা হয়ে থাকে।[৩৬]

প্রাণী গৃহপালিতই হোক কিংবা বন্য প্রাণীই হউক এগুলো দ্বারাও মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। যেমন পশুরু মাংস আহার্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বরং উপাদেয় আহার্য হিসাবে পশু পাখির মাংস আহার্য হিসেবে গ্রহণ করা করা হয়। বরং উপাদেয় আহার্য হিসেবে পশু-পাখির মাংসই অন্যতম। পশুর দুধ পান করা হয়ে থাকে, পাখির ডিম খাদ্য হিসেবে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য। পশুর চামড়া দিয়েও বিভিন্ন ধরণের পোষাক, জুতা, মোজ, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তার পশম দিয়ে পশমী কাপড় তৈরী করে শীত থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। তাছাড়া পশু মালামাল বহন এবং চাষাবাদের কাজেও ব্যবহার করা হয়। আরোহণ করে দূর দুরান্তে গমনের কাজেও পশু ব্যবহার করা হয়। পশু লালন-পালন করে তা বিক্রি করে যথেষ্ট আয় উপার্জন করা যায়। তাই প্রাচীনকালে যাযাবর শ্রেণীর মানুষ পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে নিয়েছিল। আল-কুরআনে পশু ও প্রাণীর বহুবিধ উপকারিতার প্রতি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, এবং পশু-প্রাণীসমূহকে তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাতে শীত নিবারণের উপকরণ এবং বহুবিধ উপকার নিহিত রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার্যও পেয়ে থাক।[৩৭]

আর তোমরা যখন গোধুলিলগ্নে চারণভূমি হতে সেগুলোকে গৃহে ফিরিয়ে আন এবং প্রভাতে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর সেগুলো তোমাদের বুঝা বহণ করে এমন দূর দূরান্তের দেশে নিয়ে যায়; যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক একান্ত সদয় ও পরম দয়ালু। আর ঘোড়া, খচ্চর, গাঁধা এগুলো (তিনি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য। আরোও তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জানা না।[৩৮]

প্রাণীর বিবিধ উপকারের প্রতি আলোকপাত করার পর ভবিষ্যতে যে আরো নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে যদ্বারা এসকল কাজ আঞ্জাম পাবে, তার প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, 'গবাদি পশুর মাঝে কতক রয়েছে ভারবাবী, তার কতক খর্বাকৃতিরও রয়েছে, সুতরাং তোমরা আহার কর; যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে রিযিকরূপে দিয়েছেন।[৩৯]

---

৩৬. আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৩৭. আল-কুরআন, ১৬:৫
৩৮. আল-কুরআন, ৬:৮
৩৯. আল-কুরআন, ৬:১৪২

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই প্রাণী কূলের মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তার উদরাভ্যন্তরের রক্ত ও চার্বিত খাদ্যের মাঝ থেকে নির্গত দুধ আমি তোমাদেরকে পান করাই যা একান্তই নিখাদ ও সুপেয় (সহজে গলদ্ধ করণের যোগ্য)।[৪০]

এমনকি মুক্তবনে উড়ে বেড়ায় যেসব বিহঙ্গ এবং যে ক্ষুদ্রাকার কীট-পতঙ্গ তিনি সৃষ্টি করেছেন; সেগুলোও মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য। এগুলোও মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনে কাজে আসে। প্রাণী বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে নিয়ে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু সব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে প্রকৃতিতে। আমাদের অজান্তে আল্লাহর সৃষ্ট এইসব মাখলুক আপন আপন ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন পূরণে বিরাট খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে চলছে। ছোট মৌমাছি মানুষের কি বিরাট সেবা দিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি আলোকপাত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা প্রতিপালক মৌমাছিকে ইশারা করলেন যে, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং তার (মানুষ) যে গৃহ বা মাচান তৈরী করে তাতে। অতঃপর প্রত্যেক ধরণের ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর এবং তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন কর। (দেখ) তার উদর থেকে নির্গত হয় (সুস্বাদু) পানীয়, যার রং হয় বিভিন্ন, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগ মুক্তির উপকরণ। অবশ্যই এতে চিন্ত াশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৪১]

মধুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। খাঁটি মধু উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। অধুনা মৌমাছির চাষ করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে।

এমনিভাবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র প্রতিটি প্রাণীই মানুষের জন্য মহাসম্পদ হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

তাছাড়া সাগরে যে প্রাণীরা রয়েছে তা দ্বারাও যে মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন পূর্ণ হয় এর প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তিনি সমুদ্রকে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার-যা তোমরা গহণা-ভূষণরূপে ব্যবহার করে থাক।[৪২]

পানি সম্পদঃ

পানি মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া এক অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পানির অপর নাম জীবন। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য এক অপরিহার্য উপাদান। পূর্বে উল্লেখিত কৃষিজ, বনজ ও প্রাণিজ সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। পানি না হলে ভূ-পৃষ্ঠ কবেই উৎপাদনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলত। এই পৃথিবী পরিণত হত মৃত ভূমিতে-যা মনুষ্য বসবাসের জন্য

৪০. আল-কুরআন, ১৬:৬৬
৪১. আল-কুরআন, ১৬: ৬৮–৬৯
৪২. আল-কুরআন, ১৬:১৪

Dhaka University Institutional Repository

কিছুতেই অনুকূল হত না। এই পানি সম্পদের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করে ও আল-কুরআনে বিস্তর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর শরীক করোনা।[৪৩]

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এও যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, ভয় ও আশা সঞ্চারক রূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।[৪৪]

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। তাদ্বারা আমি সর্ব প্রকার উদ্ভিদের অঙ্কুর উদ্‌গম করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে তাথেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং অঙ্গুরের উদ্যান গড়ে তুলি, আর যায়তুন ও দাড়িম্বও, যার কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ, আর কতিপয় বৈসাদৃশ্যপূর্ণও। লক্ষ্য কর তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয়, আর তার পরিপক্কতার প্রতিও (লক্ষ্য কর)। এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।[৪৫]

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর আবর্তনে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ সাগরে ভাসমান নৌযানসমূহে এবং আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেন যাদ্বারা ভূমি মৃতবৎ হয়ে যাওয়ার পর পূনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং তিনি যে এধরায় সকল প্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে, বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে (ভাসমান) অনুগত মেঘমালার মাঝে জ্ঞানবান জাতিসমূহের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৪৬]

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন-যাতে ওগুলো তাঁরই বিধানানুসারে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন নদীসমূহকে এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন চন্দ্র ও সূর্যকে, যারা অবিরত আপন নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন দিবস ও রজনীকে, আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা তাঁর নিকট কামনা করেছ তার সব কিছুই। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম ও অকৃতজ্ঞ।[৪৭]

৪৩. আল-কুরআন, ২:২২
৪৪. আল-কুরআন, ৩০:২৪
৪৫. আল-কুরআন, ৬:৯৯
৪৬. আল-কুরআন, ২:১৬৪
৪৭. আল-কুরআন, ১৪:৩২ – ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবন্ত বস্তুর উৎপাদন ও সৃজনে যে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আমি পানি থেকেই সকল জীবন্ত বস্তুকে সৃজন করেছি।'

উপরোক্ত আয়াতসমূহে পানি সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে পানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মসমূহেরও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনের সাথে পানির একট গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া পানির সাথে বিদ্যুতেরও যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে; তারও ইঙ্গিত সূরায়ে রূমের ২৪নং আয়াতে করে দেওয়া হয়েছে। তার সাথে সাথে পানির উৎসসমূহের প্রতিও সুকৌশলে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। পানির উৎস মোট ৩টি। যথা:

১. বৃষ্টির পানি ২. পুকুর, হাওড়, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরের পানি ৩. ভূগর্ভস্ত পানি।

পানির বহুবিধ ব্যবহার ও উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী উপাদান হিসাবে এর অপরিহার্যতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পানি থেকে আমরা বিপুল মৎস্য সম্পদ লাভ করি, যার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পানি দ্বারা অধুনা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে-যা আধুনিক সভ্যতার প্রাণশক্তি। সমুদ্রের পানিতে লবণ দ্রবিভূত রয়েছে-যা আহরণ করে আমাদের লবণের চাহিদা পূরণ হয়। পানির উপর দিয়ে নৌযান চলাচলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমুদ্রে মৎস্য ছাড়াও শৈবাল, বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, বিচিত্র ধরনের প্রাণী এবং মূল্যবান ধাতব ও খনিজ পদার্থের বিপুল সমাহার রয়েছে। অধিকতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাঝ দিয়ে এগুলো মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যেতে পারে। কে জানে একদিন হয়ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যাভাব পূরণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত এইসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।[৪৮] পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার মাধ্যমে সভ্যতাকে এভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে; তাকি মানুষ আগে কল্পনা করত? সমুদ্রের এই সম্পদ সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

"তিনি সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে মৎস-মাংস আহার করতে পার, আর যাতে তা থেকে তোমরা আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং নৌযানসমূহকে তোমরা তাতে চলাচলরত দেখতে পাও এবং সমুদ্রকে তিনি অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৪৯]

শক্তি সম্পদ:

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের পিছনে শক্তি সম্পদ হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত শক্তির মাধ্যমেই সচল করে রাখা হয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতার চাকা। বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তিই হল সব কিছুর চালিকা শক্তি। বিজ্ঞানের বদৌলতে

৪৮. আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৫
৪৯. আল-কুরআন, ১৬:১৪

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ অসাধ্যকে সাধন করছে। বিশ্বচরাচরে বিরাজমান বিভিন্ন উপাদানে এই শক্তিকে সন্নিহিত করে রেখেছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। যে কারণেই পদার্থকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে মানুষের জন্য। তাছাড়া প্রকৃতিতেও বিভিন্ন উপাদানকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, তা অহর্নিশ পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে সেই শক্তি সরবরাহ না করা হলে সেই পরিমাণ শক্তি হয়ত মানুষের জন্য উৎপাদন করা সম্ভব হত না। যেমন-সূর্যের কথা বলা যায়। অবিরত সে তাপশক্তি সরবরাহ করছে-যা দ্বারা পৃথিবীর তাপের চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে। বায়ু প্রবাহও অনন্তর বায়বীয় শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছে। যে বায়ুপ্রবাহকে মানুষ তার প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। পাল খাঁটিয়ে বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে এক দেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ চলে যাচ্ছে আরেক দেশে। প্রাচীনকালে পাল খাটিয়ে চাকার গাড়ী ব্যবহারের কথাও ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান পর্যন্ত মানুষ বেশ কিছু শক্তির আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যেমনঃ (ক) তাপশক্তি, (খ) বিদ্যুৎশক্তি (গ) আনবিক শক্তি (ঘ) সৌরশক্তি (ঙ) চুম্বক শক্তি।

(ক) তাপশক্তিঃ তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার আহার্যকে গ্রহণোপযোগী করছে, শীতের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করছে, বিভিন্ন ধরণের যানবাহন, কল-কারখানা ইত্যাদি চালাচ্ছে। সূর্য থেকে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিনিয়ত যে তাপ সরবরাহ হচ্ছে, তদ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি-এর যোগান হচ্ছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই তাপশক্তি সংগ্রহ করা হয়। যেমনঃ সূর্যের আলো থেকে, গাছ-পালা ও খড়-কুটা, জ্বালিয়ে, কয়লা, তেল ও পেট্রোল পুড়িয়ে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়েও এই তাপশক্তি সংগ্রহ করা হয়। এদিকে ইঙ্গিত কর আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন, অতঃপর তোমরা তদ্বারা প্রজ্জলিত কর।[৫০]

তোমরা যে আগুন প্রজ্জলিত কর তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছ কি? তোমরাই কি তার বৃক্ষসমূহের সৃষ্টি কর, না আমি তা সৃষ্টি করি।[৫১]

শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।[৫২]

(খ) বিদ্যুৎ শক্তিঃ মূলতঃ তাপশক্তির রূপান্তরিত রূপই বিদ্যুৎশক্তি। মানুষের বহুবিধ ব্যবহারে এই বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে-যা তাপ শক্তি দ্বারা সম্ভব ছিল না। ফলে এর ব্যবহার ক্ষেত্র অতি সম্প্রসারিত। অন্ধকার গৃহের আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে আধুনিক কম্পিউটার ও রোবট পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী দ্রব্য যেমনঃ গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পানির স্রোত থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝেও এও রয়েছে যে,

৫০. আল-কুরআন, ৩৬:৮০
৫১. আল-কুরআন, ৫৬: ৭১–৭২
৫২. আল-কুরআন, ৯১:১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারক রূপে, এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে মৃতবৎ হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।[৫৩]

(গ) আনবিক শক্তি: বিভিন্ন পদার্থকে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিভাজনের ফলে যে ক্ষুদ্র কণার অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাকে বলে অনু। অনুই সকল বস্তুর অস্তিত্বের পিছনে মূল শক্তি হয়ে কাজ করে। বস্তুকে ভেঙ্গে সেই ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করতে পারলে তা বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই শক্তিকে বলে আনবিক শক্তি। আনবিক শক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে যেমন হয়ে থাকে, উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা যায়। আনবিক শক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান তৈরী করা হয়। অধুনা কৃষি ক্ষেত্রেও আনবিক শক্তির ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

(ঘ) সৌরশক্তি: সূর্য থেকে আমরা যে আলো ও তাপ পাই সেটাই মূলতঃ সৌরশক্তি। তবে অধুনা এই সৌর শক্তিকে কল-কারখানা ও যান্ত্রিক ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এর চেষ্টাই চলছে। উন্নত বিশ্বে সৌরশক্তি ব্যবহার করে রান্না-বান্নার কাজ আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে অবশ্য এর তেমন একটা ব্যবহার নেই। তবে কিছু কিছু ক্যালকুলেটর ও ঘড়ি আমাদের দেশে সৌরশক্তির দ্বারা চলে।[৫৪]

(ঙ) চুম্বক শক্তি: চুম্বক একটি পদার্থ যা লৌহজাত পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ও টানাটানি থেকে এক ধরনের শক্তির উৎপত্তি হয়। এশক্তিকে কাজে লাগিয়েও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমান পর্যন্ত যে সব সম্পদ আবিষ্কার হয়েছে এরপরও সম্পদের নতুন নতুন প্রকার আবিষ্কারের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। খোদ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, এবং তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা এখন তোমরা জান না।

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণীভেদসহ বিশ্বচরাচরের সকল সম্পদই মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং তারই দেওয়া অফুরন্ত দান। তিনি ইরশাদ করেছেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।[৫৫]

আয়াতের ভাবার্থ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যই তিনি পৃথিবীর সকল বস্তুরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টিকরা উপাদানসমূহ ব্যবহার করেই মানুষ যতসব নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবন করছে। কিন্তু মানুষ কি কোন বস্তুকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারছে? বিজ্ঞানীরা আল্লাহ কর্তৃক প্রকৃতিতে সন্নিহিত এই সব সম্পদ ও শক্তিকে অনুসন্ধান করে বের করছেন মাত্র। আর অনুসন্ধানলব্ধ এই সব সম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হয়ত রূপান্তরিত অন্য কিছু তৈরীও করছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার এই

---

৫৩. আল-কুরআন, ৩০:২৪
৫৪. আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৫৫. আল-কুরআন, ২:২৯

Dhaka University Institutional Repository

অফুরন্ত নেয়ামত ব্যবহার না করে বিজ্ঞানীদের করার কিছুই নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের সকল সফতার মূলেও রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ব এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ। সূরায়ে ওয়াকেয়ায় এই সব সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'আলার দান তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বর্ণনা হয়েছে। ইরাশাদ হয়েছে, 'তোমরা যে বীজ বপণ কর; সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে ওগুলোকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি; তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে ; (এবং বলবে) আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা হৃত-স্বর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমরা যে পানি পান কর; তা সম্পর্কে তোমরা বেভেছ কি? তোমরা কী তা মেঘমালা হতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে? তোমরা যে াগুণ জ্বালাও তার প্রতি লক্ষ করেছ কি? তোমরা কি তার বৃক্ষসমূহ সৃষ্টি কর? না আমি সৃষ্টি করি? আমি তাকে (জাহান্নামের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করেছি। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। [৫৬]

এভাবে বিশ্বচরাচরে সৃষ্ট অসংখ্য অগণিত সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের দান; এ বিষয়টির প্রতি কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুর যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য তা মানুষের তৈরী নয়। কোন বস্তুর আদি উপাদানও মানুষ তৈরী করতে পারে না। আবার আল্লাহ প্রদত্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করে মানুষ যা উৎপাদন করে সে ক্ষেত্রেও মানুষের ভূমিকা খুবই নগণ্য। মানুষ ভূমি উৎকর্ষণ করে তাতে বীজ বপণ করতে পারে, না হয় সে কৃত্রিম উপায়ে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশও তৈরি করল, কিন্তু বীজটিকে অঙ্কুরিত করা তার সাধ্যের বাইরে। চারা গজালে তাতে সার ইত্যাদি প্রয়োগ করে সে তাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারলেও তাতে শীষ আসা না আসার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। শীষ আসলে তার দানাগুলোতে শাস গড়ে উঠা না উঠার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। সুতরাং বলতে হয় বিশ্বচরাচরের সকল সম্পদ তা প্রাকৃতিকই হউক কিংবা মানুষ্য সৃষ্টই হউক; সব কিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের দান। খোদাপ্রদত্ত এই অনুগ্রহ অফুরন্ত ও সংখ্যায় অসীম। ইরশাদ হয়েছে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন-যাতে ওগুলো তারই বিধান অনুসারে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন নদ-নদীসমূহকে এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন দিবস ও রজনীকে এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা তার নিকট প্রত্যাশা ও কামনা করেছ তার সব কিছুই। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে গণনা করতে চাও, তাহলে তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্য অতিমাত্রায় জালেম ও অকৃতজ্ঞ।[৫৭]

---

৫৬. আল-কুরআন, ৫৬:৬৩ – ৭৪
৫৭. আল-কুরআন, ১৪:৩২–৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সম্পদের মালিকানাঃ

মালিকানা ও মিলকিয়াত অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক ভিত্তি হলো সম্পদ। মালিকানা তত্ত্বে এই সম্পদ তথা উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যবহার, ভোগ ও অধিকারভুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। অর্থব্যবস্থায় মালিকানা তত্ত্বটির রয়েছে বিপুল তাৎপর্য। যে কারণে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যেমন, তেমনি ইসলামি অর্থব্যবস্থায়ও মালিকানা সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। আদর্শ, উদ্দেশ্য, নীতিমালা, জীবন দর্শন, গতি-প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মালিকানা নীতির সাথে ইসলামি তত্ত্বের রয়েছে বিপুল পার্থক্য। ব্যাপক অর্থব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি অর্থব্যবস্থার মালিকানা তত্ত্বই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। সুষম মালিকানা নীতিতে শোষণহীন এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের মালিকানাতত্ত্ব অধিকতর ক্রিয়াশীল।

পুঁজিবাদে ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হল ব্যক্তি। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ব্যক্তি মালিকানা নেই। এখানে রাষ্ট্র ধন-সম্পত্তির মূল মালিক। ইসলাম এর কোনটাই সমর্থন করে না। ইসলামে ধন-সম্পদের একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক হলেন আল্লাহ। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে তাঁর মালিকানার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন-'তিনি আল্লাহ, যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আকাশসমূহের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করলেন। আর তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।[৫৮]

'আল্লাহ' তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরজীবি, সকল কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা বা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। তিনি যতটুকু আয়ত্ব করতে দেয়ার ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর আসন স্থাপিত। এসকল কিছুর হিফাযত তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৫৯]

'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর জন্য।'[৬০]

'বলুন (হে মুহাম্মদ (স.)!), হে আল্লাহ! আপনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। যাকে ইচ্ছা মালিকানা দান করেন, যার নিকট হতে ইচ্ছা মালিকানা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাশীল করেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাহীন করেন, কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয় আপনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।[৬১]

---

৫৮. আল-কুরআন, ২:২৯
৫৯. আল-কুরআন, ২:২৫৫
৬০. আল-কুরআন, ২:২৮৪
৬১. আল-কুরআন, ৩:২৬

Dhaka University Institutional Repository

'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আর আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'[৬২]

'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।'[৬৩]

উল্লিখিত আয়াতের ঘোষণা এবং এ ধরনের আরো অংসখ্য আয়াত হতে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়, ধন-সম্পদ ও যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণ, মাটি, জমি, নদী, সাগর, পানি, বাতাস, আলো ইত্যাদি যত বস্তু ও দ্রব্যের কল্পনা মানুষ করতে পারে তার প্রতিটি একক, একচ্ছত্র এবং চিরকালীন মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। সমকক্ষ বা সমতুল্য হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তবে আল্লাহর এ মালিকানা ভোগ, বণ্টন, ব্যবহার বা এসকল দ্রব্য থেকে উপকার লাভের জন্য নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ সকল বস্তু ও বিষয়ের একমাত্র স্রষ্টা, লালন ও পালনকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক। কাজেই তাঁর মালিকানা সৃষ্টিগত এবং মৌলিক।[৬৪] আল্লাহ্ তাআলার এ মালিকানা অনিবার্যভাবে দুটি বিশেষ বিষয় নির্দেশ করে-

(১) মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা ধন-সম্পদ উপার্জন ও আহরণ করার অনুমতি দিয়েছেন। ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যখন কোন সম্পদের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তখন যেন তার মধ্যে এমন কোন অহঙ্কার জেগে না ওঠে যে, সে এই ধন-সম্পদের মালিক, কাজেই যেভাবে ইচ্ছা ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার তার আছে। উল্লিখিত ঘোষণাসমূহে এর সকল সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেননা মানুষতো মালিক নয়। মালিক হলেন আল্লাহ্। কাজেই আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদ মানুষ যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে না। আল্লাহর মালিকানার এ বিশ্বাস তাকে প্রশান্ত রাখে। তার মধ্যে কোন অহঙ্কার ও অহমিকা জাগে না।[৬৫]

(২) ধন-সম্পদে আল্লাহর মালিকানা সম্পর্কে ঈমান পোষণের পর মানুষ সে সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পুরোপুরি মেনে চলবে। তাঁর হুকুমের বিপরীতে একটি পয়সাও ব্যয় করে না বা একটি পয়সাও আয় করার চেষ্টা করবে না।

ধন-সম্পদে আল্লাহর নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রমাণের সাথে সাথে ইসলামে এটাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এ সকল ধন-সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি এগুলো ভোগ ও ব্যবহার করেন না। এগুলো তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষই এর ভোগ ও ব্যবহার করবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা জলভাগের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন, যেন তা তাঁর নির্দেশ অনুসারে সাগরে চলাচল করতে পারে। তিনি তোমাদের জন্য খাল ও নদী-নালাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। নিয়ন্ত্রিত করেছেন তোমাদের জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে যা চির আবর্তনশীল। তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিনকেও নিয়ন্ত্রিত করেছেন।'[৬৬]

৬২. আল-কুরআন, ৩:১৮৯
৬৩. আল-কুরআন, ৪২:৪৯
৬৪. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, লিজেন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২৫৮
৬৫. প্রাগুক্ত।
৬৬. আল-কুরআন, ১৪: ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র ইরাশাদ হয়েছে, 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নিয়ন্ত্রিত করেছেন।'

আরো বলা হয়েছে 'আল্লাহ তোমাদের জন্য আকাশসমূহে যা কিছু আছে তা নিয়ন্ত্রিত করেছেন।[৬৭]

এসকল ঘোষণায় পৃথিবী ও আকাশসমূহের সকল সম্পদ ও সম্পত্তি, শক্তি, উপাদান, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণ সকল কিছুর মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং এ নিয়ন্ত্রণও আল্লাহর সুবিধার জন্য করা হয়নি। বরং মানুষের ভোগ ও ব্যবহার নিরাপদ এব নিরবিচ্ছিন্ন করার জন্যই এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ যেমন ধন-সম্পদ দিয়েছেন তেমনি মানুষের কল্যাণের জন্যই এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন।[৬৮] এ বিশ্বজাহান মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দেয়ার মধ্যে কয়েকটি নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। যেমন-(১) এ দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ, বস্তু বা বিষয় আয়ত্ব করা মানুষের জন্য কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশসমূহের সকল কিছু মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক, বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মশক্তি কাজে লাগিয়ে একাগ্রভাবে চেষ্টা করে গেলে রে সবকিছুই অর্জন করতে পারে। আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত করে দেয়ার পরও এগুলো থেকে উপকার লাভ করতে হলে বা এগুলো নিজের ভোগ ব্যবহারে কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা ছাড়া সে আল্লাহর কোন সৃষ্টি দ্বারা বিশেষভাবে ধন-সম্পদ দ্বারা কোন উপকার ভোগ করতে পারবে না।[৬৯]

(২) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে নিআমতরাজি তৈরি করে রেখেছেন, তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। কেননা তিনি বিশেষ কোন মানুষের জন্য এগুলো তৈরি করেননি। এতে বিশেষ কারো অধিকার প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে কোন নবী-রাসূল কখনই আর্বিভূত হননি।

(৩) ধন-সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করাই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বরং এগুলো হল মানুষের জীবন-যাপনের উপকরণ মাত্র। এগুলো ব্যবহার করে মানুষ উপকার ও কল্যাণ রাভ করবে মাত্র। কাজেই যে ব্যক্তি ধন-সম্পদকে জীবন-যাপনের উপকরণ হিসেবে মূল্যায়ন করবে তার হাতে সম্পদ ও সম্পত্তি অর্পিত হলে সে তা নিজের এবং সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জন, সঞ্চয় ও ভোগকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করেছে সম্পদের মাধ্যমে সে যেমন নিজেকে ধ্বংস নিশ্চিত করবে তেমনি সমাজের ধ্বংসও অনিবার্য করে তুলবে।

কাজেই ইসলামি মালিকানার মূলকথা হল, ধন-সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ। তবে তিনি তা নিজে ভোগ বা ব্যবহার করেন না। মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্যই তিনি ধন-

৬৭. আল-কুরআন, ৪৫:১৩
৬৮. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৬৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে যে কেউ ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও চেষ্টা দিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জন ও আহরণ করতে পারে এবং উপার্জিত ধন-সম্পদ দিয়ে উপকার লাভ করতে পারে। তবে ধন-সম্পদ উপার্জন করা জীবনের লক্ষ্য নয়। এগুলো হল জীবন ধারনের উপকরণ মাত্র। জীবনের মূল্য লক্ষ্য হল, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম মেনে চলা। তিনি যে কাজ করতে বলেছেন সে কাজ করা আর যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

ইসলামে মালিকানার ধরন ও প্রকৃতি:

পুঁজিবাদে একরকম মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে। তাহল ব্যক্তি মালিকানা। সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক হবে ব্যক্তি। সে যেভাবেই ইচ্ছা, সম্পদ ভোগ ও উপার্জন করবে। তার আহরণ, উপার্জন, ব্যয়, বন্টন ও যথেচ্ছ ভোগে রাষ্ট্র কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। বরং সে যেন নির্বিবাদে ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থাই করবে। এতে জনস্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থের চেয়েও ব্যক্তি স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পাবে। ফলে ব্যক্তি যা কিছু উৎপাদন করতে পারবে। লাভজনক মনে করলে যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে ব্যক্তি মালিকানা নেই। ধন-সম্পদের মালিক হল রাষ্ট্র। সেখানে ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই যা খুশি উপার্জন করতে পারে না। যা ইচ্ছা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে না। বরং ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় উৎপাদন পরিকল্পনার যন্ত্রে পরিণত হয়। সে রাষ্ট্রের নির্ধারণ অনুসারে কাজ করে। রাষ্ট্র নির্ধারিত ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ভোগ করে। শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদে ব্যক্তিমালিকানার চেয়ে বেশি স্বেচ্ছাচারী মালিকানায় পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানা। বরং ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিযোগিতা না থাকায় এবং পণ্যসামগ্রীর বাজার তৈরির কোন প্রয়োজন না থাকায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা ধন-সম্পদের অকল্যাণকর ব্যবহারের পথ তৈরি করে। ইসলাম এ দুধরণের মালিকানাই অস্বীকার করে। ইসলামে ধন-সম্পদের মালিক রাষ্ট্র হতে পারে, ব্যক্তিও হতে পারে। তবে কারো মালিকানাই অবাধ, অসীম বা স্বেচ্ছাচারী নয়।[৭০] বরং সকলের মালিকানাই আল্লাহর দেয়া মালিকানা আইনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর দেয়া আইনের অধীনেই রাষ্ট্র ধন-সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। কাজেই ইসলামে মালিকানা দু'রকমের।

(১) রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং (২) ব্যক্তি মালিকানা।

পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা:

রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলতে জাতীয় মালিকানা বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বুঝায়। প্রাকৃতিক উপাদানে কারো ব্যক্তিগত মালিকান প্রতিষ্ঠিত না করে সকল মানুষের সাধারণ ও সামগ্রিক অধিকার বহাল রাখাকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (Nationalization) বলে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি অর্থ-সম্পদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সাধারণ গ্রহণ করা হয় না। বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ

---

৭০. মওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশন, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিপতির হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে রাজস্ব আদায় করাই এ ধরনের অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। এজন্যপুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (Nationalization) এর পরিবর্তে বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্প-কারখানা, পানি সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন ইত্যাদি খাতসহ বড়ো বড়ো সকল খাত ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার নজির রয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমন ভূমি, সাগর, নদী, খাল-বিল, বনভূমি, বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ, গ্যাস ইত্যাদির উপরও রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি অবাধ ব্যক্তি মালিকানার পৃষ্ঠপোষক। এ অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিমালিকানাকে সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে।[৭১]

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা:

সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সম্পদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণই হল মূলকথা। এ অর্থনীতিতে সম্পদে মানুষের কোন ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। এখানে উৎপাদনের প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক উপাদান এবং মানুষের শ্রমলব্ধ উপার্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। বরং সকল প্রকার উপকরণ, উৎপাদন ও উপার্জনকে সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানাধীন সম্পদ হিসেব গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোনকিছুর মালিক হতে পারে না। সকল কিছু রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ব্যক্তি যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে আর কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে অথবা যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে আর প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করবে। ব্যক্তির কাজ ও ভোগের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। ব্যক্তি এখানে উৎপাদনের অন্যান্য যন্ত্রের মত একটি যন্ত্র হিসেবে তার জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালন করা যাবে।

সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়। এখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একান্তভাবে সমাজের করায়ত্ত থাকে। ব্যক্তি খাটে, পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করে, উপার্জন করে-কিন্তু সমাজের অংশ হিসেবে তার এ উপার্জন সামাজিক উপার্জনে পরিণত হয়। 'নিজের' বলতে কোন উৎপাদন বা উপার্জন সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থনীতি স্বীকার করে না। পুঁজিবাদে যেমন অবাধ ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার জয়জয়কার, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থনীতিতে তেমনি রাষ্ট্রীয় মালিকানার জয়জয়কার। রাষ্ট্রীয় মালিকানা সম্পর্কিত মতাদর্শে পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থনীতি উভয়ই চরমপন্থী হিসেবে পরিগণিত হয়।[৭২]

ইসলামে রাষ্ট্রীয় মালিকানা:

ইসলামে রাষ্ট্রীয় মালিকানা আছে। তবে তা কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিলুপ্ত করে না। ব্যক্তি মালিকানা যাতে অবাধ, নিরঙ্কুশ এবং স্বেচ্ছাচারী হতে না পারে, বরং সকল ক্ষেত্রে ইসলামি হুকুম-আহকাম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় তা নিশ্চিত করার

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিধান রাখা হয়েছে। কেননা এমন অনেক প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সম্পদ রয়েছে, যেখানে কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যেমন প্রাকৃতিক বনভূমি, সমুদ্র, নদী-নালা, জলাসয়, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন রকমের খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সম্পদে সাধারণভাবে সকলের জন্য উপকার লাভের সুযোগ রেখেছেন। কাজেই এগুলো ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিলে সকলের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার সকল কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে এলে ব্যক্তির আবিষ্কার, উদ্ভাবন, উৎপাদন, উপার্জন অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত লাভ ও উন্নতির সুযোগ না থাকায় সে কাজে-কর্মে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হতে পারে না। ইসলামি অথর্নীতিতে তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিআমত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সম্পদে সামষ্টিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে তাও সুনির্দিষ্ট নীতিতে সর্বসাধারণের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে হয়। কেননা ইসলামে সম্পদের মূল মালিক মানুষ নয়। মূল মালিক হলেন পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলা।[৭৩] মানুষ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দেয়া সম্পদ ভোগ ও ব্যবহারের অনুমতি পায়। রাষ্ট্র সামগ্রিক সংস্থা হিসেবে এ ভোগ ও ব্যবহার বিধিবদ্ধভাবে হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অবকাশ আছে তবে কোনভাবেই তা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে বা পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে সমর্থন করে না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রসমূহ:

(ক) রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এমনসব সম্পদে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের মালিকানায় প্রদান করলে জনগণের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, এ ধরণের সম্পদ সবসময় সরকারি মালিকানায় রাখতে হবে। যথা:

* সরকারি চারণভূমি, বনভূমি, উদ্যান ও সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা খামারসমূহ।

* সরকারি ভূমিতে বিদ্যমান খনিসমূহ।

* পানির উৎসসমূহ: বৃহদায়তন জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র,হ্রদ ইত্যাদি।

* যোগাযোগ ব্যবস্থা: সড়ক ও জনপথ, নৌ-পথ, আকাশপথ, রেললাইন এবং সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা যানবাহনসমূহ ইত্যাদি।

* জনকল্যাণে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানসমূহ: যথা- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক বিভাগ, চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ, গবেষণা ইন্সটিটিউটসমূহ, ট্রেনিং সেন্টার ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোসমূহ, ওয়াসা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ইত্যাদি।

(খ) জনকল্যাণে ওয়াক্ফকৃত সম্পদসমূহ যথা:

* মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ;

---

৭৩. আল-কুরআন, ৫৬: ৬৩ – ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

* সরাইখানা, মুসাফিরখানা;

* হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়।

(গ) সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা মিল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(ঘ) মালিকানাবিহীন সম্পদসমূহ।[৭৪]

এসকল সামগ্রী রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হওয়ার পক্ষে যে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

(১) উপরোল্লেখিত বিষয়সমূহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে এগুলোকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ছেড়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণ দুর্ভোগের শিকার হবে এবং দেশের সকল নাগরিক কার্যত: ঐসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে। আল্লামা আবু উবায়দ তাঁর 'কিতাবুল আসওয়ালে' উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) রবযর ভূমিকে চারণভূমি হিসেবে ঘোষণা করার পর বলেছিলেন, 'যদি আল্লাহর পথে ভার বহনকারী এসব উটগুলো না হত তাহলে আমি লোকদের নগরসীমার অন্তর্ভুক্ত ভূমি থেকে সামান্য অংশও চারণভূমির জন্য অধিগ্রহণ করতাম।[৭৫] এথেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কোন সম্পদকে রাষ্ট্রীয়করণ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে।

(২) চারণভূমিসমূহ কারো ব্যক্তিমালিকানায় প্রদান না করার ব্যাপারে উলামায়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। এ কারণেই জাহেলিয়্যাতের যুগে চারণভূমির উপর কুলায়ব ইবনে ওয়ায়েল প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের যে আধিপত্য ছিল তা খতম করে চারণ ভূমিসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, সকল চারণভূমিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আধিপত্য থাকবে, (যা থেকে সর্বসাধারণ সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে)।[৭৬] চারণভূমি সংক্রান্ত এই বিধানের আওতায় বনভূমি, সরকারি উদ্যান, খামার ও খনিসমূহও পড়বে। কেননা এগুলোর সাথেও সর্বসাধারণের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

সরকারি ভূমিতে বিদ্যমান খনিসমূহে যে সরকারি মালিকানা থাকবে এ সম্পর্কে আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণিত একটি হাদীসে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 'অর্থাৎ হযরত আব্‌ইয়ায্ ইবনে হাম্মাল (রা.) যখন রাসূল (সা.)-এর দরবারে আসলেন এবং তার এলাকার একটি লবণ খনি তার মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানালেন, তখন রাসূল (স.) তারজন্য তা বরাদ্দ করলেন। অতঃপর তিনি যখন মজলিশ থেকে উঠে গেলেন তখন মজলিশে অবস্থিত জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি জানেন কি; তারজন্য কি বরাদ্দ করলেন? আপনি তো তার জন্য একেবারে প্রস্তুত পানি বরাদ্দ করেছেন। (অর্থাৎ বিনাশ্রমে উত্তোলনযোগ্য লবণ খনি থাকে দিয়ে দিয়েছেন)। ফলে রাসূল (সা.) তা থেকে তা ফিরিয়ে নিলেন।[৭৭]

---

৭৪. ড. ঈসা আবদাহ, আল ইকতিসাদুল ইসলামী, ৫৭–৫৯

৭৫. ড. ঈসা আবদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৭৬. উদ্ধৃত: আবুল ফাতাহ, প্রাগুক্, পৃ. ১৭০

৭৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, সুনানু তিরমিযী, দিল্লী-১৪০৯ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কুদামাহ তার প্রখ্যাত গ্রন্থতে উল্লেখ করেছেন যে, এই বিধানের আওতায় পানির উৎসসমূহ, জনপথ, উদ্যান এবং জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সকলকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমনঃ মসজিদ, মাদ্রাসা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক বিভাগ, চিকিৎসাকেন্দ্র, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)। কেননা এগুলোও মূলতঃ খোদায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং কেউই এর কল্যাণের আওতামুক্ত নয়।[৭৮] সুতরাং যদি এগুলোতে কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা সৃষ্টি হয়; তাহলে তাতে অন্যকে বারণ করার ও বাধা দেয়ায় তার অধিকার সৃষ্টি হবে। আর এরূপ হলে তা সর্বসাধারণের জটিলতার কারণ হবে। আর যদি এগুলোর পরিবর্তে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করা হয়; তাহলে এগুলোকে দুর্মূল্যে করে ফেলা হবে। সুতরাং ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা হলে এগুলো থেকে বিনা আয়েশে সর্বসাধারণের উপকৃত হওয়ার যে ব্যাপকতা মহান আল্লাহ তা'আলা রেখেছিলেন; তা আর থাকবে না।[৭৯]

"পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানা অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। সেখানে মালিকানা অত্যন্ত "নিরঙ্কুশ" অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি "মালিকানাহীনতার" বিপরীতে ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা নৈতিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ ব্যক্তিকে সমাজের সোপান হিসেবে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্নে ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী সফল। পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানা মানব দেহের ধমনিতে রক্ত সঞ্চালনের মতই জরুরী উপাদান, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে তার প্রায় পুরোটাই অপ্রয়োজনীয়।[৮০]

পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানাঃ

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় লাগামহীন ব্যক্তি মালিকানা অপচয় ও অপব্যবহারের জন্য দায়ী। এখানে কারটেল, একচেটিয়া কারবার, সুদ ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। ভোগকারীর স্বাধীনতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে মূল্য ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারিতায় পুঁজিবাদে সাধারণ মানুষ হয় শোষিত ও বঞ্চিত। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি একপেশে ব্যবস্থা। মানুষের অর্থ-সম্পদ, বিত্ত ও বিলাস বৈভব নিয়ে এর ভুবন প্রসারিত করে রেখেছে। অনেকটাই নৈতিকতা বর্জিত এ ব্যবস্থা উৎপাদন ক্ষেত্রে আদৌ কোন অবদান রাখে না এমন গুটি কয়েক মানুষের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কোন অবদান রাখে না। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে একটি শোষক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। তারা সৎ, নিষ্ঠাবান, উৎপাদন কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শোষণ করে। অত্যন্ত দাপটের সাথে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। সর্বোপরি পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদের সুষম বণ্টন অনিশ্চিত।[৮১]

---

৭৮. আল্লামা ইবনুল কুদামাহ, আলমুগনী, কায়রো-১৯৮৯

৭৯. ড. ঈসা আবদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৮০. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা:

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে যৌথ মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অনুকূলে ব্যক্তি মালিকানাকে পরিত্যাগ করা হয়। এ ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা ও সামাজিক অসম বণ্টনের কিছুটা সমাধান হলেও উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের উৎসাহ-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সাম্যবাদে শ্রমিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই বলে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশবিশেষে পরিণত হয়। সাম্যবাদীরা সর্বহারাদের এবং ফ্যাসিস্টগণ রাষ্ট্রের জন্য বেঁচে থাকে। ইসলাম পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের চরম চিন্তাধারা পরিহার করে মানবিক ও মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনে উৎসাহদান, সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত রাখা সম্ভব।[৮২]

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা:

পবিত্র কুরআন শরীফে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে, "বিশ্ব ভূমন্ডলের অবিমিশ্রিত ও অবিসংবাদিত মালিক আল্লাহ।"[৮৩] মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন করে। আল্লাহ পৃথিবীর কোন কিছু নিজের জন্য সৃষ্টি করেননি। তিনি কোন কিছুই ভোগ করেন না। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।[৮৪] পৃথিবীতে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যই করেছেন; আল-কুরআনের উক্ত বক্তব্যের মূল তাৎপর্য এখানেই নিহিত আছে। আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের আছে। এজন্য আল্লাহর সৃষ্টি সম্পদের তত্ত্বাবধান, ভোগ-ব্যবহার ও হস্তান্তরের দায়িত্ব ও অধিকার ব্যক্তি বিশেষের হাতে ন্যস্ত হতে পারে, কিন্তু তা অবশ্য সমগ্র মানব জাতির স্বার্থের অনুকূলে হতে হবে। এ দায়িত্বের অংশবিশেষ সাংবিধানিক রূপ নিয়ে পার্থিব মালিকানা ও স্বত্বাধিকারের সৃষ্টি করেছে। এ দায়িত্বের একটি বড় অংশ নৈতিকতার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এবং পাস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পালন করতে হয়, ইসলামী সমাজের এটাই বিধান। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা শরীয়তের কতিপয় বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান:

কোন সম্পত্তি অব্যবহৃত বা পতিত ফেলে রেখে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি মালিকানাবিহীন ভূমির দখল নিয়ে তিন বছরের মধ্যে উক্ত ভূমি আবাদ না করলে তা দখলে রাখার কোন অধিকার তার থাকবে না।"[৮৫] মহানবী (স.) এর এই ভূমি নীতি হযরত ওমর (রা.)-এর সময় সাংবিধানিক রূপ লাভ করে। ইসলামে ভূমি চাষাবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদত্ত ভূমি হযরত বিলাল (রা.) চাষাবাদ না করলে হযরত ওমর (রা.) তার খিলাফতকালে

---

৮২. প্রাগুক্ত।
৮৩. আল-কুরআন, ৩:১৯০
৮৪. আল-কুরআন, ২:১৯
৮৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত।
৮৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কোন মালিকানাবিহীন ভূমি প্রথম আবাদ করলে তা তার স্বত্ত্বাধিকারে চলে আসে।"[৮৬]

জমি পতিত ফেলে রাখলে সম্পদের অপচয় হয় বলে ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানা নিজ হস্তে ধারণ কিংবা আগ্রহী চাষীদের মধ্যে পুনর্বন্টনের অধিকার রয়েছে। কখনো কারো মালিকানা বিলুপ্ত করা হলে তাকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

ভূমির বিরামহীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সর্বোত্তমরূপে পালন করতে হবে। কোন ব্যক্তি ভূমি বন্টন অথবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ব্যবহারে অনীহা প্রদর্শন করলে রাষ্ট্রীয় সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। ইসলামে কৃষির পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যান্য শাখা-প্রশাখাকে সমান গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। ইসলাম সুসম বন্টনের সাথে সুষম উন্নয়নও নিশ্চিত করতে আগ্রহী। ইসলাম সর্বদাই সম্পদকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সঞ্চালনীল রাখার পক্ষপাতী। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হবে না। এক্ষেত্রে ভূমি কিংবা উৎপাদনের সকল উপকরণ সর্বদাই ব্যবহারে রাখতে হবে।

যাকাত প্রদান :

সমাজদেহে সম্পদের সুষম বন্টনের উত্তম পন্থা হলো যাকাত। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সম্পদের মালিক একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দিতে বাধ্য থাকবে। ইসলামে সোনা, রূপা, যে কোন ধরনের মুদ্রা, কৃষি ফসল বা পণ্য, গবাদি পশু কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমস্ত সম্পদের উপরই যাকাত ফরয। সমাজের দরিদ্র শ্রেণী এই যাকাত পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[৮৭] তাছাড়া সমগ্র মুসলিম জাতির কল্যাণার্থে খরচ করাও যাকাতের একটি বিশেষ খাত।

সম্পদের ব্যবহার:

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে সম্পদ অবশ্যই 'আল্লাহর রাস্তায়' অর্থাৎ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর রাস্তায় যারা খরচ করে তাদের দানের সাথে ঐ শস্যদানার তুলনা করা যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশতটি করে শস্যদানা উৎপন্ন হয়। বস্তুত যাকে খুশী আল্লাহ এর চেয়েও অনেক গুণে বেশী প্রদান করেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদার এবং সর্বজ্ঞ।"[৮৮]

"তুমি যা খরচ করো তা তোমার উপকারার্থেই, যদি খরচের সাথে সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো। তুমি যা খরচ করো তা তোমাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করা হবে এবং তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।"

---

৮৬. প্রাগুক্ত।
৮৭. আল-কুরআন, ৯:৬০
৮৮. আল-কুরআন, ২:২৬১

Dhaka University Institutional Repository

"যারা দিনে ও রাতে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন। তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তারও কারণ নেই।"[৮৯] এসকল আয়াতে সম্পদের ব্যবহার নীতি অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহর নিবেদনে জনকল্যাণে সম্পদ ব্যয়ের প্রতি সব সময় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ সমাজকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা উচিত।

সম্পদের অপকারহীন ব্যবহারঃ

ইসলামের শরীয়ত সম্মত বিধিবিধান সম্পদের কল্যাণমূলক ব্যবহারকে উৎসাহিত এবং অক্যাণকর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছে। সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ বলে তা ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু তা ব্যবহারের ফলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের যাতে ক্ষতি বা অপকার না হয় সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্ষতিকর ভোগ-ব্যয়কে আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে; "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু কখনও আগ্রাসী হয়ো না। আল্লাহ আগ্রাসীদের পছন্দ করে না।"[৯০] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা উচিত নয়, তাতে তৃণভূমির উন্নয়ন ব্যাহত হবে" (বুখারী)। এই হাদীসে অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সমাজের অপরাপর ব্যক্তির যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার সুযোগে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমি যাতে কুক্ষিগত না হয় সেদিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য করে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির সীমা নির্ধারণ করে অধিকতর সুসম বন্টন নিশ্চিত করতে পারে। কারণ ইসলামী শরীয়ত সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আল্লাহর বিধান মানুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টির জন্য তৈরি। ইসলামী বিধান মানুষের অপকার থেকে বিরত থাকার জন্য পরিকল্পিত। মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনকারী নিজে সে কাজ থেকে উপকৃত হোক বা না হোক অন্য কোন ব্যক্তির যাতে ক্ষতি না হয়"[৯১] এই বিশেষ নীতির উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান তৈরী হয়েছে।

ইসলাম মানবিক ধর্ম। এর বিধান ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতে পরিচালিত। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স.) সম্পদের মালিকের দায়িত্ব সম্পর্কে যে দিকনির্দেশনা উচ্চারণ করেন, পরবর্তীকালে তার দ্বারা পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা চমৎকৃত ও আকর্ষিত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক এল. ম্যাসিগনন (Mesignon)। তিনি বলেন, "ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেকেই সামাজিক মঙ্গল তথা সাম্যের প্রতি অবদান রাখছে। ইসলামে লাগামহীন ব্যাংক ব্যালেন্স, রাষ্ট্রীয় ঋণ ও পরোক্ষ করের আধিক্য সমর্থিত নয়। কিন্তু ইসলাম পিতা ও স্বামীর ব্যক্তির মালিকানায় বিশ্বাসী, ব্যবসায়ী পুঁজিও

৮৯. আল-কুরআন, ২:২৬২, ২৬৯, ২৭২ – ২৭৫
৯০. আল-কুরআন, ২:২১০
৯১. উদ্ধৃতঃ মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সমর্থিত। ইসলামে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বলশেভিক সমাজবাদের মধ্যবর্তী পন্থা লক্ষ্য করছি।"[৯২]

বৈধ দখলস্বত্ব: ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানায় দখল আইন অবশ্যই সঙ্গত হতে হবে। জোরপূর্বক সম্পত্তি ভোগদখল করা আল-কুরআন সমর্থন করে না। ভুয়া সাক্ষী ও মিথ্যা দলিল-প্রমাণ দাঁড় করিয়ে কোর্টের রায় নিজের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা যেমন অনৈতিক, তেমনি সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়াও ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নিবিদ্ধ, নিন্দনীয় ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মজুদদারী ও একচেটিয়া ব্যবসা প্রভৃতিও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষাকারী ও অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। মজুদদারীর মজুদ সম্পদের উপর তার মালিকানার অধিকার থাকবে না। মজুদদারীতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই ইসলাম কখন মজুদদারী কিংবা গোপন কারবারকে (চোরাচালানী) প্রশ্রয় দেয় না।

সম্পদের সুষম ব্যবহার :

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার শর্ত হলো, মালিক তার সম্পদের সুষম ব্যবহার করবে এবং দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। ব্যক্তি মালিকানা অবশ্যই আল-কুরআন ও সুন্নাহ প্রবর্তিত নীতি থেকে যাতে বিচ্যুত না হয় সেজন্য সমাজ তথা রাষ্ট্রকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্পদের মালিককে কৃপণ কিংবা অপচয়কারী হলে চলবে না। কেননা আল্লাহ উদ্ধত, দাম্ভিক, কৃপণ ও অপচয়কারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। ব্যক্তির অপরিমিত সম্পদের মালিক হওয়াও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

অতি মিতব্যয়িতাকে পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ও মানবতার সেবায় ব্যয় করার জন্য ইসলাম কঠোর তাগিদ দিয়েছে। ব্যয় না করলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে পারে না বলে কৃপণতা প্রবণ জাতির জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কমে যায়। অতি মিতব্যয়িতা রোধের জন্য গতিশীল কর ব্যবস্থা প্রবর্তন ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কৃপণতা ও অপচয় এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা সমর্থন করে।

সম্পদ থেকে যথার্থ উপকার লাভ:

ইসলামে সম্পদ অবশ্যই সম্পদের মালিকের যথার্থ উপকারে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। কিন্তু সম্পদ অবশ্যই ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনার ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হতে হবে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে সম্পদের ব্যবহার ইসলামী মৌলিক নীতির বিরোধী। ব্যক্তি মালিকানা সম্পর্কে শর্ত হচ্ছে, সম্পদ জীবিত ব্যক্তির স্বার্থে ব্যয়িত হতে হবে। মৃত্যুর পর কোন সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ করার প্রশ্নই আসে না। কাজেই ইসলামী বিধান মোতাবেক মৃত্যুর পরপরই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন সম্পদ ইসলামের মৌলিক নীতি বিরোধী কাজে ব্যবহার করলে ইসলামী রাষ্ট্র তার মালিকানা রহিত করার অধিকার রাখে। কোন সমাজে বা দেশে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে এটা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ অথবা যে কোন মতবাদের তুলনায় অনেক বেশী ন্যায় ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম।

---

৯২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে সম্পদ আহরণ ও উপার্জনের উপায় ও ক্ষেত্রসমূহ

* সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব
* সম্পাদ উপার্জনের হালাল উপায়
* শ্রম বিনিয়োগ
* শ্রম লব্ধ পন্থা
* ব্যবসা-বাণিজ্য
* ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি
* ক্রয়-বিক্রয়ের বাতিল পদ্ধতি ও ফকিহ্ মতবাদ
* যে সব কর্মকান্ড ব্যবসা-বাণিজ্য বাতিল করে দেয়
* ধার কর্জ
* দান দক্ষিণা
* উত্তরাধিকার সূত্র
* সম্পদ উপার্জনের অবৈধ উপায়
* সুদ
* ঘুষ
* জুয়া
* লটারি
* প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া ও ভেজাল মেশানো।
* অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন
* হারাম বস্তুর ব্যবসা
* চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবর দখল
* কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণ
* মজুতদারী ও কালোবাজারী
* চোরাচালান
* সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ
* চাঁদাবাজীর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ
* লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন
* ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন
* মাদকদ্রব্যের ব্যবসা
* সিন্ডিকেট করে জিনিসের দাম বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ উপার্জনের গুরুত্ব:

কুরআন মাজীদের নামায আদায়ের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে একারণে যে, ইবাদতের সাথে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাব রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুসারে সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করবে এটাই ইসলামের দাবি। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য সম্পদ উপার্জনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা, আয় উপার্জন করা, ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, চাকুরি করা ইত্যাদি আল্লাহর নির্দেশেরই বাস্ত বায়ন। কেননা, কুরআন মজিদে উল্লেখিত হয়েছে, "সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক্) সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার দিগ দিগন্তে এবং তাঁর প্রদত্ত রিয্ক হতে আহার কর।"[২] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "দুনিয়া হতে তোমার অংশ (গ্রহণে) ভুল করনা।"[৩]

নবী করীম (স.) বলেছেন, "হালাল রিযক উপার্জন আল্লাহর ফরযসমূহের অন্যতম ফরয।"[৪]

নবী করীম (স.) এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? জবাবে তিনি বলেন, "নিজ হাতের উপার্জন এবং হালাল ব্যবসায়ের উপার্জন।"[৫]

অপর এক হাদীসে আছে, " তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রিযক খুজে বেড়াও।"[৬]

নবী করীম (স.) আরও বলেন, "গুণাহ্ সমূহের মধ্যে এমন একটি গুণাহ্ আছে যার কাফফারা (প্রতিবিধান) নামাজ, রোযা, হজ্জ কিংবা ওমরা দ্বারা আদায় করা যায় না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তাহলে তার কাফফারা কিভাবে আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, রিযক অনুসন্ধানের চিন্তাই কেমল তার কাফফারা হতে পারে।"[৭]

নবী করীম (স.) বলেন, "আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি করে সে যেন প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের অঙ্গার সঞ্চার করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস করেন, আর্থিক সচ্ছলতা বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, কারও একদিনের খাদ্য বস্তু থাকা।"[৮]

নবী করীম (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি বিপদে (দারিদ্র্যজনিত) পতিত না হয়েও মানুষের কাছে ঝাঞ্চা করে সে যেন উত্তপ্ত লোহা ভক্ষণ করে।"[৯]

---

১. আল-কুরআন, ৬২:১০
২. আল-কুরআন, ৬৭:১৫
৩. আল-কুরআন, ২৮:৭৭
৪. ওয়ালী উদ্দিন, আল-মিশকাতুল মাসাবিহ, বৈরূত, দারুল ইসলামিয়া, ১৩৯২ হিজরী, হাদীস নং-২৬৬১
৫. আল-হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়ায়ীদ, দারুল কুতুব, আল ইলমিয়া, বৈরূত, ১৪০৮ হিজরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩–৬৪
৮. প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম সম্পদ অর্জনের গুরুত্বকে উপেক্ষা তো করেইনি বরং হালালভাবে সম্পদ অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজে কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা সম্পদ উপার্জনের কাজকে দুনিয়াদারী ও তাকওয়া পরিপন্থী কাজ মনে করে। এক শ্রেণীর লোক হালাল-হারাম বাছ বিচার না করে ধন্যাঢ্য লোকদের নিকট থেকে দান্তখয়রাত গ্রহণ করাকে দূষণীয় কিংবা ইজ্জতহানীকর মনে করে না। অথচ অপরের কাছে ভিক্ষার হার সম্প্রসারিত করতে ইসলাম কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। এহেন চরিত্র ইসলামে কাম্য নয়। বরং তাকওয়া পরিপন্থী বটে।

ধন সম্পদ উপার্জন মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু হালাল-হারাম বাছ বিচার না করে যেন তেন ভাবে সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। সম্পদ যেমন আল্লাহর নেয়ামত তদ্রুপ আমানতও বটে। তাই সম্পদ উপার্জনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, উপার্জন পদ্ধতি হালালভাবে হচ্ছে কিনা? এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা? ও হকদারের হক আদায় করা হচ্ছে কিনা?

ইসলামে মূল্যবোধ ব্যতীত বেপরোয়াভাবে সম্পদ উপার্জন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর তখনই বিবেক বর্জিত কাজ হয়। ইসলাম তার অনুসারীদের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়নি তদ্রুপ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রেও অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেনি। কাজেই ইসলাম মানব কল্যাণের লক্ষ্যে সম্পদ উপার্জনের পদ্ধতি ও উপায়সমূহের উপর হালাল-হারামের রেখা টেনে দিয়েছে। হাদীসে আছে, "হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট" আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো যা অনেকেই জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে, সে যেন মেষ পালকের ন্যায় হয়ে যায় যে, সে তার পশু তার সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে ছড়ায়। এবং তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়।"[১০]

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন দায়বদ্ধতা নেই। এ ব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, শর্ত শুধু লাইসেন্স করে নেয়া এবং ফি ও শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করা। এ অর্থনীতির নামকরণ করা হয়েছে, ইতিবাচক অর্থনীতি। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাও ঠিক একই রকম। পার্থক্য শুধু এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন কমিউনিষ্ট পার্টির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য এসব নিয়ন্ত্রণ সর্বদা শিথিলযোগ্য। ইসলাম এ দুই ধরনের উপার্জন নীতির কোনটাই গ্রহণ করেনি বরং মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছে।

সম্পদ উপার্জনের উপায়ঃ

সম্পদ উপার্জনের উপায় দুটি-যথা- হালাল উপায় ও হারাম উপায়।

---

১০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল বুখারী, দারুস সালাম, রিয়াদ, ১৪২১ হিজরী, হাদীস নং-৫২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ উপার্জনের হালাল উপায়

শ্রম বিনিয়োগ

ইসলামে শ্রম ও শ্রমিক: শ্রম স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে উৎপাদনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ নিঃশ্চল-শ্রমই পারে তাদের গতিশীলতা দান করতে। শ্রমশক্তির দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর অবশিষ্ট উপকরণসমূহের অবদান নির্ভর করে। এই শ্রমকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক মার্শালের মতে শ্রম হল, "মানসিক বা শারীরিক যে কোন প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের নিমিত্ত প্রদান করা হয়।"[১১] অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন পরিশ্রম এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রম বলে বিবেচিত হয়না। যেমনঃ সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা-মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার শ্রমের আওতায় পড়ে না। পক্ষান্তরে শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামে শ্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো কার্যের দায়িত্বসহ সৃজন করেছেন। প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষ উৎপাদনশীল ও মানবতার স্বার্থে কল্যাণকর কাজে রত থাকার জন্যই আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। পৃথিবীতে প্রেরণের প্রাক্কালে আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'পৃথিবীই তোমাদের আবাসস্থল এবং ধারণোপযোগী উপায়-উপকরণসমূহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ভোগ করতে পারবে।'[১২] আর পৃথিবীর প্রতিটি কর্মের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জবাবদিহি করতে হবে এবং ভাল ও খারাপ কাজের বিনিময় দেয়া হবে, আর তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।[১৩] অর্থাৎ মানুষের কোন কর্মই সেদিন ব্যর্থ হবে না। প্রতিটি ব্যক্তি যে কাজে যে পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করবে যথোপযুক্তরূপে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। আল্লাহ কাউকে তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ আরো বলেন, 'তারপর সেদিন (শেষ বিচারের দিন) পৃথিবীতে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[১৪] এছাড়া আরো কি প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কেও হাদিসে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, সকল কার্যে মানুষের শ্রম বা উৎপাদিকা শক্তির এক বিরাট অবদান রয়েছে। এইরূপে ইসলামে বস্তুগত ও নৈতিক দিকসমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে শ্রমকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ফিকাহর পরিভাষায় শ্রমিকদের বুঝানোর জন্য 'আযীর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে মজুরীর বিনিময়ে শ্রম বিক্রয়কারী মাত্রই শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত। ফলে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই শ্রমিক। বিশেষায়ণের (Specialisation) বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামে সমগ্র সমাজই শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত। অন্য কথায় কায়িক শ্রমে নিয়োজিত মজুর, উদ্যোক্তা, শিল্পী, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সকলেই শ্রমিক সম্পর্কিত ধারণার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী সমাজ যে প্রকৃতপক্ষেই একটি শ্রেণীহীন সমাজ এই দৃশ্যমানতা এর ভিত্তিমূল বিশ্লেষণ করে।[১৫] শ্রম ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত আয়ের ভিত্তিতে ফিকাহ্ শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রম ধারণাকে দুইভাগে বিশ্লেষণ করা যায়। যথা: (১) আযীর আল মুশ্তারাক্ এবং (২) আযীর আল্ হাস্।

---

১১. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, 'ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণা' মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট-১৯৮৮, পৃ. ১৭
১২. আল-কুরআন, পৃ. ২:৩৬
১৩. আল-কুরআন, পৃ. ৭ – ৮
১৪. আল-কুরআন, পৃ. ৮
১৫. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আযীর আল্ মুশ্তারাক্ বলতে ঐ সকল শ্রমিককে বুঝায় যারা কোন শ্রম দান অথবা নির্দিষ্ট কোন পণ্য উৎপাদনের বিনিময়ে মজুরী লাভ করে থাকে। যেমন দর্জি, মুচি, মুঝারাআত ও মুশাকাত (শ্রম জমি ও বৃক্ষ অংশীদারী), ইত্যাদিতে নিয়োজিত ব্যক্তি যে মুশ্তারাকের অন্তর্ভুক্ত।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পী, গায়ক, দোকানদার যাদের সেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং স্বাধীন পেশাজীবী যেমন-চিকিৎসক ও আইনজীবী এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একই সময়ে তারা নিয়োগকারীও হতে পারেন যদি তার নিজেদের কারবারে অন্য কোন শ্রমিক নিয়োগ করেন।[১৬]

পক্ষান্তরে আযীর আল্ হাস্ হল ঐ ধরণের শ্রমিক যারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে। এদের মজুরী শ্রম-ঘন্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয়। প্রচলিত পশ্চিমা ধারণা মতে শ্রম বলতে আযীর আল্ হাস্‌কে বুঝানো দোকানদার কর্তৃক সম্পাদিত শ্রমকেও বুঝায়। আক্দ/আল্ ইজারা (ভাড়ার চুক্তি) একটি বিধি হিসাবে পরিগণিত, যা নিয়োগকারী ও নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলনের ওপর নির্ভর করে এবং যা একটি লেনদেনের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।[১৭]

ইসলামে একটি উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং অলসতাকে ইসলাম ঘৃণা করে। চিরাচরিত ব্যবস্থায় (বিশেষভাবে পুঁজিবাদে) শ্রমিকের শ্রমকে পণ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক F.W.Taylor নিজেও শ্রমিককে অর্থনৈতিক মানুষ (Economic man) হিসাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামে মানুষের মন-মগজ ও দৈহিক শ্রম অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মত কোন জিনিস নয়। তাই এর কোন মূল্য বা বাজার হার (Market rate) নির্ধারণ করা এবং এর যথেষ্ট ব্যবহার করা সম্ভব নয়। শ্রম এমন জিনিস নয় যা নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবসর গ্রহণ করে অন্য কাজে নিযুক্ত হতে পারে। আসলে শ্রমিক তার সমগ্র সত্তাকেই কিংবা তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই মূল উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। অন্যথায় একজন লোকের শ্রমকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করার ব্যাপারই নয়। বরং সমগ্র সত্তাটিই ব্যবহার করার ব্যাপার। এ মানব সত্তার অন্তরে রয়েছে তীব্র ভাবাবেগ ও অনুভূতি। তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঘৃণা ও আসক্তি উভয় অবস্থা দেখা দেয়। সে কোন কোন সিদ্ধান্ত নিজ থেকেই (Innovation) গ্রহণ করে। তার মন-মগজ ও দেহ অনেক ধরণের আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এই মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তাঁর প্রতিনিধি। এই মানুষকে একটি নিছক ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য, অস্ত্র বা হাতিয়ার, অর্থ যন্ত্রের একটি নিস্প্রাণ, নিস্পন্দ অংশ অথবা একটি জন্তু মনে করা কোনক্রমেই সমীচীন হতে পারে না।[১৮]

---

১৬. ঐ, পৃ. ২৯
১৭. ঐ, পৃ. ২০
১৮. ঐ, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শ্রমের প্রকারভেদ:

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম তিন প্রকার। যথা:

(ক) শারীরিক শ্রম/কায়িক শ্রম

(খ) শৈল্পিক শ্রম

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

(ক) শারীরিক শ্রম/কায়িক শ্রম:

কায়িক শ্রম হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের আসল মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.)-এর জীবনই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নবী করীম (সা.) নিজের মেহনতী যিন্দেগীর কথা বলতে যেয়ে একদিন বলেছিলেন, "দুনিয়াতে আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠননি যিনি বকরী চরাননি। তখন সাহাবা-ই-কিরাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হুযূর! আপনিও!" নবী করীম (সা.) জওয়াবে বললেন, হ্যাঁ, আমি দু'কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরিয়েছি।

(খ) শৈল্পিক শ্রম:

শৈল্পিক শ্রম বলতে বুঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশল বিদ্যাকে অধিক পরিমাণে খাটানো হয়। যেমন: অংকন, হস্তশিল্প, স্থাপনা ইত্যাদি কার্যে শৈল্পিক শ্রমের ব্যবহার হয়ে থাকে।

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম:

বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সকল পুঁজিহীন শ্রমকে বুঝায়, যেগুলোতে দেহের চাইতে মস্তিষ্ককে বেশি খাটানো হয়। যেমন: সাবধান, পরিচালনা, শিক্ষকতা, ডাক্তারী, আইনজীবী ইত্যাদি।

সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের পার্থক্য:

(ক) সাধারণ অর্থনীতিতে পারিশ্রমিকবিহীন কোন কাজই শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক শর্ত নয়।

(খ) সাধারণ অর্থনীতিতে যে কাজে আনন্দ আছে তা শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সৃষ্টির সেবা, নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি যে কোন কার্য যদিও আনন্দদায়ক হয়ে থাকে সবই শ্রম।

(গ) ইসলামী অর্থনীতিতে জনকল্যাণ বিরোধী কোন কাজই শ্রম হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতিতে এরূপ কোন শর্ত নাই। তাই এ শাস্ত্রে জনঅনিষ্টকর সকল কাজই শ্রম, যদি পারিশ্রমিক থাকে।

(ঘ) সাধারণ অর্থনীতিতে শ্রম অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিক্রয়যোগ্য, সুতরাং অন্যান্য পণ্য ব্যবহারে যেমন সহানুভূতি ও উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠে না, তেমনি মানুষকে কাজে খাটানোর বেলায়ও সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম অন্যান্য পণ্যের মতো বিক্রয়যোগ্য নয়। শ্রম হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং মানুষ যেমন বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে পারে না, ঠিক তেমনি তার কোন অংশও বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে পারে না।[১৯]

---

১৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমঃ

পরিচালকবিহীন ইঞ্জিন পরিচালনার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শ্রম বিবর্জিত মানব জীবনের কথাও ভাবা যায় না। আল্লাহ্‌র ভাষায়: "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।"[২০] শ্রমই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মানব জাতির জন্যে এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু ইসলাম-বিবর্জিত বিভিন্ন সমাজে শ্রমের বিভিন্নতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেয়া হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে কোন শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আবার কোন কোন শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাকার। সেখানে অর্থের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যে যত অর্থশালী সামাজিকভাবে তিনিই তত সম্মানী। যদিও ন্যায়নীতির মানদণ্ডে তিনি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির হোন না কেন। কিন্তু অর্থহীন কায়িক পরিশ্রমী ন্যায়নীতির মানদণ্ডে যতই স্বচ্ছ হউক না কেন তারাই সমাজের নিকৃষ্ট ও অবহেলিত ব্যক্তি। তাই দেখা যায় জীবিকা নির্বাহে যারা কায়িক শ্রম নির্ভরশীল তারা আদি যুগের দাসদের চেয়েও হীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু ইসলাম মানুষকে মর্যাদা প্রদান করে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে। এখানে মর্যাদা লাভের জন্য ধন্যাঢ্য কিংবা বিশেষ কোন বিত্ত শর্ত নয়। সুতরাং যে কোন পর্যায়ের শ্রমিক যদি তিনি ন্যায়পরায়ণশীল হন তিনিই হবেন সম্মানী।

নবী করীম (সা.) শ্রমের মর্যাদা বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন, "শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতম, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।"[২১]

নবী করীম (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, "ইয়া রাসূল! কোন্‌ ধরণের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি উত্তর করলেন-নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।"[২২]

রাসূলে পাক (সা.) আরও ফরমান, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।"[২৩]

আমরা জানি, নবী যিনি আল্লাহ্‌ প্রেরিত এবং মানবতার দীক্ষাগুরু হয়ে আসেন তিনি কখনও নীচ কাজ করতে পারেন না। উপার্জন করা, পরিজনদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পরিশ্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মতোই।

রাসূল (সা.) শ্রমের মর্যাদায় বলেন, "নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন অপেক্ষা উত্তম উপার্জন নেই।"[২৪]

---

১৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ২৬৯

২০. আল-কুরআন, ৯০:৪

২১. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমাদ, দারুল মায়ারিফ বায়রূত, ১৪০৯ হিজরী, হাদীস নং-৮৩৩৭

২২. ঐ, হাদীস নং-৮৩৩৮

২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল সহীহ আল-বুখারী, কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লী, হিজরী-১৪০৯,কিতাবুল বুয়ূ্য, হাদীস নং-১৯৩০

২৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনু মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২১২৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের দিকে সৎ উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করেছে, একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে ঠিক তেমনি রকমের উপার্জন না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক কাজ। বেকার থাকা ইসলাম কোনক্রমেই সহ্য করতে পারে না।

কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী করীম (সা.) এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না। তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম।"[২৫] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহর সঙ্গে এরকম অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না।"[২৬]

একবার এক সুস্থ্য-সবল ব্যক্তি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে। তখন তিনি তাকে বললেন, "কেন ভিক্ষা করে বেড়াও? তোমার কি কিছুই নেই?" লোকটি বলল, "একটি পানি খাওয়ার লোটা এবং গায়ে দেওয়ার জন্য একখানা কম্বল আছে।"

নবী করীম (সা.) তাকে তাই নিয়ে আসতে বললেন। পরে নিজেই নিলাম ডেকে দুই দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলেন। এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে এনে নিজেই এর হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, "যাও, জঙ্গলে যেয়ে কাঠ কেটে জীবিকা চালাও। পনের দিনের ভিতর যেন তোমাকে দেখতে না পাই।"

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, উক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছে। একদিন সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে কিছু হাদিয়া নিয়ে এসে দরবারে নববীতে তিনি হাজির হলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাকে বলেছিলেন, "অপরের সামনে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে এই তো তোমার জন্য উত্তম পথ।"[২৭]

নবী করীম (সা.) শ্রমের মূল্যায়ন করতে যেয়ে অনেক সময়ই বলতেন, "তোমাদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে, লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে এবং এমনিভাবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। দোরে দোরে ভিক্ষা, করুণা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল।"[২৮]

নবী করীম (সা.)-এর জীবিকার উপদেশ এবং শ্রমের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো সাহাবা-ই-কিরামের জীবনে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা নিচু হতে নিচু কাজকেও কোন দিন ঘৃণার চোখে দেখেননি।[২৯]

উপরে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর মহিমান্বিত বাণীসমূহ হতে ইসলামে শ্রমের উচ্চ মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

২৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ, সুনান আবী দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৪০০

২৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৮১

২৭. আবু দাউদ সুলায়মান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৯৮

২৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৮৬

২৯. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদাঃ

বস্তুতান্ত্রিক শিল্পজগৎ ও পৃথিবী শ্রমিকদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। এই সমাজে শ্রমিক-কর্মচারী তার প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টায় যখন প্রাণান্তকর অবস্থায় দিনাতিপাত করছে এবং অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত বাঁচার জন্য বার বার নিশ্চয়তা দাবী করছে ঠিক সেই মুহূর্তে পুঁজিপতি ও বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করছে।

তাই বিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়েও আজ অসংখ্য শ্রমিককে প্রাণবিসর্জন দিতে হচ্ছে। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দেশগুলো ইচ্ছামত বেতন কাঠামো শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ও তাদের বাঁচার দাবীকে দু'পায়ে মাড়িয়ে অন্য দেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অর্থ সম্পদ আজ হয়ে উঠেছে আত্মমর্যাদার ও সম্মানের মানদণ্ড। যার অর্থ-সম্পদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স আছে-তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, তিনিই সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম এই ধরণের ঠুন্‌কো আত্মম্ভরিতায় বিশ্বাস করেনা। ইসলামে জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সকল মানুষ সমান। মানুষের আমল ও আখলাক তাকে সম্মানিত করে, গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন গরীবের ঘরে বা একজন সাধারণ শ্রমিকের ঘরে জন্মেছে বলে সে নীচ বা হীন নয়। পক্ষান্তরে প্রাচুর্যের মধ্যে সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করায়ও গৌরব নেই। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইবনে শিহাব জুহরী উমাইয়া বাদশাহ আব্দুল মালিকের নিকট তাশরীফ আনলে পরে তাঁকে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের নৈতিক নেতৃত্ব দানকারী ইমামদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মক্কা, ইয়েমেন, মিশর, সিরিয়া, দজলা ও ফুরাত নদী বিধৌত অঞ্চল, খুরাসান, বসরা, কুফা-এই এলাকাগুলোর মধ্যে শুধু কুফা ব্যতীত সকল স্থানে আযাদীপ্রাপ্ত দাসগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে জানানো হয়।'[৩০] আল্লাহ্ মানুষের সকল মিথ্যা অহমিকা, কৌলীন্য এবং আভিজাত্যের অসারতা ছিন্ন করে আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু।'[৩১]

মহানবী (স.) বলেন, 'ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি বা জাতি মানবতার উর্ধ্বে নয়। তার নিকট মনিব, চাকর, উঁচু, নীচু এবং গরীব ও আমীর সবাই সমান। এদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে একমাত্র পরহেজগারিতা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য হতে পারে। তোমাদের প্রকৃত অবস্থা যখন এইরূপ তখন কেন অধীনস্থ লোকদেরকে হীন মনে কর?' যাদুল মাআদ গ্রন্থে নবী (স.) বলেন, "আজমের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই।"[৩২]

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ঘোষণা লাভ করেই ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা মনিবের বা শিল্পপতির সমকক্ষরূপে স্বীকৃত হয়নি বরং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় তা বাস্তবায়ন

---

৩০. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৪

৩১. আল-কুরআন, পৃ. ১–৬

৩২. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

করে দেখানো হয়েছে। মহানবী (স.) নিজে বকরী চরিয়েছেন, হযরত মুসা (আ.) নিজে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর নিকট নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করেছেন, দাউদ (আ.) কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম (আ.) কৃষক ছিলেন, নুহ (আ.) ছুতার ও ইদ্রিস (আ.) দর্জি ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরে হযরত ওমর (রা.) নিজের কাঁধে করে ময়দা বয়ে নিয়ে দিয়ে এসেছেন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে। নিজের চাকরকে যথার্থ সম্মান দিতে এবং তারও যে ক্লান্তি আসতে পারে সে কথার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৩৩]

আজকের সমাজে ইসলাম বিস্মৃত হওয়ার কারণে শ্রমিককে অর্থনৈতিক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তার যে সামাজিক কোন প্রয়োজন আছে, তার যে প্রাণ খুলে কথা বলার অধিকার আছে, অভিযোগের কথা বলার জন্য প্রাণ কাঁদে এ কথাগুলো ব্যবস্থাপকগণ বুঝতে চাননা। অধস্তন কর্মচারী লেখাপড়া জানে না বা কম জানে বলে সে মানবীয় মর্যাদাও হারাবে এটা অনভিপ্রেত ব্যাপার। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে যতদিন না অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা যাচ্ছে ততদিন তারাও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেনা, প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করবে না এবং উদ্দেশ্য অর্জনে (Achievement of objectives) জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেনা।[৩৪]

শ্রমিক ও কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, নিয়োগ ও নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, আচার-ব্যবহার, পদোন্নতি, সুবিধা প্রদান, শৃঙ্খলা আনয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়নীতি অনুসরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন সুবিধা প্রদান করার সময় (যেমনঃ যাতায়াতের জন্য বাস প্রদান) যদি প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে শ্রমের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

ইসলামী শ্রমনীতি ও তার বৈশিষ্ট্যঃ

কর্মী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান বিষয় হল শ্রমনীতি। কারণ শ্রম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধ্যাপক পিটার ড্রাকার বলেন যে, মানুষ ছাড়া মূলধন অর্থহীন কিন্তু মানুষ মূলধন ছাড়াই পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তর করতে পারে।[৩৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রম ছাড়া উৎপাদনের সকল উপাদান অর্থহীন। ব্যক্তির নিকট থেকে শ্রম ও প্রচেষ্টা যথাযথরূপে আদায় করতে হলে যে আদর্শ অনুসরণ করা হয় তাকে বলে শ্রমনীতি। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর থেকে কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, পদ-মূল্যায়ন, কার্য ও মেধা মূল্যায়ন, অভিযোগ পরিচালনা (Grievance handling) শৃঙ্খলা বিধান কার্য (Disciplinary Action), শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা, মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধা প্রদান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান, শ্রমিক-সংঘ গঠন প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে কর্মীদের স্বার্থ জড়িত থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে ইসলামের আদর্শ প্রয়োগ এবং উদ্ভূত সমস্যার সম্পূর্ণ ন্যায়, ইনসাফ ও বৈধ উপায়ে সমাধান করা হলে তাকে ইসলামী শ্রম নীতি বলা যাবে। উল্লিখিত শ্রম সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনের সময় বিভিন্ন প্রলোভন ও প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে সম্পূর্ণ ইনসাফ ও বৈধ পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইসলামী শ্রম নীতির বাস্ত বায়ন সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কর্মীদের নিয়োগের সময় স্বাভাবিক নৈতিক

৩৩. ঐ, পৃ. ১২৫
৩৪. ঐ, পৃ. ১২৫
৩৫. M.R. Kanwar, Lecture on Economic Development and planning New Academic Publishing Company, Jullandhar, 1993, P. 76

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইসলামের দাবী হল সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা। কিন্তু একই বা অন্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ নির্বাহীর অনুরোধ বা অবৈধ প্রভাব (Undue influence), রাজনৈতিক চাপ, সামাজিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের চাপ, স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি উপায়ে নিয়োগ করা হতে পারে। আবার কোন প্রকার প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার না করে সম্পূর্ণ যোগ্য প্রার্থীকেও নিয়োগ করা যেতে পারে। শেষোক্ত প্রকারের নিয়োগ তখনই সম্ভব হতে পারে যদি ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেকবোধ থাকে। প্রথম প্রকারের নিয়োগে পার্থিব স্বার্থ নিহিত আছে আর শেষোক্ত নিয়োগে উভয় স্বার্থই নিহিত আছে। শেষোক্ত শ্রমনীতিই ইসলামী শ্রমনীতি হিসাবে পরিগণিত।

ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক, কর্মচারী তথা মালিক ও ব্যবস্থাপনা সকলের জন্যই অত্যাবশ্যকীয়। কারণ এ নীতি প্রণীত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমাদের ব্যক্তিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক কি? তাই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের জন্য পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক জীবন বিধান হিসাবে প্রদান করেছেন। সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতির মূল উৎস কুরআন এবং হাদিস। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ থেকেই আমরা এ প্রমাণ পাই।

আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের যখন কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক মীমাংসা কর। রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন তাতেও তিনি বলেন যে, তোমরা যদি দুটি জিনিসকে আঁকড়ে থাক তাহলে তোমরা কোনদিন বিভ্রান্ত হবে না। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কুরআন এবং অন্যটি রাসূলের হাদিস। মহানবীর আরেকজন প্রধান সাহাবী হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ইয়েমেন প্রেরণের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যখন তোমার সামনে কোন সমস্যা দেখা দেবে তখন তুমি কিভাবে সে সমস্যার মোকাবিলা করবে। হযরত মায়াজ জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করব। রসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়ের ফয়সালা খুঁজে না পাও? তিনি জবাব দেন, তাহলে রসূলের (স.) সুন্নত অনুসারে ফয়সালা করব। রসূল (স.) তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, যদি রসূলের সুন্নতের মধ্যেও কোন বিষয়ে সমাধান খুঁজে না পাও তখন? জবাবে হযরত মায়াজ বলেন, আমি নিজেই ইজতিহাদ করে সে কাজের ফয়সালা করার চেষ্টা চালাব এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করব না। মহানবী (স.) জবাব শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বলেছিলেন যে, আল্লাহ রসূলের প্রতিনিধিকে রসূলের মন:পুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান করেছেন।[৩৬]

---

৩৬. আবু দাউদ সুলায়মান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, যাঁর মনোনীত জীবন বিধান ইসলাম, তিনি ইসলামী শ্রম নীতিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন কারণ ও পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যার কোনটির সমাধান স্পষ্টরূপে কুরআন ও হাদিসে না মিললে ধর্মানুরাগী জ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। উল্লিখিত পন্থা পুরোপুরি অনুসৃত হলে শ্রমনীতির এমন কোন সমস্যা থাকতে পারে না যার সমাধান সম্ভব নয়। যেহেতু পূর্ণ ইসলামী শ্রমনীতি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণয়ন করা সম্ভব, সুতরাং শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব্যবস্থাপকদের উচিত অবিলম্বে সে নির্দেশ অবলম্বনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করা।

ইসলামী শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তাই ইসলামী শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্যও কুরআন নির্দেশিত এবং রসূল (স.) প্রদর্শিত তথা বাস্তবায়িত। ইসলামী শ্রম নীতি প্রতিপালিত হলে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার শ্রম অসন্তোষ দেখা দিতে পারে না। এই নীতির শাশ্বত বিধান সকল স্তরের মানুষই গ্রহণ করতে পারে। এই শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. এই শ্রমনীতি সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রণীত হয়ে থাকে;[৩৭]

২. কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল কার্য সম্পূর্ণরূপে ন্যায়, ইনসাফ এবং বৈধ পন্থায় সম্পাদিত হয়;

৩. কোন সময় কোন প্রকার প্রভাব, চাপ ও ভীতির কাছে নতি স্বীকার করেনা;

৪. ইহকাল ও পরকালের শান্তি তথা মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়;

৫. সাময়িকভাবে কোন কর্মী অসন্তুষ্ট হলেও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যহীন হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে সকলেই এ নীতির প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করে;

৬. নিয়োগ প্রাপ্তদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যেমন বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করে তেমনি যারা বেকার বা অসুস্থ তাদের ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়;

৭. বেকার হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত বা হ্রাস না করা পর্যন্ত এই নীতি অনুসারে কর্তৃপক্ষ কোন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করতে পারেনা;

৮. প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক কেউ কোন প্রকার অমঙ্গলের চিন্তা করেনা এবং প্রতারণা করে না;

৯. মালিক-শ্রমিক সম্পূর্ণ ভাই ভাই, কোন শ্রেণী বৈষম্য নেই;

১০. শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণহীন ব্যক্তি মালিকানা আছে;

১১. কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্মতির ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারিত হয়;

১২. বেতন স্কেলের পার্থক্য সর্বনিম্ন হয়ে থাকে;

১৩. পরিবারের অতিরিক্ত সদস্য থাকার কারণে বাড়তি মজুরীর প্রয়োজন হলে তাকে পৃথক তহবিল থেকে দেয়;

১৪. ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রম শোষণ অবৈধ;

১৫. শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার কোন নীতির মর্যাদা পায় না। কেবল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত পন্থা হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়;

১৬. ইসলামী শ্রম নীতি অনুযায়ী কোন কর্মচারীকে হারাম কাজে নিয়োগ করা যায় না;

১৭. কর্মচারীদের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য মনে করেনা বরং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মনে করে।

---

৩৭. কবির আহমদ মজুমদার, ইসলামী শ্রমনীতি কি? মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শ্রমনীতির তাৎপর্য:

শ্রমনীতি হওয়া তখনই সার্থক হয় যদি তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। ইসলামের আদর্শ স্মরণে না রেখেও যে সমস্ত শ্রমনীতি প্রণীত হয় তাতেও ঢালাওভাবে বৈষম্য এবং বে-ইনসাফি প্রশ্রয় পায়না। কিন্তু উক্ত শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হওয়ার প্রাক্কালে যে সমস্ত প্রভাব এবং প্রলোভন আসে তা কাটিয়ে ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নানাবিধ অবিচারের পরিণামে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মালিক তখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি খড়গহস্ত হয় এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অত্যাচারিত এবং অত্যাচারীর সম্পর্কে পর্যবসিত হয়।

একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, মেজাজ ও মানসিকতার ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সুতরাং যে কোন একটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিবেকবোধ, সততা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি না থাকলে মতানৈক্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং এড়াবার পর্যাপ্ত নৈতিক প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত শ্রমনীতিও কাগুজে শ্রমনীতির রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৮]

উল্লিখিত অবস্থার অবসানকল্পে ইসলামী শ্রমনীতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতে কোন প্রকার বে-ইনসাফি ও বৈষম্যের অবকাশ না থাকায় শ্রমিক কর্মচারীগণ সর্বদা এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ শ্রমনীতির প্রতি মালিক ও শ্রমিকের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখার জন্য 'খোদা-ভীতি ও ধর্মানুরাগ' পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলের থাকে পর্যাপ্ত নৈতিক প্রশিক্ষণ। পার্থিব কিছু প্রভাব ও প্রলোভন আসলেও পরকালীন শাস্তির ভয়ে তা ম্লান হয়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক:

আজকাল শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক এক বিরাট সমস্যা নিয়ে বিদ্যমান। ধনবাদী অর্থনীতির ভিত্তি যেহেতু আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিস্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এক রুক্ষ ও কৃত্রিম সম্পর্ক বিরাজমান। সকলেই নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এর প্রতিক্রিয়ায় কার কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে তাকাবার ফুসরত নেই কারও।

এই স্বার্থান্ধতার ফলে শ্রমিক ও মালিক আজ দুটি মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজ একজন শ্রমিক ততক্ষণই শিল্প-মালিকের কাছ থেকে তার মানবিকতার মর্যাদা পায়, যতক্ষণ কোন মালিক তার কাজ আদায় করে নিতে গিয়ে কোন শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু যখনই এই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে তখনই মালিক মেহনতি শ্রমিকশ্রেণীর উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাতেও দ্বিধা করে না।

আর অন্যদিকে শ্রমিক ও মালিকের কাজে ততক্ষণই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে, যতক্ষণ তার জীবিকা কোন মালিকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই এই বাধ্যবাধকতা থাকে না সেখানেই শ্রমিক কাজে গাফলতি ও মালিকের বিরুদ্ধে হরতাল এবং ঘেরাও অভিযান করতেও পিছপা হয়না। যার পরিণতিতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এক চিরন্তর দর-কষাকষি বিদ্যমান এবং তাদের পরস্পরে কোন সৌহার্দপূর্ণ ও গঠনমূলক সম্পর্ক কায়েম হয়ে উঠতে পারছে না।

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে ইসলাম এদিকে সবসময়ই লক্ষ্য রেখেছে যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যেন একেবারে শুষ্ক ও কৃত্রিম না হয়ে পড়ে। কারণ এ সর্বজনমান্য কথা যে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোনদিন সুষ্ঠু উৎপাদন আশা করা যেতে পারে না। ফলে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না।

ইসলাম তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ভিত্তিতে এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক কায়েম করে। ইসলাম উভয়কে এমন কতকগুলো বিধি-নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছে যাতে তাদের ঐ ব্যবসাগত সম্পর্ক কঠিন না হয়ে হয়েছে ভ্রাতৃমূলক প্রীতির।

একটি কারবার প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিক একই সূত্রে ও উদ্দেশ্যে বাঁধা দুইটি পক্ষ। এদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা ও নির্বিঘ্নে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক।

পক্ষান্তরে শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক মধুর না হলে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রভৃতি শুরু হয়ে যেতে পারে। পরিণামে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ভাল থাকলে মালিক পক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের মঙ্গলের চিন্তা করবে, শ্রমিকগণও নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করবে। ফলে উভয়ের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে।

রসূল (স.)-র ভাষায়, ভাই সর্বদা অন্য ভায়ের মঙ্গল কামনা করে এবং তার পছন্দ-অপছন্দকে নিজের সাথে একত্রিত করে ফেলে। হযরত আনাস (র.) বলেন, নবী (স.)-এরশাদ করেন: "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য ভায়ের জন্যও তা পছন্দ করে।"[৩৯] আল্লাহর নবী শ্রমিকের অন্তরের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে আহবান জানিয়ে বলেন: "তোমরা অধীনস্থদের সহিত সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না যে তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে; ব্যথা দিলে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। পক্ষান্তরে আরাম ও শান্তি দিলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে, তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।"[৪০]

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হওয়ার পর তাদের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য মালিক পক্ষকে আহবান জানানো হয়েছে। একদিন জনৈক সাহাবী চাকর-খাদেমদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করা যাবে জিজ্ঞেস করলে রসূল (স.) বলেছিলেন, "প্রতিদিন সত্তর বার হলেও তাকে ক্ষমা করে দিও" (এ যে তোমার ভাই)"[৪১] অন্যত্র বর্ণিত আছে, "মজুর-চাকরদের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ।" অসদাচরণকারী মালিক সম্পর্কে তিনি বলেন, "অসদাচরণকারী মালিক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৪২] হযরত আনাস (রা.) তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "রসূল (স.) তাঁকে কোন কাজে পাঠিয়ে সে কাজের পরিবর্তে খেলা করা অবস্থায় হাতে নাতে ধরার পরও রুষ্ট হননি বা ভৎর্সনা করেননি।"[৪৩]

---

৩৯. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযি, সুনান আত তিরমিযী, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী, কিতাবুল বিররি, হাদীস নং-১৮৭২

৪১. উদ্বৃত: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৪২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৫৫৭৮

৪৩. আল-কুরআন, ১৬:৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন যে, সুদীর্ঘ ১০ বছরকাল সময়ের মধ্যে হযরত (স.) কোনদিন তাঁর অধীনস্থদের কাছ থেকে কড়াকড়িভাবে ও ধমকের সুরে কাজের হিসাব নেননি।"[৪৪]

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হয়েই তাদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে হবে। তবেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হতে পারে। মালিক পক্ষ যখন কর্মীদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকলে কর্মীগণও মালিকদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন করবে।

শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখার জন্য মালিক ও ব্যবস্থাপনার যেমন কর্তব্য আছে তেমনি শ্রমিকদেরও তা রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র এক পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ওপর সম্পর্ক এবং শৃঙ্খলা তথা উন্নতি নির্ভর করেনা বরং শ্রমিকদেরও দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ও কর্তব্য পরায়ণ হতে হবে।

এ পর্যায়ের শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তাকে বিশেষ আন্তরিকতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় পুরোপুরি কাজের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করতে হবে। কাজে অমনোযোগিতা, উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন কিংবা কাজ না করে যেন তেন প্রকারে সময় কাটিয়ে দেয়া ইসলামের শ্রম আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এরূপ করা হলে তাতে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হবে এবং এজন্য তাকে আল্লাহর নিকট দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কারো ওপর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নৈতিকতার দাবি হল সে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবে। আর এজন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। কুরআনের ঘোষণা হল; "তোমরা যা কিছু করছিলে সে বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব।"[৪৫] রসূল (স.) বলেন, "শিল্প মজুর যখন কাজ করবে তখন সে উত্তমরূপে কাজ করবে, আল্লাহ্ এটাই ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।"[৪৬] ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেনঃ "যার কাজ পূর্ণাঙ্গ, উত্তম, নিঁখুত ও মজবুত হবে, তার পুণ্য কয়েকগুণ বেশী হবে।"[৪৭]

শ্রমিক-কর্মীগণ অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বা অবহেলা বশতঃ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল বা অন্যান্য উপকরণের ক্ষতি করে থাকে। কুরআনের ভাষায় একে খিয়ানত বলা হয়েছেঃ "যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে-অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে, আল্লাহ্ তাকে ভাল বাসেন না।"[৪৮] নবী (স.) ও এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উল্লেখ করেছেন, "যে লোক আমার সঙ্গে ধোকাবাজী করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।"[৪৯] তিনি তাই তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেনঃ "শ্রমিকের সবচেয়ে মঙ্গলজনক উপার্জন হল তার নিয়োগকারীর জন্য শ্রদ্ধা ও যত্ন নিয়ে কার্যসম্পাদন করা।"[৫০]

---

৪৪. উদ্বৃতঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৪৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৪৬. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৪৭. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ, সুনানু ইবন মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-২৫৬৫
৪৮. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
৪৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাওলা, হাদীস নং-২১২৫
৫০. আল-কুরআন, ৫:১

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-কর্মীদের অবশ্যই তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকের অধিকারঃ

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এর জন্য সুনির্দিষ্ট মৌল আঙ্গিক ধারা নিরূপণ করেছে এবং এর বুনিয়াদী সমাধান পেশ করেছে। যার সাহায্যে আমরা অতি সহজেই একটি ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারি। যা আজকের এই সংঘাতমুখর পৃথিবীকে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিশাপ থেকে চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে।

এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হলো, সে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্মানজনক চুক্তিকে স্বীকার করে, একে সমর্থন জানায়। আজকাল দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকরা যে চুক্তি করে তা পূরণ করতে যেয়ে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতার ছত্রছায়া গ্রহণ করার অপকৌশলে তারা মেতে উঠে বিরক্তিকর টালবাহানা করতে শুরু করে দেয়। ইসলাম একে অসহ্য রকমের এক জুলুম বলে ঘোষণা করে। নবী করীম (স.) ফরমান, "সঙ্গতিসম্পন্নদের টালবাহানা করা (মারাত্মক) জুলুম।"[৫১]

আল্লাহ্‌পাক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো অবশ্যই পূরণ কর।"[৫২] তিনি আরো বলেন, "আর নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।"[৫৩]

আবার অনেক সময় শিল্প-মালিকগণ শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদেরকে নিকৃষ্টতম ও নিম্নতম শর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। আর বেচারা শ্রমিক যখন নিজের ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত, হাড্ডি-জিরজিরে রোগগ্রস্ত পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের অন্ন সংস্থানের এবং নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে আর ভাবে এ ছাড়া তার কোন উপায় নেই, তখন সে যে কোন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পিছপা হয় না। আর মালিকরা তার জিগরের খুন এমনি করেই বিষাক্ত লোলুপতা নিয়ে চেটে খায়। কিন্তু ইসলাম বলে, কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার বিপর্যস্ততার ছত্রছায়ায় যে চুক্তি করা হয়, এর শর্তাবলীর কোন মূল্য নেই। এই জুলুমের চুক্তি অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হয়। একে ইসলাম কোন সময়ই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্মানিত ও অনুমোদিত চুক্তিপত্র বলে স্বীকার করে না। এ সম্পর্কে বলতে যেয়ে প্রাচ্যের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) বলেন, অনন্তর আর্থিক লাভ যদি এইভাবে হাসিল করা হয়, যার মধ্যে চুক্তিকারীদের পারস্পরিক সাহায্য এবং কার্যকরী মেহনতের সম্পর্ক না থাকে যেমন জুয়া বা দল নিজেদের সঙ্গতিহীনতার দরুণ (বর্তমান অভাব মেটানোর নিমিত্ত) এমন অনেক শর্তের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যায়, যেগুলো আদায় করা তার শক্তির বাইরে। তখন তার ঐ সম্মতি সত্যিকারের সম্মতি হয়না। তাই এমম্বিধ সমস্ত প্রকারের চুক্তি ও লেনদেন সম্মতিক্রমে অনুমোদিত বলে ধরা যায় না। আর এইগুলোর আমদানির পবিত্র ও ন্যায়ানুগ উপকরণ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ সমস্ত চুক্তি একটি সংস্কৃতিবান দেশের জন্য নিকৃষ্টতম, বীভৎস ও বাতিল চুক্তি।[৫৪]

---

৫২. উদ্বৃত: ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মামুলী ধরণের অধ্যয়নও এর প্রমাণ ব্যক্ত করে যে, ইসলামে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতিই কোন বিষয়ের গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি নয়। অন্যের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে দিলেই খুনী তার অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তেমনি অবস্থার চাপে কেউ কোন ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে দিলেও তার উপর জুলুম জালানোর এখতিয়ার কোন পুঁজিপতির হতে পারে না।

তাই দেখা যায়, যেসকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় এবং যা দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে পারস্পরিক সম্মতিকেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয় না।

নবী করীম (স.) বলেছেন, "মানুষ তাদের চুক্তিবদ্ধ শর্তানুযায়ী দায়িত্বশীল হবে, যদি তা হক ও ন্যায়ানুগ হয়।"[৫৫]

ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রচলন করতে চায়। ন্যায়কে সে অগ্রে স্থান দেয়। যেখানেই তা আহত হয় সেখানেই সে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইসলামের মূল কথা হলো নবী করীম (স.) বলেন, "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।"[৫৬]

১. মজুরী: আজকের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘাত হলো, মজুরী নির্ধারণ সমস্যা। কি করে মজুরি নির্ধারণ করা হবে, এ সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নানা মত পোষণ করে থাকেন। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থানুসারে মজুরী নির্ধারণের সর্বাধুনিক সূত্র হলো যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানোর অনুপাতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের দামও তেমনি ও যোগানোর অনুপাতে নির্ণীত হবে। অর্থাৎ চাহিদা বেশি হলে মজুরী বেশি হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ অধিক হলে মজুরী কমে যাবে। তারা বলেন, দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরীও তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরী নিরূপণের প্রধান সূত্র হলো-দক্ষতানুসারে কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরী। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেওয়া হবে কিন্তু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে মজুরী দেওয়া হবে।

সমাজবাদী দেশগুলোর বর্তমান কার্যক্রম সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজকাল সেখানেও কাজের দক্ষতানুসারেই মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে, শ্রমিকদের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

মননশীলতার সাথে যাঁচাই করলে দেখা যায়, উপরোক্ত একটি মতও মজুরী নির্ধারণের সুষ্ঠু ও সুসংহত ধারা হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে দ্রব্যবস্তুর মতোই প্রাণহীন ও অসহায় করে তুলেছে। দ্রব্য যেভাবে চাহিদা ও যোগানোর অধীন, তার কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, তেমনি শ্রমিককেও চাহিদা ও যোগানের অধীন করে ফেলা হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ক্রেতার মর্জির উপর দ্রব্যের অবস্থা নির্ণীত হয়, ঠিক তেমনি এখানে শ্রমের ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতির মর্জির উপর শ্রমিকদের অবস্থা নির্ভর করে।

---

৫৫. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইদী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩১৪১

৫৬. উদ্বৃত: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

এটি সর্বজনবিদিত কথা যে, আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য দেশের অধিকাংশ অর্থ এবং কর্মবিনিয়োগ স্থূল পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পরিণামে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমের যোগান বেড়ে যায়। এতে শিল্প-মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের জন্য এ এক চরম অভিশাপ। আর এই জন্যই বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ একে একতরফা সূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

এ সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা কখনই সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি উৎপাদনই কয়েকটি উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়, সম্পূর্ণ দ্রব্য হতে প্রত্যেকটি উপাদানের ব্যক্তিগত অংশ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দক্ষতার কোন বিবেচনাই করা হয়নি।

এদিকে নজরই দেওয়া হয়নি। মজুরী নির্ধারণের বেলায় শুধু শ্রমিকদের প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি কানে মধু বর্ষণ করলেও এ দ্বারা কোনদিন কার্যোপযোগী কোন অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হতে পারে না। কারণ শ্রমিক যদি তার দক্ষতার দাম না পায়, এর প্রতিদানে সে যদি কিছুই লাভ করতে না পারে, তবে সে দক্ষতা অর্জনের জন্য কখনই আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না।

প্রয়োজন কখনও সমান হতে পারে না। এর মধ্যে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। একজন ইট বহনকারী শ্রমিক যদি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা মজুরী পায়, আর একজন দক্ষ মিস্ত্রী যদি তার প্রয়োজন অনুসারে দু'শত টাকা মজুরী পায়, তবে কেন সে দক্ষ মিস্ত্রী হতে যাবে? কিসে তাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। তাই এর ফলে উৎপাদনের কার্যধারার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে যাবে,সু-কঠিন আইনের শাসনও একে রোধ করতে পারবে না। এই সূত্রানুযায়ী ও মজুরী নির্ধারণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না। আর এটিই সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটিয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রকে জাদুঘরে নিক্ষেপ করেছে। এর সামঞ্জস্য সমাধান করেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান যা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সকল চরম প্রান্তিকতা হতে মুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো-ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে যেন সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে।

পূর্বে ওয়ালীউল্লাহ (র.)-এর যে উদ্বৃত্তি দেয়া হয়েছে এর দ্বারা এই কথাই বোঝা যায়। কারণ, শ্রমিক একান্তভাবে অসহায় না হয়ে পড়লে কোনদিন সে তার প্রয়োজনের চেয়েও কম মজুরী লাভের চুক্তিতে আসতে পারে না। আর যে চুক্তি শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগ করা হয়, ইসলামের কাছে তার কোন মূল্যই নেই।

আল্লাহ্‌পাকের কালাম এবং নবী করীম (সা.)-এর হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হুযূরপাক (সা.) ফরমান, "অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।"[৫৭]

---

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন, "এদেরকে (অধীনস্থদেরকে) পরিতৃপ্ত করে দেবে।" আল্লাহপাক ইরশাদ ফরমান, "যে সমস্ত মাকে সন্তানের পিতা ত্যাগ করেছে, তাদেরকে দুধ খাওয়ানোর নিমিত্তে নিয়ে আসলে সন্তানের পিতা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে জীবিকা ও কাপড়-চোপড় দেবে।"[৫৮]

উপরোক্ত আয়াত ও আল-হাদীস পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত দু'টি সিদ্ধান্তে আনায়াসেই পৌছা যায়। যথা- (ক) মালিক শ্রমিকদের ভরণ- পোষণের দায়িত্ব নেবে।

অথবা,

(খ) এমন মজুরী দেবে, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়।

কারণ ইসলামের মজুরী নির্ধারণ নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এখানে শ্রমিক চাহিদা ও যোগানের, বাজারের সব রকম ওঠা-নামার অধীন নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, নিম্নতম মজুরী কি করে নির্ধারণ করা যাবে? এর উত্তরও আমরা সাহাবা-ই-কিরামের কার্যক্রমের মধ্যে পাই।

হযরত উমর (রা.) এইভাবে খোরাকী নির্ধারণ করতেন যে, সুস্থ-সবল ভাল খেতে পারে এমন কয়েকজনকে ডেকে এনে খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার অনুপাতে তা নির্ধারণ করে দিতেন।[৫৯] তিনি তাঁর খিলাফতের আমলে কর্মচারীদেরকে তাদের প্রয়োজন এবং যে শহরে বাস করবে তার পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী ভাতা দিতেন।[৬০]

আমরাও আজকাল আমাদের পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করতে পারি। কারণ মানুষের প্রয়োজন, স্থান, কাল ইত্যাদি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে সমসাময়িক সরকার মধ্যস্থতা করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কাজের দক্ষতারও মূল্য দেয়। অর্থাৎ কাজের দক্ষতা হিসাবে মানুষের উপার্জনের তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে। কারণ, এ না হলে কোনদিন কার্যোপযোগী ও সহজাত শ্রমনীতির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়না। আর এর দ্বারা ইসলাম সমাজতন্ত্র হতে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পেরেছে। এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক বলেন, "আমি মানুষের জাগতিক জিন্দিগীতে তাদের জীবিকা উপকরণসমূহ বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কতকজনকে কতকজনের উপর মর্যাদার প্রাধান্য দিয়েছি-যাতে একে অন্য থেকে কাজ নিতে পারে।"[৬১] কিন্তু এই তারতম্য ও স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও এমন কতিপয় বিধি-নিষেধ দ্বারা একে আবদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে উক্ত তারতম্য মাত্র ততটুকুই থাকে যতটুকু একটি সুসংহত ও কার্যকরী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবশ্যক, এর বেশি নয়।

এমন অনেক পুঁজিপতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা শ্রমিকের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজুরী নির্ধারণ না করেই তার কাছ থেকে কাজ নেয় এবং নিজে যা মন চায় তাই মজুরী দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। শ্রমিক তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে এর কিছুই করতে পারে না, সবকিছু তার নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। ইসলাম এই সমস্ত ব্যাপারকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন-নবী করীম (স.) পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে মজুর থেকে কাজ নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৬০. আল-কুরআন
৬১. আল-কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। কিন্তু অগ্রিম বা অন্য কোন রকম শর্ত থাকলে সে শর্তানুযায়ী কাজ হবে।

২. কাজের সময় নির্ধারণ: মজুরদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কাজের সময় নির্ধারণ। পূর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা মজুরদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিত। এমনকি বার হতে ষোল ঘন্টা পর্যন্ত একজন শ্রমিককে কাজ করতে হত। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকেও এ থেকে রেহাই দেওয়া হত না। এই রকমের জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিক সংঘগুলো তৎপর হয়ে ওঠে এবং ১৮৮০ সালের মে মাসে শিকাগোর শ্রমিকগণ আট ঘন্টা ডিউটি দানের দাবিতে ব্যাপক ধর্মঘট করে, কিন্তু নির্মমভাবে একে দমন করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সংগ্রামের পর আট ঘন্টা দাবী প্রায় সমস্ত দেশই মেনে নেয়।

ইসলাম শ্রমিকদের এই মৌলিক সমস্যাটির অত্যন্ত সুন্দর সমাধান দেয়। আমরা জানি-পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্য-হেতু মানুষের কর্মদক্ষতাও সমান হয় না। আঞ্চলিক জলবায়ুর প্রভাব মানুষের উপর পড়েই থাকে। একজন বৃটেনের শ্রমিক তার দেশে যতক্ষণ কাজ করতে পারে আমাদের দেশের শ্রমিকও ততক্ষণ পারবে এ কথা ঠিক হতে পারে না। আবার অনেক সময় কাজের প্রকৃতি হিসেবেও এর মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। খনিতে নিয়োজিত শ্রমিক আর একজন সেলস্‌ম্যান একই সময় পর্যন্ত উভয়ই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তা নয়। আয়াস-সাধ্য ও কঠিন কাজে শ্রমিকগণ স্বভাবত অপেক্ষাকৃত কম সময়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সহজতর কাজে লিপ্ত একজন শ্রমিক একটানা অনেকক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এইজন্য আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা সকল দেশ ও সকল কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া কখনই যুক্তযুক্ত হতে পারে না।

তাই ইসলাম কাজের কোন নির্ধারিত সময় ঠিক করে দেয়নি বরং এর ন্যায়ভিত্তিক মূলনীতি বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ততক্ষণই একজন শ্রমিকের নিকট হতে কাজ নেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে তা কুলিয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ ফরমান, "কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।"[৬২] আর এই বক্তব্যটিই আরও বিকশিত করতে যেয়ে নবী করীম (সা.) ফরমান, "যে কাজ তার জন্য অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিও না।"[৬৩]

ঐ মূলনীতির অনুসরণ করে আমাদের দেশের পরিবেশ কার্যক্ষমতা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের সময় নির্ধারণ করা জরুরী।

৩. কাজের প্রকৃতি: শ্রমিককে দিয়ে কি ধরণের কাজ মালিক নিতে চায়-তাও পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। মজুরের সম্মতি ব্যতিরেকে তাতে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে মজুর পুঁজিপতির হাতের খেলনা নয়, বরং সে তারই সমমর্যদার অধিকারী স্বাধীন এক সত্তা। এই সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী আইনগ্রন্থ 'হিদায়ায়' বলা হয়েছে-মালিক কি রকমের উপকৃত হতে চায় তা নির্ধারণ ব্যতিরেকে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা সহীহ্ হয়না। কাজের প্রকৃতি কি ধরণের হতে হবে এ ব্যাপারেও ইসলামের মূলনীতি হলো শ্রমিককে দিয়ে এমন কাজ করানো যাবে না, যা তার জন্য অতি কষ্টকর। এমনিভাবে কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

---

৬২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৬৮
৬৩. উদ্বৃত: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্থানান্তর গমনের অধিকার:

অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে চলে যাওয়ার অধিকার মানুষের অন্যতম জন্মগত অধিকার। এতে হস্তক্ষেপ করা মানেই একজন মানুষের স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপ করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যার কারণে শ্রমিকগণ এ থেকে পুরোপুরিভাবে লাভবান হতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে পিষে মারা হচ্ছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতাটুকু হতেও আজ বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সেখানে নিজের ইচ্ছামতো একজন শ্রমিক কাজ বাছাই করে নিতে পারে না বা স্থানান্তর গমন করতে পারে না। সেখানে একহজন শ্রমিক কতকজন কমরেডের খেয়াল-খুশির অধীন। স্টালিনের আমলে এ এক অসহনীয় রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪০ সনের ২৬ জুনের এক সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল-মাসিক অথবা রোজভিত্তিক যে কোন মজুরই হোক না কেন, তাকে স্বাধীনভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা হতে নিষেধ করা হলো। এ অধিকার শুধু কারখানা ডাইরেক্টরেরই আছে। এই আদেশ অমান্য করলে দুই থেকে চার মাস জেলের ভোগান্তি সহ্য করতে হবে।

ইসলাম মজুরের এই স্বাভাবিক ও স্বাধীন অধিকারকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে এবং এর নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এ সংশ্রবেই রাসূলপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "সমস্ত দেশ ও জমীন আল্লাহ্‌র, আর সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই যেখানেই তুমি মঙ্গলজনক মনে কর সেখানেই বাস কর।"[৬৪]

উপরোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত তিনটি ধারা পাওয়া যায়-

(ক) সমস্ত দেশ আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ স্থানান্তর গমন হতে বিরত রাখতে পারে না।

(খ) সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত কারো উপর অন্যায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে না।

(গ) যেখানে সুবিধা হয় সেখানেই থাকা যাবে।

লাভের অংশীদার:

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই সমস্ত লাভের অংশ হাতিয়ে নেয়। বোনাসের নামে শ্রমিককে যৎসামান্যই দেওয়া হয়। আর এমনি করেই অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা পুঁজিপতিদের পকেট ফুলে ফেঁপে ওঠে। রক্ত পানি করে মেহনত করার পর একজন শ্রমিক দেখে সমস্ত কিছুই পুঁজিপতির হাতে চলে গিয়েছে। সে হয়েছে রিক্ত, আর রিক্তের নেই মাথাগুজবার ঠাঁইটুকুও।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লাভের মধ্যে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এর নিমিত্তে ইসলাম মুদারাবাত, মুসাকাত, মুজারাআত প্রভৃতি পন্থা নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদেরকে মুনাফার অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। নবী করীম (স.) ফরমান, "শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।"[৬৫]

---

৬৪. আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২৫০

৬৫. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য সংরক্ষণঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য হলো আল্লাহ্‌র পবিত্র এক আমানত। তাই স্বাস্থ্যহানিকর কিছু করা অপরাধ। ইসলাম মজুরদের স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম বলে-শ্রমিকদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ করতে হবে, তাকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে যা সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উপযোগী। এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইবনু হাযম (র.) বলেন, "মালিকের জন্য উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া, যতটুকু সে আনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তার সামর্থ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তার লোকসান হয়।"[৬৬]

তাই তাকে এমন পরিবেশে রাখা যাবে না, যাতে তার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নবী করীম (স.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। হযরত উমর (রা.) অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কি-না এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এই কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।

শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ দানঃ

আজকাল শ্রমিকদের জন্য এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিজেরাও শিক্ষিত হতে পারে না। আর ছেলে-মেয়েদিগকেও শিক্ষিত করে গড়ে তোলার সুযোগ পায় না। ফলে শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে অত্যন্ত কম এবং শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এতে জাতীয় উৎপাদনে যে কতটা ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম উক্ত সমস্যারও একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাধান দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মূলত রাষ্ট্রের কর্তব্য, হুকুমের উপরই তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা সাধারণত অবৈতনিক এবং রাষ্ট্রই সকল ব্যয়ভার বহন করবে। হযরত ওজীল ইবনে আতা (রা.) বর্ণনা করেন-"মদীনায় তিন জন ছিলেন, যারা শিশুদেরকে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁদেরকে (বায়তুলমাল হতে) মাসোহারা দিতেন।"[৬৭]

বাসস্থানঃ পূর্বে শ্রমিকদের এই সমস্যা আজকালের মতো এত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। এমন করে শিল্প-কারখানারও সম্প্রসারণ ঘটেনি। নিজের বাড়িতে থেকেই মেহনতীজনেরা নিজেদের মেহনত বিনিয়োগ করার অফুরন্ত সুযোগ পেত। আহার্য সংগ্রহে তাদের বাড়ি ছেড়ে বেরুনোর বিশেষ প্রয়োজন হত না। কিন্তু আজকাল অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।

ইসলাম এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমসাময়িক ইসলামী সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে এর সমাধান করার-যেন কারও উপর জুলুম না হয়। হযরত উমর (রা.) সরকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলতেন, সবচেয়ে ভাল এবং নেকবখ্‌ত শাসনকর্তা সে-ই যার অধীনে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সাথে থাকে। আর সবচেয়ে বদবখত্‌ শাসনকর্তা সে-ই, যার প্রজা-সাধারণ অভাব ও অশান্তিতে দিন যাপন করে।"[৬৮]

---

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতির দায়িত্বঃ

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, আত্মসর্বস্ব, অর্থ-গৃধ্মা পুঁজিপতিরা শ্রমিকদেরকে অনর্থক হয়রানী করতে আরম্ভ করে দেয়। আত্মস্বার্থ পূরণের এক জঘন্য লালসায় মেহনতীদের বিরুদ্ধে কাজ খারাপের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণের নামে শোষণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

ইসলাম এখানেও এক ন্যায়ভিত্তিক সমতার ফয়সালা করে। ইমাম ইবনে হাযম লিখেন, যাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক হিসেবে রাখা হয়েছে, তার হাতে যদি ক্ষতি বা কোনকিছু নষ্ট হয়ে যায়, তাতে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শ্রমিকের উপর বর্তায় না। হ্যাঁ, সে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে তা করে তবে অন্য কথা। আর এই ব্যাপারে কোন স্বাক্ষী না থাকলে মজুরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কসমসহ।[৬৯]

আজকাল দেখা যায়, পুঁজিপতিরা কৌশলে কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে এবং মজুরদের মজুরী কমিয়ে দেওয়ার এক অপপ্রয়াস পায়। এতে মজুরদের অবস্থা কতটুকু অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে সমস্ত শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়, উৎপাদনের ঘাটতির জন্য তার সম্মতি ব্যতিরেকে পারিশ্রমিকে কোন প্রকার কমতি করা যাবে না। ঘাটতির লোকসান পুঁজিপতিকেই বহন করতে হবে। এ ঝুঁকি অসহায় মজদুর কোন প্রকারেই নিতে পারে না।

চাকরির নিরাপত্তাঃ

এই ব্যাপারেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে যেহেতু প্রশাসন বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই সমসায়িক ইসলামী প্রশাসকদেরকে ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অনেক সময় নানাবিধ কারণে শ্রমিকদের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়, ইসলাম মুজরকে এ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লামা সারাখসী (র.) বলেন, "শ্রম সম্পর্কীয় চুক্তি বিশেষ অসুবিধার জন্য বাতিল করা যায়। কারণ শ্রমের বিনিময় মেহনতীদের সুবিধা বিধানের নিমিত্তই প্রচলিত রাখা হয়েছে। তাই যখন মেহনতী জনতা করতে না চায় বা তার পূর্ব মত পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে এর উপর বাধ্য করা তার জন্য কষ্টেরই কারণ হবে।"[৭০]

এমনিভাবে নিয়োগকারীর মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিলে, সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করতে পারে। কিন্তু এসকল ব্যাপারে ইসলামী সরকারের কর্তব্য হলো, সবকিছু ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা এদিকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যেন কোন রকমের বিপর্যয়ের সৃষ্টি না ঘটে। শ্রমিকের যদি চাকরি চলে যায় তখন তারও চাকরির ব্যবস্থাকরণ এবং যতদিন কোন সুবিধা না হচ্ছে ততদিন তার ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

দাবি-দাওয়া পেশের অধিকারঃ

ইসলাম মূলত এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবারই অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং চাইবার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলই উদ্বুদ্ধ থাকে-কোন দাবি পেশের দরকারও যেন না পড়ে।

---

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

এরপরও যদি কারও অধিকার আদায় না হয় তবে তাকে দাবি পেশ করারও অধিকার দিয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন, "যাচঞ্ঝা করা একটি পেষণ যন্ত্র যা দ্বারা মানুষ তার নিজের চেহারাই পিষে ফেলে। কিন্তু কোন মানুষ যদি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে বা যা ছাড়া সে বাঁচতে পারেনা এমন জিনিসের দাবি নিয়ে আসে তবে সেটা তার যাচঞ্ঝা হবে না।"[৭১] অর্থাৎ অধিকার আদায়ের দাবি-এ প্রার্থনা নয় বা কারও কাছে অনুকম্পা সন্ধান করা নয় এবং এ তার বাঁচার অধিকার।

বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানঃ

আজকাল এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হলো শ্রম। কিন্তু শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পুঁজি বলতে কিছুই থাকে না, যা খাটিয়ে সে অন্ন সংস্থানের উপায় করবে। তখন একান্তভাবে অসহায় হয়ে পড়ে সে। যার জন্য সে তার যৌবনের উষ্ণ রক্ত ও সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও রিক্ত। সেই পুঁজিপতি তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

বিরাট সংসারের বোঝা কিন্তু আয়ের উপায় বলতে নেই কিছুই। এই অবস্থায় একজন মানুষ কতটা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে-কতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ধনবাদী অর্থ ব্যবস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির নামে যা কিছু দেওয়া হয়ে থাকে তা এত অপ্রতুল যে, হাস্যকর ঠেকে। তা-ও আবার তার পারিশ্রমিক হতে কেটে নিয়ে দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অবস্থা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে শ্রমই একমাত্র উৎপাদন উপাদান। এ না থাকলে কেউ উৎপাদিত পণ্যে অংশই পেতে পারে না। তাই সেখানকার শ্রমিকরা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়লেও অবসর গ্রহণের নামে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা অত্যন্ত কম পেনশন পায়।"

এর এক বাস্তব সমাধান দেয় ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, নিঃসহায়, ইয়াতিম, বিধবা এবং দুর্বলজনদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার ইসলামী সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য। সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কোষাগার হতে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে এ হলো সাধারণ নাগরিক অধিকার।

নবী করীম (স.) যখন মদীনায় আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তখন এর চরম নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন। নবী করীম (স.) বলেন, "যে সব ব্যক্তি অসহায় পরিজন রেখে গেছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার অর্থাৎ সরকারের উপর।"[৭২]

হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর খিলাফত আমলে এই ব্যাপারে কে কতটুকু মর্যাদার অধিকারী সেদিকেও চাইতেন না, বরং সমভাবে অর্থ বন্টন করে দিতেন। একবার তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বলেছিলেন, "কে কতটুকু ইসলামের খিদমত করেছেন তা আমার জানা আছে। এর বিনিময় আল্লাহ্পাক দেবেন। কিন্তু এ (জাতীয় কোষাগারের সম্পদ) জাগতিক জীবন-নির্বাহের উপায় মাত্র। তাই এখানে কাউকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতার ভিত্তিতে বন্টন করে দেওয়াই অধিকতর শ্রেয়।[৭৩]

---

৭১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতিকরাদ ওয়া আদায়ুদ দুয়ুন, হাদীস নং-২২২৪

৭২. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭৩. ঐ, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত উসমান (রা.) খিয়ারে জেহেন্দী (রা.)-এর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও সন্তানের আধিক্য দেখে তাঁর জন্য এবং ছেলেমেয়েদের জন্য বায়তুল মাল থেকে পৃথক পৃথক ভাতার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।"[৭৪]

এমনকি এর মধ্যে মুসলিম-অমুসলিমের কোন তারতম্য করা হয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে এসকল নাগরিকের সমান অধিকার। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) প্রখ্যাত সালারে আজম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) কে মুসলিম ও অমুসলিম সকল বাসিন্দার অর্থনৈতিক সমতার কথা উল্লেখ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন, "আমি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, জিম্মীদের মধ্যে (ইসলামী রাজ্যে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা) যারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে, বালা-মুসিবতের দরুণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা কোন ধনী দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং তার সমধর্মিগণ তাকে খয়রাত করতে শুরু করে-এই সমস্ত লোকের জিযিয়া মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন সরকার তার এবং তার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে নেবে।"[৭৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শ্রমিককে যে অধিকার প্রদান করেছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা মতবাদই তা প্রদান করেনি। কেবলমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করছে।

শ্রমলব্ধ পন্থাঃ

ইসলাম শ্রমকে পুণ্য এবং অলসতাকে পাপ বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ "বল, তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন....।"[৭৬]

ইসলামে 'শ্রম' শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হিসেবে গণ্য। কায়িক শ্রমের মর্যাদা অত্যুচ্চ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন লৌহবর্ম প্রস্তুতকারক, হযরত আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, হযরত নূহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রী, হযরত ইদরীস (আ.) ছিলেন দর্জি আর হযরত মূসা (আ.) ছিলেন রাখাল।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "হে মানব মন্ডলী! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং হালাল পন্থায় রিয্‌ক উপার্জন কর। কেননা কোন প্রাণীই তার নির্ধারিত রিযম পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না-যদিও (নির্ধারিত রিয্‌ক অর্জনে) কখনো কখনো বিলম্ব হতে দেখা যায়। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং হালালভাবে রিয্‌ক উপার্জন কর এবং যা হালাল তা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা বর্জন কর।"[৭৮]

আনাস (রা.) বলেন, এক আনসারী (সাহাবী) নবী (স.)-এর কাছে এসে কিছু চাইলো। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ঘরে কিছু আছে কি? সে বলল হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে,

---

৭৪. ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজ, করাচী, পৃ. ১১৯

৭৬. আল-কুরআন, ৯:১০৫

৭৭. মুস্তাদরাক হাকিম, (তা.বি.)।

৭৮. ইবনে মাজাহঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ: আল-ইকতিসাদু ফী তুলাবিল মাঈশাহ (প্রাগুক্ত), হাদীস নং-২১৪৪, পৃ. ২৬০৫

Dhaka University Institutional Repository

যার একাংশ আমি গায় দেই এবং অপরাংশ ঘুমের সময় বিছিয়ে নেই। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করে। নবী (স.) বললেন, জিনিস দুটো আমার নিকট নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তাঁর নিকট তা নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ (স.) জিনিস দুটে হাতে নিয়ে বললেন, এ জিনিস দুটো কেউ কিনবে কি? এক ব্যক্তি বলল: আমি এক দিরহাম দিয়ে এগুলো ক্রয় করবো। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এর চেয়ে বেশি দাম কে দিবে? একথাটি তিনি দুবার কিংবা তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বলল: আমি এ দুটো জিনিস দুই দিরহামে কিনবো। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) জিনিস দুটো তাকে দিয়ে দুটি দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং তা আনসার ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন: এক দিরহাম দিয়ে খাদ্যসামগ্রী কিনে তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়ে এসো আর অপর দিরহামটি দিয়ে কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ (স.) সেটি নিয়ে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন: যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এসো আর আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না দেখি। লোকটি কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে থাকে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে জানাল যে, সে দশ দিরহাম সঞ্চয় করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: এর কিছু দিয়ে খাদ্য-সামগ্রী কিনে নাও এবং কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় কিনে নাও। অতঃপর তিনি বললেন: ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে এটি তোমার জন্য উত্তম। (মনে রাখবে) চরম দারিদ্র্য, কঠিন ঋণের বোঝা অথবা রক্তপণ আদায়ের ন্যায় প্রয়োজন ব্যতীত সাহায্যপ্রার্থী হওয়া সমীচীন নয়।[৭৯] কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং সকলের কর্তব্য কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জন:

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে জীবিকা উপার্জনের যত পন্থা বলেছেন কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন তন্মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর মাটিকে ফসল ফলানোর যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন এতে শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকা উপার্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি পৃথিবীর উদ্ভিদের চারা উদগমন করি, অনন্তর তা হতে সবুজ পাতা উদগত করি। পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি।[৮০]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি তাতে সুপরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক বস্তু উদগত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং আর তোমরা যাদের রিয্কদাতা নও তাদের জন্যও।"[৮১]

জমি চাষ করে যেমন জীবিকা উপার্জন করা যায় তদ্রূপ আখিরাতে বিপুল সাওয়াবও অর্জন করা যায়। নবী (স.) বলেন: "যদি কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা জমি চাষ করে, অতঃপর কোন পাখি কিংবা মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু তা থেকে আহার করে, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।"[৮২]

---

৭৯. ইমাম ইবনে মাজাহ: সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ: বাইউল মুযায়াদাহ (প্রাগুক্ত), হাদীস নং-২১৯৮,, ২৬০৮

৮০. আল-কুরআন, ৬: ৯৯

৮১. আল-কুরআন, ১৫: ১৯–২০

৮২. ইমাম মুসলিম: সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল-মুসাকাত ওয়াল মুযারা'আত, অনুচ্ছেদ: ফাদলুল গারাস ওয়ায-যারা (রিয়াদ: দারুস সালাম ১৪২১/২০০০) হাদীস নং-৩৯৬৯, পৃ. ৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প কারখানায় কাজের মাধ্যমে উপার্জন:

শিল্প-কারখানায় কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখেছেন: "কৃষি কাজ ছাড়াও মুসলমানদের অবশ্যই এমন সব শিল্প কারখানা গড়ে তোলতে হবে যা মানব সমাজের জন্য অপরিহার্য একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য সহায়ক এবং একটি দেশর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য একান্তভাবে অনুকূল। ইসলামী শরী'আতে শিল্প-কারখানায় চাকরী করার শুধু অনুমোদন আছে বললে যথেষ্ট হবে না বরং ইসলামের মহান ইমাম ও ফকীহগণ তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামুলক বলে অভিহিত দিয়েছেন। শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা এবং শিল্প-কারখানায় কাজ করাকে তারা ফরযে কিফায়া বলেছেন।"[৮৩]

স্বনির্ভরতা:

ইসলামে স্বনির্ভরতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে নিরুৎসাহিত করে যতক্ষণে সে ব্যক্তি ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজে তৎপর হয়ে না উঠে। আল্লাহ প্রতিটি মানুষের ভেতরে কিছু যোগ্যতা দান করেছেন, তার উক্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটুক এবং এলক্ষ্যে তার তৎপরতা নিয়োজিত থাকুক, ইসলাম তাই কামনা করে। আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য তার জন্মের বহু পূর্বে রুটি-রোযগারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কাজেই চেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "মানুষ তাই পায় যা সে করে।"[৮৪]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ এমন কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজের পরিবর্তন করে..... ।"[৮৫]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।"[৮৬]

নবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে ভিক্ষা থেকে পবিত্র রাখেন এবং যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না।.... ।"[৮৭]

কাজেই রুটি-রুজির জন্য কারো নিকট ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়ার চেয়ে সাধ্যমত তা উপার্জনে সচেষ্ট হওয়া উচিত, কোন অবস্থায়ই অলস জীবন-যাপন করা সমীচীন নয়।

বিদেশে চাকুরীর মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন:

কর্মসংস্থান ও উপার্জনের জন্য বিদেশ গমনকে ইসলাম অনুমোদন করে। আয়-রোযগারের বিষয়টি বিশেষ অঞ্চল ও জনপদের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।... ।"[৮৮]

---

৮৩. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী: The Lawful and Prohibited is Islam (আমেরিকান ট্রাস্ট পাব: ১৯৬০), পৃ. ১৩১
৮৪. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯
৮৫. আল-কুরআন, ১৩:১১
৮৬. আল-কুরআন, ১১:৬
৮৭. ইমাম মুসলিম: সাহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং, ২৪২৪, পৃ. ৮৪৩
৮৮. আল-কুরআন, ৪: ১০০

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে আছে, "প্রতিটি জনপদই আল্লাহর এবং প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা জীবিকা উপার্জনের নিমিত্তে যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পারে।"[৮৯]

অপর এক হাদীসে আছে, "প্রতিটি জনপদই আল্লাহর এবং প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা জীবিকা উপার্জনের নিমিত্তে যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পারো।"[৯০]

যে কোন বৈধ উদ্দেশ্যে পর্যটন, ভ্রমণ, চাকুরী ও উপার্জনের জন্য প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে এর চেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বাণী আর কী থাকতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হাদীসের কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম যুগের অসংখ্য মুসলিম পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেন। তাঁরা সে সকল স্থানে একই সাথে দীন প্রচার, জীবিকা উপার্জন, জ্ঞান অর্জন ও কর্মসংস্থানের কাজ করেন। বর্তমান সময়েও একই প্রেরণায় মুসলিমগণ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি নিজ দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না, জাতীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে বা জনসংখ্যার প্রাচুর্যের কারণে কিংবা বেকারত্বের কারণে, সে অবশ্যই পৃথিবীর যে প্রান্তে ইচ্ছা জীবিকা উপার্জনের লক্ষে ছড়িয়ে পড়বে। তবে প্রবাস জীবনে শ্রমিক কিংবা পেশাজীবীদের যে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণঃ

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাধান্যের অন্তর্নিহিত রহস্য সবচাইতে বেশী লুক্কায়িত আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশী মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি বা যে দেশের অধিবাসীদের আগ্রহ নেই, তারা সব সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এই ব্যবসার পথ ধরেই তাদের তাহযীব-তমুদ্দুন, জীবনোপকরণ, রাজনীতি, এমনকি ধর্মের উপর অন্যান্য জাতি আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাদের দাসে পরিণত করে একনায়মতন্ত্রী শাসন ব্যস্থা কায়েম করেছে এমন নজীর বিরল নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য শব্দের মধ্যে লাভ, উপকার বা মুনাফার এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি বা লোকসানের ঝুঁকি আছে, তবুও লোকসান বা ক্ষতির উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করে না, বরং লাভের সুনিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়েই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। লাভের প্রত্যাশায়ই মানুষ শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা, স্থান ও পণ্য এবং সুনামকে মূলধন বিনিয়োগ করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের আরবী পরিভাষা হলো তিজারাহ, আর কল্যাণ ও লাভ হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য।

আল-কুরআনের অভিমতঃ

মহনাবী (স.) নিজেই একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এ কারণে মদীনা প্রজাতন্ত্রের নতুন পরিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্যর প্রতি তার সহযোগিতা প্রদান ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ প্রজাতন্ত্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি পুরোটাই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মককা

৮৯. হায়সামীঃ মাযমাউয যাওয়াইদ, অধ্যায়ঃ আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আল কাসব .....(প্রাগুক্ত), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৬৩
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা কুরায়শে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ কুরাশের অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি করে দেবার কারণে, তাদের অন্তরে শীত ও গ্রীষ্মকালের সফরের প্রতি তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি করে দেবার কারন তারা যেন এই কাবা ঘরের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদাত করে-যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্নদান করেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেন।[৯১]

সে যুগেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে কলুষিত করার বিভিন্নরূপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সতর্কীকরণ বাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুনীতি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, যারা লোকদের নিকট থেকে যখন মেপে গ্রহণ করে, তখন পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।[৯২]

পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অপর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে একে নিষিদ্ধ না বললেও বিষয়টি স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে এরূপ কিছু বিষয় রয়েছে, যা মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত তথা সালাত আদায় হতে বিরত রাখতে পারে। এ বিষয়ে কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "তারা হচ্ছে সে সকল ব্যক্তি যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে উদাসীন রাখে না এবং যারা সে দিবসকে ভয় করে থাকে, যে দিবসে অন্তর চক্ষুসমূহ বিপর্যস্ত হবে।"[৯৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ধর্মীয় জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এবং এরূপ প্রভাব থেকে নিজেদের ধর্মীয় জীবন রক্ষা করা মুমিনদের কর্তব্য। এর ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর মদীনা জীবনে জুমু'আর নামাযের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে নির্দেশ প্রদাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ, জুমুআর নামাযের জন্য যখন আযান দেয়া হল, তখন তোমরা আন্তরিকতার সাথে প্রস্তুত হয়ে যাবে, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য এবং সে সময় সমস্ত কাজ-কারবার পরিত্যাগ করবে; তোমাদের জন্য এটি খুবই কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝে দেখ। অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর রহমতের (রুজী-রোজগারের) অন্বেষণ করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে বহুলভাবে- সেমতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[৯৪]

এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ (রিয্ক) তালাশ করা তোমাদের জন্য গুনাহের কাজ নয়।"[৯৫] এতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুস্পষ্ট অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, স্বগোত্রীয় লোকগণ, ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য-আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও অগ্রাধিকার পাবার মতো কোন বস্তু নয়।[৯৬]

---

৯১. আল-কুরআন, সূরা-১০৬

৯২. আল-কুরআন, ৮৩: ১–৩

৯৩. আল-কুরআন, ২৪:৩৭

৯৪. আল-কুরআন, ৬২: ৯–১০

৯৫. আল-কুরআন, ২:১৯৮

৯৬. আল-কুরআন, ৯:২৪

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) এর মদীনা জীবনের শেষ পর্যায়েই আর্থিক লেন-দেনের চুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।[৯৭]

হাদীস শরীফের বক্তব্য:

সামগ্রিকভাবে হাদীস শরীফে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ ও হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধু পন্থা, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যকে লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং একে পশুপালন ও হস্তশিল্প অপেক্ষা অধিক আয়ের কাজ বলে উল্লেখিত হয়েছে। বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন সৎ ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে পুনরুত্থিত হবে।[৯৮] এরূপ ব্যবসায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, পক্ষান্তরে অসাধু ও অসৎ ব্যবসায়ীর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে এবং তাদেরকে পাপী ও গোনাহগার বলে রাসূলুল্লাহ (স.) উল্লেখ করেছেন। হাদীসে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, বৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা মুনাফা অর্জন করে কেউ তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করলে আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। হযরত আলী (রা.) হালাল 'রিযক' উপার্জনকে একটি জিহাদ এবং উক্ত উপার্জন দ্বারা তার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করাকে সাদাকা বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশংসনীয় দিক হলো যে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি উদারচেতা এবং ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধানে যত্নবান হবেন এবং ওজনে ও মাপে কম দিবেন না, বরং ক্রেতাকে কিছু বেশী দিবেন।[৯৯] পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং প্রতারণা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ তাতে ব্যবসায়ের আয় কমে যায়। বিক্রয়কৃত পণ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে ক্রেতাকে এ সম্পর্কে অবগত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কেউ এরূপ পণ্য ক্রেতাকে অবহিত না করে বিক্রি করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন এবং ফিরিশতাগণ তার প্রতি তিরষ্কার করতে থাকেন।[১০০] রাসূলুল্লাহ (স.) বিক্রয়ের পণ্য দ্রব্যে, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণকে কঠোর নিন্দা করেছেন।

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি:

যে কোন অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যবসা-বাণিজ্য। অর্থ ব্যবস্থার ধরণ ভেদে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত। এ কারণে ইসলামের বাণিজ্যনীতি ও ইসলামের মৌল নীতিমালার আলোকেই স্থিরিকৃত। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক কায়কারবারের বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিম্নলিখিত চারটি প্রধান নীতির উপর নির্ভর করে:

(১) পারস্পরিক সহযোগিতা (২) পারস্পরিক সম্মতি (৩) চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা (৪) ন্যায়সঙ্গতা কারবার।[১০১]

---

৯৭. আল-কুরআন, সূরা- ২:২৮২

৯৮. ইবন মাজাহ, আত্ তিজারাত, পরিচ্ছেদ-১

৯৯. প্রাগুক্ত।

১০০. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ-৪৫

১০১. মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত: ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, (মূল: মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম), ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-১৯৯৮, পৃ. ২০৪–২০৫

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সহযোগিতাঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ব্যবসায়িক ব্যাপারে কারবারের উভয়পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের মধ্যে একজনের অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা অপরজনের বেশি থেকে বেশি লোকসানের উপর হবে, কখনো এরূপ হতে পারে না। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের মধ্যে অসম লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে ব্যবসা গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হতে পারে না। এ বিষয়ে আল-কুরআনের বলা হয়েছে। "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্গনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[১০২]

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কুর'আনী মূলনীতি বর্ণনা করে মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র.) বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতে কুরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পাস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্য তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়, মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনী শ্রেষ্ঠতর ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহ নির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষীতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্য বিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তির আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন

১০২. আল-কুরআন, সূরা-৫:২

Dhaka University Institutional Repository

কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি যা নিজের উপর চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ করণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে-যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্যদল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।[১০৩]

অবৈধ পন্থায় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করা ও মুনাফা অর্জন করা ইসলামী নীতি পরিপন্থী। এ কারণে এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ইসলামী শরী'আহ অনুমোদন করে না। যেমন সকল প্রকার জুয়া ও লটারী। এসবের মাধ্যমে একপক্ষের নির্ঘাত লোকসানের মাধ্যমে অন্যপক্ষের মুনাফা অর্জিত হয়। একপক্ষের লাভ এবং অন্যপক্ষের অনিশ্চত লোকসানের উপরই এসবের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এ ধরনের ব্যবসায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা নিষিদ্ধ। এসব নীতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হলে ইসলামে তা অসিদ্ধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ধরনের পন্থা অবলম্বন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যকে অসিদ্ধ ও বাতিল করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশ হলো, "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলেদিন, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে। মহাপাপ।"[১০৪] "নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।[১০৫]

পারস্পরিক সম্মতি:

কোন কারবারে উভয়পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অবশ্যই থাকতে হবে। জবরদস্তি সম্মতির কোন মূল্য নেই। তাই পক্ষদ্বয়ের মধ্য থেকে কোন পক্ষের প্রতি বল প্রয়োগ কোনভাবেই সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ একপক্ষের আন্তরিকভাবে কারবার করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে সে বাধ্য হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্মতি গ্রহণযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরকে সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।"[১০৬]

---

১০৩. মুফতী মুহাম্মদ সফী (র.) তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, (অনুঃ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোরআনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৩০৫)

১০৪. আল-কুরআন, ২:২১৯

১০৫. আল-কুরআন, ৫:৯০

১০৬. আল-কুরআন, ৪:২৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্মতি প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ উপরিউক্ত আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতদ্‌সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:[১০৭]

(ক) নিজের সম্পদ অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয়ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ তোমরা একে-অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা" আয়তের মধ্যে "আমওয়াকালুকুম বাঈনাকুম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে"-এর দ্বারা তাফসীরকারকগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবু হাইয়্যান 'তাফসীরে-বাহরে মুহীত'-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদ ও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে 'লাতাকুলু' বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খোয়া না'। পরিভাষায় বিচারে 'খোয়া না' বলতে যে কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়। বাতিল শব্দটির অর্থ করা হযেছে 'অন্যায় পন্থায়'। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না জায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমনঃ চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) বাতেল পন্থায় খাওয়াঃ

কুরআন পাক একটি মাত্র শব্দ দিল বাতিলী বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেনের ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গ স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (স.) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুরআনে উল্লেখিত 'বাতেল' শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লেখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কুরআনেরই নির্দেশ।

(গ) সৎ রোজগারের শর্তবালীঃ

হযরত মু'আয-ইব্‌ন জাবার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধারা থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না।

---

১০৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩–২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত:

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

সম্পদ বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের যেসব ব্যাপার উভয়পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যায়নি, বিপাকে পড়ে এবং জবরদস্তি সম্মতিকেই স্বতঃস্ফূর্ত বলে ধরে নেয়া হয়েছে; যেমন সুদের কারবার কিংবা কোন শ্রমিকের শ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক কম দেয়া। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনা (বৈধ ব্যবসায়) হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[১০৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) বিপাকে পড়ে বাধ্য হয়ে বেচাকেনা (লেনদেন) করতে নিষেধ করেছেন।[১০৯]

সুতরাং বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, চাপসৃষ্টি করে বা জবরদস্তি করে লেনদেন করতে বাধ্য করা এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন করা যাবে না। এ বিষয়ে মাওলানা হিফজুর রহমান শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর একটি মন্তব্য উদ্বৃত করেছেন। যাতে তিনি (শাহ ওয়ালী উল্লাহ) বাধ্যতামূলক সম্মতিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করেন নি। তিনি বলেছেন, কারণ গরীব লোকেরা বিপাকে পড়ে যে বিষয় পূরণ করতে পারবে না, অথচ তার দায়-দায়িত্ব নিতেও বাধ্য হয়। আর এটা কখনো স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা আন্তরিক সম্মতি নয়। সুতরাং সুদের মত লেনদেনে অপছন্দনীয়। এটা কল্যাণকর ও সুষ্ঠু কারবার হিসাবে গণ্য করা যায় না। নিঃসন্দেহে এই লেনদেন বাতিল ও অন্যায়।[১১০]

উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে বিবাদের আশংকা থাকে আর তা যে কোন পক্ষের জন্য ক্ষতিকর কারণ হতে পারে। এ ধরনের চুক্তি (সম্মতি) ব্যবসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। যেমন পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টাই অস্পষ্ট রাখা। কি দামে কেনা হল কিংবা কি বস্তু কেনা হল স্পস্ট করে বলা হল না। অথবা একটা লেনদেনকে দুটোয় পরিণত করা হল। যেমন বলা হলা নগদ মূল্যে অমুক জিনিসটির দাম একশ টাকা, আর বাকিতে কিনলে দুইশত টাকা। অথবা যেসব বেচাকেনায় পণ্য দেখা প্রয়োজন কিন্তু না দেখেই ক্রয় করা হল। বেচাকেনায় এরূপ শর্ত আরোপ করা হল যা উক্ত কারবারের অংশ কিংবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়-অজ্ঞাত বেচাকেনা করা হল। অর্থাৎ বেচাকেনার সময় কথাবার্তা ছাড়া পণ্য কিংবা মূল্য কোনটাই ছিল না। এসবও এ জাতীয় অপরাপর লেনদেনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কলহ বিবাদেরই বুনিয়াদ রচিত হয়।[১১১]

---

১০৮. আল-কুরআন, ২:২৭৫

১০৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আস্‌সিজিস্তানী, সুনানু আবু দাউদ, বৈরুত: দারুল ফিক্‌হ ১৯৯৪, খ. ২ পৃ. ৩৬

১১০. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, ২০৬

১১১. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৬–২০৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) একটি বেচাকেনার লেনদেনেক দুটোতে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন।[১১২]

বেচাকেনার সময় যে পণ্য আমার নিকট নেই তা বেঁচতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন।[১১৩] সুতরাং জানা গেল, ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্মতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা:

কারবার সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারীর মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচার-বুদ্ধি হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন হতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক না হলে কারবারে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে এ বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "যদি তাদের মধ্যে বিবেচনা উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার।"[১১৪]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বুদ্ধি বিবেচনার সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর।[১১৫]

তাই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া অত্যাধিক জরুরী। কেননা ইহা ছাড়া ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা এবং ব্যবসার কৌশল নির্ধারণ করা, মুনাফা অর্জন করা ব্যবসাকার্যে সফলতা অর্জন করা যায় না। আবার অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসাকার্যে সফলতা অর্জন করতে পারে না। আবার অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায় লোকসান দিয়ে থাকে। বিচার-বুদ্ধি এ গুণটি সকল মানুষের মধ্যে একই রকম হয় না। যেমন আল কুরআনে উল্লেখিত হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর দেয়া একটি ফয়সালা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।"[১১৬]

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবুঝ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল, অসহায় ও দাস হতে পারবে না। কেননা এ সকল ব্যক্তি বুদ্ধিজ্ঞানের অভাবে ভাল-মন্দ বুঝে না এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তিন ব্যক্তির উপর শরীআতের নির্দেশ আরোপিত হবে না। পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক।"[১১৭] অতএব, জানা গেল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

---

১১২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, জামি'উত তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, বাবু মা জায়া ফিত-তুজ্জুরি ওয়া তাসমিয়াতিন নাবী ইয়াহুম, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, ১৯৯৫, ঈ/১৪১৫ হিজরী, হাদীস নং-১২৩৪

১১৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামে' আত-তিরমিযী, দেওবন্দ; মোখতার এন্ড কোম্পানি, (তা.বি), হাদীস নং-১১৫৩

১১৪. আল-কুরআন, ৪:৬

১১৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

১১৬. আল-কুরআন, ২১:৭৯

১১৭. সুনানু আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০২, পৃ. ৩৪৫–৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়সঙ্গত কারবার:

ব্যবসা-বাণিজ্যের অপর নাম কারবার। কারবার হচ্ছে মুনাফা উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি সংগ্রহকরণ, উৎপাদন, মজুতকরণ, বীমাকরণ ও ক্রেতা বা ভোক্তাদের ভিতর বণ্টন এবং এ প্রকার সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়তাকারী কার্যকলাপ।[১১৮]

কারবার ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। নিষিদ্ধ কারবার করা যাবে না। নিষিদ্ধ কারবার করা যাবে না বক্তব্য দ্বারা দুটি বিষয়ক বুঝানো হয়েছে।

(ক) কারবারের পদ্ধতি;

(খ) কারবারের পণ্য সামগ্রি।

(ক) কারবারের পদ্ধতি:

কারবারে কোন প্রকার প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, আত্মসাৎ, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, ক্ষতি ও পাপাচার থাকতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন কোন লেনদেন করা যাবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একাধিক সর্তকবাণী রয়েছে। তিনি বলেন, " যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১১৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন পাথরের টুকরা মিশিয়ে কোন বস্তু বেচাকেনা করা।[১২০]

গাইট বেঁধে কারবার করা, কোন বস্তু শুধু ছুঁয়ে দেখা অথবা ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার উপর ছেড়ে দিয়ে বেচাকেনা করাকেও রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন।[১২১]

যেসব লেনদেনে ধোঁকা ও প্রতারণা নিহিত রয়েছে। যেমন একটি জিনিস কেনা কিংবা বেচা পছন্দ হল; কিন্তু বিশেষ কারণে লেনদেনের সময় তা উল্লেখ করা হল না। অন্য একটা পণ্যের ভিতরে করে পছন্দকৃত পণ্যটি নিয়ে যাওয়া হল। এভাবে সবচাইতে খারাপটি সবচাইতে উত্তম বস্তুটির অন্তর্ভুক্ত করে বেচাকেনা সম্পন্ন করা হল। নতুবা লেনদেনের সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পর লেনদেন করতে অস্বীকার করা হল। এহেন লেনদেন প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।[১২২]

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেয়া কিংবা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১২৩] এ বিষয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা, "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। যখন তাদের জন্য মেপে দেয় তখন কম করে দেয়।"[১২৪] এভাবে আল-কুরআনে কম দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

১১৮. অধ্যাপক লতিফুর রহমান, কারবার সংগঠন, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৭, খন্ড-১, পৃ. ৫

১১৯. আবুল হুসাইন ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, আস-সহীহ, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৫৬ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭০

১২০. প্রাগুক্ত

১২১. আবু আব্দুল্লাহ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী (সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ৪, পৃ. ২৮৭

১২২. মাওলানা আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১২৩. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-২০০৬, খ. ৪, পৃ. ৫১৯

১২৪. আল-কুরআন, ৮৩ : ১ – ৩

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে পণ্য বিক্রি করা যাবে না মিথ্যা শপথ করেও পণ্য বিক্রি করা যাবে না। কেননা এতে একপক্ষ লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ ঐ সকল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (রাগের কারণে) তাকাবেন না এবং তাদের পাপ ক্ষমা করবেন না, যারা তাদের ব্যবসায়ী দ্রব্য সামগ্রী বেশী মূল্যে বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করে বলে যে, তাদের দ্রব্য সামগ্রী খুবই উন্নতমানের।[১২৫] ব্যবসায়িক লেনদেনে অনেক সময় অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ এবং পাপাচারে অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! খিয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতের জেনে শুনে।"[১২৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি-(১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে (৩) যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে।[১২৭]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের প্রায় খুৎবাতে বলতেন, যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই।[১২৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, উত্তম উপার্জন হচ্ছে 'বায়া মাবরুর' বা কল্যাণকর বেচাকেনা এবং হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবনোপকরণের সংস্থান করা। আর মাবরুর বেচাকেনা হল যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ নিহিত থাকবে। অর্থাৎ তাতে প্রতারণা, আত্মসাৎ ও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি থাকবে না।[১২৯]

(খ) কারবারে পণ্য সামগ্রীঃ

এরূপ পণ্য সামগ্রীর কারবার করা যা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ অথবা এমন বস্তু বেচাকেনা করা যা মূলগত অপবিত্র। যেমনঃ শরাব, মৃতদেহ, প্রতিমা, শূকর প্রভৃতি এরূপ সামগ্রীর কারবার ইসলামে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের উপর মৃতদেহ, রক্ত এবং শূকরের মাংস হারাম করা হয়েছে।"[১৩০]

হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা শরাব, মৃতদেহ, শূকর ও মূর্তি বেচাকেনা হারাম করেছেন।"[১৩১]

সুতরাং, হারাম জিনিসের কারবার করা যাবে না এটাই ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্যের চূড়ান্ত কথা।

---

১২৫. আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াজীদ, সুনানু ইব্ন মাজাহ, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩, (১ম সংস্করণ) হাদীস নং-২২০৭, পৃ. ৫১৩

১২৬. আল-কুরআন, ৮:২৭

১২৭. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১২৮. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, মদীনা মোনাওয়ারঃ আল-মাকাতাবা আল-শামেলা, বাবু মুসনাদু আনাস ইব্ন মালিক, হাদীস নং-১১৯৩৫

১৩০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫২৭৬

১৩১. আল-কুরআন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়-বিক্রয়ের বাতিল পদ্ধতি:

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেচা-কেনার পদ্ধতি বাতিল হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন: পণ্যের একাংশ নগদ মূল্যে এবং অপরাংশ বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা, বায়না করে পণ্য ক্রয় করা, নীলামে ক্রয়-বিক্রয়, পানিতে মাছ রেখে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়, বৃক্ষে ফল তার পরিপূর্ণ অবয়ব ধারণের পূর্বেই মুকুল অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়, শূণ্যে উড্ডীন পাখি বিক্রয়, পশুর ওলানের দুধ অগ্রীম বিক্রয়, চুক্তি সম্পাদন করা, বাজার দরের চয়ে চড়া দামে বিক্রয়, প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ, ওজনে কম দেয়া, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু ও দ্রব্যের ব্যবসা করা ইত্যাদি।

ফকীহদের মতামত:

ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলীতে বিক্রেতাকে ক্রেতার সাথে সম্মানজনক ও ন্যায্য বিচারমূলক আচরণ করত উপদেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যেস যেন গ্রাহকের সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ কর এবং প্রতারণামূলক আচরণ না কর। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় হাদীসে সেরূপ বিধানও দেয়া হয়েছে। ইমাম আল-গাযালী (র.) তাঁর বিখ্যাত ইহ্য়া উলূমিদ্-দীন গ্রন্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী মূলনীতিসমূহের বর্ণনায় অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে রয়েছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের কথা স্মরণ রেখে জীবিকা উপার্জন করা। তাঁর মতে 'রিযিক' উপার্জন করা পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের একটি উপায় বটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের অন্যান্য উপায় অপেক্ষা অধিক উত্তম উপায় বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ব্যক্তি হয় প্রয়োজনীয় জীবিকা তথা সুখের সন্ধান করে, আর না হয় এর দ্বারা যে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করে।

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র.) ব্যবসা-বাণিজ্যে অতি সাধারণ সৌজন্য ও উদারতা প্রদর্শনের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতার উচিত পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও উদারতা প্রদর্শন করা। তাঁর মতে বণিকের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার তার কাছে অনেকটাই যুদ্ধক্ষেত্রের অনুরূপ। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার সমব্যবসায়ীদের সাথে কারবার করার ফলে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। তাই বলে তিনি দুনিয়ার কাজকর্মে নিস্পৃহ হতেও বারণ করেছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত অভিমত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেনদেন, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রস্তাবনা, মূল্য নির্ধারণ ও উভয়পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি প্রদান। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, বিক্রেতার দ্রব্য-সমাগ্রী, বস্তু, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ স্বেচ্ছায়সম্মতিতে ক্রেতাকে প্রদান করা এবং ক্রেতার তা স্বেচ্ছায় নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তকে অপরিহার্য বলে অভিমত প্রদান করে: (১) ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব ও সম্মতি প্রদান; (২) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সুস্পষ্ট চুক্তি এবং (৩) মূল্য নির্ধারণ ও ক্রেতা-বিক্রেতার অথবা তাদের প্রতিনিধির স্বেচ্ছাকৃত আদান-প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে কতিপয় ব্যবস্থা ও ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এগুলোর মধ্যে বাই মুশারাকা, বাই মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল (বাকী বিক্রয়), বাই সালাম (অগ্রীম ক্রয়) বাই মুদারাবা ইত্যাদি প্রধান পদ্ধতি।

যেসব কর্মকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাতিল করে দেয়ঃ

(১) সম্পদ বাড়ানো এবং মুনাফা অর্জনের জন্য এরূপ লেনদেন করা, যাতে একজনের নির্ঘাত লোকসানের মাধ্যমে অপরের মুনাফা অর্জিত হয়। যেমনঃ জুয়া ও লটারি। কুরআন মাজীদে জুয়া, লাটারি সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই সুদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"[১৩২]

(২) মুনাফা অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধির যে সব ব্যবসা উভয়পক্ষের কোন এক পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যায়নি। বরং জবরদস্তিমূলক সম্মতিকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির স্থলাভিষিক্ত ধরে নেয়া হয়েছে। যেমনঃ সুদের ব্যবসা বা শ্রমিককে তার শ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক প্রদান করা।[১৩৩] এরূপ করা হারাম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

আল্লাহতা'আলা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন।[১৩৪] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) নিরূপায় ব্যক্তি থেকে কোন বস্তু খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।[১৩৫] অর্থাৎ তার অনন্যোপায় অবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা গ্রহণ করা জায়িয নেই। শাহ্ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) জবরদস্তি সম্মতিকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৩৬]

(৩) এমন ব্যবসা করা যা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ অথবা এমন বস্তু ক্রয় করা যা মূলগত দিক থেকে পবিত্র। যেমনঃ শরাব, মৃত বস্তু, প্রতিমা, শূকর ইত্যাদির ব্যবসা। কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর মাংস।[১৩৭] এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি শুনেছেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মদ ও মাদকদ্রব্য, মৃত শুকর ও প্রতিমার বেচাকেনাকে হারাম করে দিয়েছেন।[১৩৮]

(৪) উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে কলহ-বিবাদের আশংকা থাকে এবং যেসব লেনদেনে কোন একপক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেসব লেনদেন জায়িয নয়। যেমন পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টি অস্পষ্ট রাখা। অথবা একটি লেনদেনকে দুটো লেনদেনে পরিণত করা। যেমন বলা হল, যদি এটি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় তবে এর মূল্য একশত টাকা আর বাকীতে কিনলে দুইশত টাকা। অথবা বেচাকেনার মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা যা উক্ত লেনদেনের অংশ বা রুকন নয়। এসব লেনদেনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কলহ-বিবাদের দৃষ্টি হয়ে থাকে।

---

১৩২. আল-কুরআন, ৫:৯০
১৩৩. মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম, পৃ. ২৪৫
১৩৪. আল-কুরআন, ২:২৭৫
১৩৫. আবু দাউদ, সূত্র-মিশকাত, পৃ. ২৪৮
১৩৬. হুজ্জাতুল্লাইল বালিগা, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৩
১৩৭. আল-কুরআন, ৫:৩
১৩৮. হুজ্জাতুল্লাইল বালিগা, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (স.) এক বেচাকেনাকে দুই বেচাকেনায় রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন।"[১৩৯]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বেচাকেনার সাথে (বাইয়ের) শর্ত আরোপ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪০] হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে পণ্য আমার নিকট নেই তা বেচাকেনা করতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন।[১৪১]

(৫) যেসব লেনদেনে ধোঁকা ও প্রতারণা নিহিত আছে, এ জাতীয় প্রতারণামূলক লেনদেন করতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন। যেমন পাথরের টুকরা মিশিয়ে কোন বস্তু বেচাকেনা করা ইত্যাদি।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) পাথর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা করতে এবং প্রতারণামূলক লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[১৪২]

অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) কোন বস্তু ছুঁয়ে অথবা ছুড়ে দিয়ে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৩] হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (স.) লেনদেনে জালিয়াতি ও ফটকাবাজারী করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৪]

এসব লেনদেনের মধ্যে যেহেতু জুয়া অথবা ক্রেতা বা বিক্রেতার যে কোন একজনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্য এ জাতীয় লেনদেনকে ইসলাম বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।

হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) (শহারবাসী লোকদের) শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাত করে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৫]

এ জাতীয় বেচাকেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের লোকদের থেকে চড়া মূল্য আদায় করা বা গ্রামের কৃষকদের থেকে সস্তা দামে খাদ্যশস্য খরিদ করা। লক্ষ্য হলো, অধিক মুনাফাখোরী। এ কারণে ইসলামে এ জাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ।

ধার-কর্জঃ

ধার-কর্জ করেও অর্থের মালিক হওয়া যায় এবং এটি মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য ব্যাপার। মহানবী (স.)-ই প্রথম বিনা সুদে ঋণ বা কর্জ দেয়ার রীতি চালু করেন। এ ধার-কর্জকে কুরআনের পরিভাষায় কর্যে[১৪৬] হাসানা বলা হয়েছে। সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের এটি

---

১৩৯. মিশকাত, পৃ. ২৪৮

১৪০. প্রাগুক্ত

১৪১. প্রাগুক্ত

১৪২. প্রাগুক্ত

১৪৩. প্রাগুক্ত

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

১৪৬. কর্জ কুরআনের একটি পরিভাষা, কুরআনে এ পরিভাষাটি ৬ বার এসেছে। কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৪৫, সূরা আল মায়িদার ১২, সূরা আল-হাদীসের ১১, ১৭, ১৮ এবং সূরা আল মুযযাম্মিলের ২০নং আয়াতে কর্জ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে একটি বলিষ্ঠ ও প্রত্যয় দৃঢ় পদক্ষেপ। কর্জ হয় কেবল মালে ফানি বা ফানজিবল পণ্য[১৪৭] (Fungible Goods) এর বেলায়। কোন ফানজিবল পণ্য কাউকে ব্যবহার করতে দিয়ে অর্থাৎ কর্জ দিয়ে তার জন্য আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া হলে সেই অতিরিক্তকে বলা হয় সুদ। অনুরূপ পণ্য সমপরিমাণ ফেরত দিতে হয়।

ইসলামের একটি সমাজকল্যাণ নীতি হল করযে হাসানা। এর অর্থ সুদমুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্থ মানুষকে প্রয়োজনের মুহুর্তে বিনা সুদ ও শর্তসাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করযে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সাহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে ঋণ দানের চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করেছে। এ বিষয়কে উপেক্ষা না করে পবিত্র কুরআনে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য করয দেয়া নেয়ার একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। সুদমুক্ত হওয়া ও যখন সক্ষম তখন পরিশোধ করার শর্তে করজ দেয়া নেয়া বৈধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরূপ করযকে সুন্দর করয বা করযে হাসানা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারন অভাবগ্রস্ত ভাই- বোনদের সাহায্য করার একটি অকৃত্রিম ও আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে এর উৎপত্তি। আর এটা প্রতিবেশীদের দুঃখ-দূর্দশার সুযোগ নিয়ে দর কষাকষি করার প্রবণতা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই সুন্দর করযকে আল্লাহকে করয দেয়া বলা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আয়াত হল-"সে কে, যে আমাকে সুন্দর করয (করযে হাসানা) দেবে, যা আল্লাহ দ্বিগুণ ও বহুগুণ করে তার হিসাব জমা দেবেন? আল্লাহ অভাব কিংবা প্রাচুর্য দান করেন এবং আল্লাহর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"[১৪৮]

এভাবে ইসলামী সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করলেও বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ বলে মনে করা হয়। স্বচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসূলের (স.) ইন্তিকালের বড়জোড় এক বছর পূর্বেকার। তাই নবী যুগে এর জন্য কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।[১৪৯] রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে ধনাঢ্য সাহাবীরা বিত্তহীন সাহাবীদেরকে ঋণ হিসেবে সুদবিহীন করযে হাসানা প্রদান করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) একবার চল্লিশ হাজারের একটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।"[১৫০] ইমাম বুখারীর মতে, ২০,০০০ দিরহাম ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৫১]

---

১৪৭. মালে ফানি বা ফানজিবল গুডস (Fungible goods) বলতে এমন পণ্যকে বলা হয় যা নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকারিতা (Benifit) লাভ করা সম্ভব নয়। যেমনঃ টাকা, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি। এসব পণ্য ব্যবহার করে তা থেকে কোন উপকার নেয়া হলে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি নিঃশেষ বা রূপান্তর হয়ে যায়। এর অস্তিত্ব বহাল থাকে না। ফানজাবিল গুডসের বৈশিষ্ট্য ৩টি যেমন-১. একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ বা রূপান্তর হয়ে যাওয়া, ২. এসব পণ্যের সেবা প্রবাহ (Flow of Service) নেই, ৩. পণ্যের সেবা ও সার্ভিসকে পণ্য থেকে পৃথক করতে না পারা।

১৪৮. আল-কুরআন, ২:২৪৫

১৪৯. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামর অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- ২০০৫, পৃ. ১৩৮

১৫০. নাসাঈ শরীফ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু দ্রষ্টব্য।

১৫১. M.A. Sabjwari, Economic and Fis. During the life Mohammad (Sm.), The journal of Islamic Banking and October-December, 1984, P. 22

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী ব্যয়খাতেও করযে হাসানার জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য খলিফার যুগে এ ধরণের অসংখ্য নজীর পাওয়া যায় যে, লোকজন নিজেদের বেতনের জামানতে সরকারী বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করত। ইসলামই প্রথম বিশ্বের নিয়মিত করযে হাসানা সমিতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।[১৫২] প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন সময়ে একজন স্বচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব সে যখন অন্য একজন স্বচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু নানা কারনে যখন ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন করযে হাসানা ব্যবস্থা থাকার দরুন এসব অভাবগ্রস্তদের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোন কারণই রইল না। খুব সম্ভব বিশ্বের বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান হতে পারে যে, স্বয়ং রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বয়ং খলিফাও বায়তুলমাল হতে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকতেন। খলিফা উমর (রা.) নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ঋণ চাইতেন।[১৫৩] হযরত উমর (রা.) যখন শাহাদাতবরণ করনে তখন তাঁর কাছে বায়তুল মালের আশি হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। অত:পর তাঁর পুত্ররা ঐ ঋণ পরিশোধ করেন।[১৫৪] হযরত উমর (রা.) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঐ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৫৫]

বায়তুল মাল থেকে সাধারণ ঋণ ছাড়া উৎপাদনশীল ঋণ দানেরও ব্যবস্থা ছিল। এমনকি মহিলারাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বায়তুলমাল থেকে করযে হাসানা গ্রহণ করত। হিনদা বিনতে উতবা হযরত উমর (রা.) এর কাছে এসে ব্যবসা করার জন্য বায়তুল মাল থেকে চার হাজার দিরহাম ঋণ প্রার্থনা করেন এবং এর জামানতও দেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে ঋণ দান করেন। অতঃপর তিনি (হিন্দা) বনু কিলাবের শহর গুলোতে গমণ করে পণ্য দ্রব্য বেচাকেনা করেছিলেন।[১৫৬]

বসরার গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ব্যবসা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং উবাইদুল্লাহ বিন উমরকে বায়তুল মালের বিরাট অংকের অর্থ করযে হাসানা হিসেবে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইরাক থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে মদীনার বাজারে বিক্রি করেন। অতঃপর বায়তুল মালের সম্পূর্ণ অর্থ এবং এই সাথে অর্ধক মুনাফাও মদীনার কেন্দ্রিয় বায়তুল মালে জমা দেন। কৃষকরাও ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।[১৫৭]

---

১৫২. এটা হিজরী ২০ সালের ঘটনা।

১৫৩. তাবাকাত ইবন সা'দ ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৮

১৫৪. এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায়, বায়তুলমাল খলিফা এবং তাঁর প্রতিনিধিদের হিফাজতে থাকলেও বায়তুলমালের অর্থের উপর ব্যক্তিগতভাবে খলিফার অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়তুলমালের আমীন (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের সম্পত্তি আমানত হিসেবেই থাকত। (শরহে মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫০)

১৫৫. তারিখে তাবারী, পৃ. ২৭৬৬

১৫৬. ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৬৪

১৫৭. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য খলিফার আমলেও বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা দান করা হত। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা মঞ্জুর করা হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কৃষি উৎপাদনের জন্য ইরাকের কৃষকদের বিশ লক্ষ দিরহাম করযে হাসানা হিসেবে দান করেছিলেন।[১৫৮]

তাই দেখা যায়, বিনা সুদে ঋণ দান প্রথম দিকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে বিনা সুদে ঋণ দান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হত। সরকারী কর্মচারীগণ তাদের চাকুরীর আমানতে বায়তুলমাল হতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারত। মূলত: ঋণদা সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। সুদমুক্ত ঋণের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। করযে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রকে আরও দরিদ্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখা যায়। অতীতে এর খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেলেও এর আবেদন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

দান দক্ষিণা:

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বিবিধ ধরনের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের একদল সচ্ছল এবং অপর দল অসচ্ছল। সচ্ছলের প্রতি অসচ্ছল জনগোষ্ঠী মুখাপেক্ষী। অন্যভাবে বলা যায়, সচ্ছলদের সম্পদে অসচ্ছলদের রয়েছে স্বীকৃত অধিকার। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার।"[১৫৯]

দান-দক্ষিণা লাভের মাধ্যমেও সম্পদের মালিক হওয়া যায়। ইসলাম একদিকে মানুষের নিকট হাতপাতাকে অপছন্দ করে, অপরদিকে সচ্ছল ব্যক্তিকে দান-দক্ষিণা করতে উৎসাহিত করে এবং পাশাপাশি কৃপণতাকে নিন্দা করে। সচ্ছল ব্যক্তির চাহিদা পূরণেরর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে দান-দক্ষিণা করবে। কুরআন মাজীদে আছে: "লোকে কী ব্যয় করবে সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য ....।[১৬০]

অপর এক আয়াতে আছে: লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত.........।[১৬১]

হাদীসে আছে: "হে বনী আদম! যদি তুমি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ দান কর তবে উত্তম কাজ করলে আর যদি তা (নিজের নিকট) জমা করে রাখ, তবে নিজের ক্ষতি সাধন করলে। কিন্তু তোমার প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু জমা রাখলে সেজন্য তুমি নিন্দিত হবে না।"[১৬২]

---

১৫৮. আল-কুরআন, ৫১:১৯

১৫৯. আল-কুরআন, ২:২১৫

১৬০. আল-কুরআন, ২:১১৯

১৬১. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৮৮, পৃ. ৮৪১

১৬২. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬১, পৃ. ১৮৪৯

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) বলেন, "দাতা আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে অথচ জাহান্নাম থেকে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকেও দূরে অথচ জাহান্নামের কাছে। নিশ্চয় মূর্খ দাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।"[১৬৩] অপর এক হাদীসে আছে, "দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ সদৃশ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন তার একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না যে পর্যন্ত না তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। আর কৃপণতা হচ্ছে জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন তার একটি শাখা ধরেছে। শাখা তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়।"[১৬৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) দান-সাদাকাহ্ করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি (স.) তাঁর মালিকানায় কিছু এলে তা দান না করে স্বস্তি পেতেন না।[১৬৫] কেহ তাঁর কাছে কিছু চাইলে এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাঁর কাছে থাকলে তিনি (স.) তাকে কম হোক বেশী হোক দান করতেন।[১৬৬] দান করলে দরিদ্র হয়ে যাবেন এমন আশঙ্কা তিনি (স.) কখনও করতেন না। আবার তিনি (স.) যাকে দান করতেন তাকে এত অধিক দান করতেন যে তারপর আর দারিদ্র্যের আশঙ্কা থাকত না।[১৬৭] দান-সাদাকাহ্ করাই ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। কাউকে কিছু দিতে পারলে তিনি দানগ্রহীতার চেয়ে বেশী খুশী হতেন। তাঁর দানের হাত ছিল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় বহমান।[১৬৮] তিনি (স.) কখনও কাউকে কোন কিছু হিবা করে দিতেন, কখনও সাদাকাহ্ করতেন, কোন কোন সময় হাদিয়া দিতেন আবার কোন সময় কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করে বিক্রেতাকে মুল্য এবং পণ্য দুটোই ফেরৎ দিতেন। আবার তিনি (স.) কারো কাছ থেকে কোন কিছু ধার করতেন এবং ধারকৃত বস্তুর চেয়ে উত্তম ও বেশী পরিমাণে ফিরিয়ে দিতেন। তিনি (স.) কারো কাছ থেকে কোন কিছু ধার করতেন এবং ধারকৃত বস্তুর চেয়ে উত্তম ও বেশী পরিমাণে ফিরিয়ে দিতেন। এছাড়া তিনি কোন বস্তু কিনলে তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে দিতেন। তিনি (স.) কারো হাদিয়া কবুল করল তাকে কয়েকগুণ বেশী হাদিয়া দিতেন। এভাবেই তিনি (স.) সর্বোচ্চ দান-সাদাকাহ্ করতেন।

সাদাকাহ্‌র দ্বারা একদিকে যেমন আত্মার পরিচর্যা ও পবিত্রতা সূচিত হয়, অন্যদিকে তা ধন-সম্পদও পবিত্র করে। একবার কিছুসংখ্যক লোক নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করত তাওবা করার জন্য উদগ্রীব হলে তাদেরকে পবিত্রকরণের নিমিত্ত তাদের ধন-সম্পদের একটি অংশ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশিয়েছে; আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ করবে। তার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দু'আ করবে। তোমার

---

১৬৩. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা (তা.বি)

১৬৪. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, এম বাশীর হাসান এন্ড সন্স, কলকাতা, বাবুল ইমসাক ওয়া কারাহিয়াতিল ইমসাক, তা.বি., পৃ. ১৬৪

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

১৬৬. প্রাগুক্ত।

১৬৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবু বাদ'ইল ওয়াহী, বাব নং-৫

১৬৮. আল-কুরআন, ৯:১০২-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তো তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকাহ্ গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[১৬৯]

আমরা ইব্ন মা'আয আশহালী তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে মুমিন মহিলাগণ! তোমাদের কেহ যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে তুচ্ছ না করে, যদিও সে ছাগলের একটি পোড়াখুর পাঠায় (তাও কবুল করে)।[১৭০] উকবা ইবন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাদাকাহর ছায়ায় থাকবে। এমনকি মানুষের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা করে দেয়া হবে।"[১৭১] হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বর্ণনা করেছেন, "সাদাকাহ্ গুণাহকে এমন করে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে।"[১৭২]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "মানুষের শরীরে তিনশত ষাট জোড় অঙ্গ আছে, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য অন্তত দৈনিক একটি সাদাকাহ্ আদায় করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দৈনিক এতগুলো নেক কাজ করবে সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।" (এ হাদীস শুনে সাহাবা কিরাম (রা.) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আরয করলেন, দৈনিক এতগুলো সাদাকাহ্ আমরা কিভাবে আদায় করব? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন): দু'জন লোকের মাঝে ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেয়া একটি সাদাকায় গণ্য হবে। রাস্তা থেকে লোকের কষ্টদায়ক কাঁটা, ঢিলা, পাথর ইত্যাদি সরিয়ে দেয়া সাদাকাহর মধ্যে গণ্য হবে।[১৭৩] এরূপে নেককাজ করে লোকের উপকার করে দৈনিক তিনশত ষাটটি নেকি সংগ্রহ করে সহজেই তিনশত ষাটটি সাদাকাহ্ আদায় করা যায়।

সাদাকাহ্ দানের ব্যাপারে ইসলাম এত সুন্দর নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে যার কারণে সাদাকাহ্ গ্রহণকারীর উপর দানকারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব থাকে না। নিজেকে প্রকাশ করা বা দানশীল হিসেবে পরিচিত করে তোলার হীন মানসিকতা নিয়ে দান করাও ইসলাম পছন্দ করে না। যাকে সাদাকাহ্ দেয়া হয় সে যদি নিচু শ্রেণীর হয়; এবং সাদাকাহ্ দানকারী মানুষের নিকট তা বলে বেড়ায় তাহলে এ সাদাকাহ্ একটি খারাপ ও অপমানজনক কাজে পরিণত হয়। মানবের উপকার করে বলে বেড়ানোর চেয়ে উপকার গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধক আর দ্বিতীয়টি নেই। এমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য দান করার চেয়ে মানবাত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক ও নৈতিকতার দিক দিয়ে জঘন্যতম কাজ আর নেই। ইসলাম সর্বদা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের স্বভাবে উচ্চ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে

---

১৬৯. ইমাম মালিক ইবন আনাস, মুয়াত্তা, কায়রো-১৯৫১, হাদীস নং-২৯১৪

১৭০. ইমাম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়া, কায়রো-১৮৯৫, খ. ৪, পৃ, ১৪৮

১৭১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাব নং-৮, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা, সুনানু ইব্ন মাজা, কিতাবুয যুহ্দ, বাব নং-২২

১৭২. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং-৮৪

১৭৩. আল-কুরআন, ২:২৬১—২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল কর না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের কেহ কি চায় যে, তার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান থাকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছ, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্তুতি দুর্বল, অতঃপর তার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে যায়? এভাবে আল্লাহ্ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"[১৭৪]

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করবেন যে অতি গোপনে দান-সাদাকাহ্ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে তাঁর আরশের নিচে ছায়া দিবেন যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলেন যিনি এমন গোপনে সাদাকাহ্ করেছেন যে তার বাম হাত জানে না যে ডান হাত কি দান করেছে।"[১৭৫]

এজন্যই গোপনে দান-খয়রাত অনাথ ও গরীবদের নিকট পৌঁছে দেয়া খুবই উৎকৃষ্ট পথ। কেননা এর দ্বারা যেমন গরীব লোকটির মান-সম্মান, ইযযত-অব্রুর হিফাযত হয় তেমনি দানকারী অলীক গর্ব-অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কুরআন মাজীদে ঘোষণা হচ্ছে, "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।"[১৭৬]

গোপনে দান করে এমন এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে যেয়ে মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান কর, যেন তোমার বাম হাত না জানে যে ডান হাত দ্বারা তুমি কি দান করেছ।"[১৭৭]

---

১৭৪. সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৬৬০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০৩১

১৭৫. আল-কুরআন, ২:২৭১

১৭৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, অনু: কারামত আলী নিজামী, ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৯৪, পৃ. ২৫৩

১৭৭. আল-কুরআন, ৩:৯২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলাম সর্বদা মানুষকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করে, সর্বপ্রকার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে; তার মধ্যে একটি উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা ও উন্নত ধ্যান-ধারণা উপস্থিত করে থাকে। মোটকথা, সবধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে মূলগত কৃপণতা, লোভ-লালসার প্রতিকার বিধান করত স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করে নেয়। অতএব ইসলাম সে কৃপণ স্বভাবের নিকট স্বীয় প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম বস্তু, যা দান করা তার জন্যই খুবই কষ্টদায়ক, তা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়ার দাবি করে। আল্লাহ বলছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনং পূণ্য লাভ করবে না।"[১৭৮]

উত্তরাধিকার সম্পদঃ

মানুষ যত স্থান থেকে সম্পদ লাভ করে তন্মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ অর্জনের বিষয়টি অন্যতম। কুরআন মাজীদের সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে (৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬) উত্তরাধিকারী আইন সম্পর্কিত বিধান অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে ঘোষিত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার লাভকারীদের ৬টি অংশ বর্ণিত হয়েছে। তা হল $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ। এই ছয় প্রকার অংশের জন্য কুরআন মাজীদে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ লাভকারীদের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ (পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই ও স্বামী) এবং নারীর সংখ্যা ৮ (স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের কন্যা, মাথা, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন এবং দাদী/নানী)।[১৭৯]

আয় ও আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেও ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকে বংশ পরম্পরায়। ইসলামে তালুকদারী, জমিদারী ও সামন্ত প্রথার কোন অবকাশ নেই। কুরআন ও হাদীসে এ সম্বনেধ সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ ব্যক্তিদের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীগণেরও অংশ আছে। তা অল্প হোক অথবা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[১৮০]

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেনঃ কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে।[১৮১]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ নবী (স.) বলেন, যাদের হক্ বা পাওনা নির্ধারিত রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী তাদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ বণ্টন করে দাও।[১৮২]

---

১৭৮. আল-কুরআন, ৪:১১–১২

১৭৯. আল-কুরআন, ৪:৭

১৮০. মিসকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৬৩

১৮১. মুসলিম-২য় খন্ড, পৃ. ৩৪

১৮২. আল-কুরআন, ২২:০৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে ধনসম্পদ বন্টনের যে পদ্ধতি ফিক্‌হ-এর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে তা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও সুবিন্যাস্ত। এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে জমিদারি, জায়গীরদারী ও সামন্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে এবঙ মানুষের দুঃখ-দারিদ্রও হ্রাস পাবে। কেননা ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ সবসময় আবর্তিত হতে থাকে। সম্পদ এক হাত থেকে অপর হাতে পৌঁছার কারণে এর দ্বারা কম-বেশি সকলেই উপকৃত হতে পারে।

উপার্জনের হারাম উপায়ঃ

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের হালাল-হারাম বিবেচনা করতে হয়। এ অর্থনীতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ বা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ কোন কিছুর স্বত্বার্জনই অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বলে গণ্য হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী। অবৈধ বা হারাম উপার্জন মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা বাহ্যিক প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা হলেও এর দ্বারা প্রকৃত সুখ ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায় না। যারা হারাম বা অবৈধ অর্থ-সম্পদের মোহে জীবন ব্যয় করবে তাদের পরকালীন জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে মহানবী (স.) এরশাদ করেছেন, যে দেহ হারাম উপার্জনে কেনা খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিন্ড জাহান্নামেরই যোগ্য। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী)

এছাড়াও সমাজে অর্থ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এমন কতকগুলো আয় ও আয়ের পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিষ বা Invisible cost বা Speed Money, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্ত, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুন্ঠন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপপাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়াও অন্য কোন অসাধু উপায়ে অর্থনীতিক ভাগ্য গড়ে তোলা যেহেতু অন্যদের ভাগ্যের বিনিময়ে ধনী হওয়ার নামান্তর, সে জন্য ইসলাম সাধারণভাবে তা নিষিদ্ধ করেছে।

সুদের পরিচয়ঃ

সুদকে আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হয়। রিবার আভিধানিক অঅর্থ হচ্ছে, স্ফীত বা বাড়তি। কুরআন মাজীদেও এ অর্থে 'রিবা'র ব্যবহার দেখা যায়। যথাঃ "তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[১৮৩] পারিভাষিক অর্থে-সম্পদে একটা বিশেষ ধরণের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা। প্রচলিত অর্থে 'রিবা' হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তারই বিনিময় হিসেবে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে

১৮৩. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, তা. বি., খন্ড-১, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করে থাকে। "রিবা হচ্ছে এমন বাড়তির নাম যা কোন মালের বিনিময় নয়।"[১৮৪] মালের ওপর যে অতিরিক্ত দাবি করা হয় তার নামই 'রিবা'।[১৮৫]

সুদ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কারণ এতে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র হয় এবং ধনীরা আরোও ধনী হয়। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে সুদের উপর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে দারিদ্র্য। মহানবী (স.) এর আবির্ভাবকালীন আরবের কৃষক ও অন্যান্য নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোক ঋণের জালে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আল্লামা বায়দাভী লিখেছেন, তারা (ঋণদাতারা) একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে সুদ নিত। অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করত থাকতো। আর এভাবে ঋণগ্রহীতার সমস্ত সম্পত্তি একটি সামান্য পরিমাণের ঋণের দরুন ধ্বংস হয়ে যেত।[১৮৬] ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ শুধুমাত্র মহাজনী কারবারের ক্ষেত্রেই নয় বরং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সমভাবে হারাম।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবকালে আরবে বিভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে কিছু রীতি এমন ছিল যার দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। তবে কিছু রীতি-নীতি ছিল জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ তাআলা ধীরে ধীরে তাঁর বান্দাদেরকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেন। এতে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত মানবতার জন্য ক্ষতিকর রীতিনীতির বিলুপ্তি ঘটে, অন্যদিকে আল্লাহর দেয়া বিধানও ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। এ সত্য সামনে রেখে চিন্তা করলে অনায়াসে বোঝা যাবে, আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশ তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশকে বাতিল করতে আসে না বরং পরিপূর্ণ করতেই আসে। সুদের বেলায়ও এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। আরবে সুদখোরী ব্যবসা ছিল একটি সাধারণ পেশা। সুদখোর মহাজনরা দাবি করত, সুদ এক ধরনের লেনদেন ছাড়া কিছু নয়। "তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত।"[১৮৭]

আরবের পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা সাধারণত সুদী ব্যবসা করতো। হিজাযের খায়বার নামক বাজারটি ইয়াহূদী পুঁজিপতিদেরই অধিকারে ছিল। 'রাফি' নামক ইয়াহূদীকে 'তাজেরে হিজায' বা হিজাযের বণিক আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এ পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা মজবুত কেল্লা তৈরী করে তাতে বসবাস করতো এবং গরীব শ্রেণীর লোকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো। এ সুদ নিষিদ্ধ করত গিয়ে কুরআনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় যে, সুদ খাওয়াটা ইয়াহূদীদের কর্ম। তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করছে এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল-এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।[১৮৮]

---

১৮৪. ইমাম আল-ফাখর আর-রাযী, আত-তাফসীর আল-কাবীর, দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি., পৃ. ২৬০

১৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বায়দাভী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, আল-কাহেরা, তা.বি. খণ্ড-১, পৃ. ১৫৪

১৮৬. আল-কুরআন, ২:২৭৫

১৮৭. আল-কুরআন, ৪:১৬১

১৮৮. মাওলানা হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

মহাজনী সুদঃ

আরব দেশের লোকেরা ঋণের মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফাকে বৈধ মনে করতো। বর্তমানে এটাকেই মহাজনী সুদ বলা হয়। বর্তমান সময়ের ন্যায় আবরদের মধ্যে যে সকল লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলো হলোঃ

১. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গরীব লোকদের ঋণ দেয়া হতো এবং টাকা প্রতি সুদ ধার্য করা হতো।

২. ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে সুদ ও মূল টাকা মিলিয়ে আসলে রূপান্তরিত করা হতো এবং পুরো টাকার উপর সুদ ধরা হতো। একেই বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ।

৩. অলংকার, অস্ত্র কিংবা এ জাতীয় জিনিস বন্ধক রেখে তার পরিবর্তে ঋণ দেয়া হতো। ঋণগ্রীহতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধকী জিনিসের উপর সুদ ধরা হতো এবং সুদ বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে বন্ধকী জিনিসটি আত্মসাৎ করে ফেলা হতো।[১৮৯] ইসলামী ফিক্হর পরিভাষায় এটাকেই 'রিবা আন-নাসিয়াহ্' বলা হয়।

ইসলাম বিনাশ্রমে অর্জিত এ মুনাফাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সর্বকালের জন্য সুদকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-"হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান হারে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১৯০] এখানে দ্বিগুণ, চারগুণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রেখে সুদের সাধারণ নিয়ম-নীতির বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি বরং এখানে শুধু বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেকালে আরবের মাটিতে যা কিছু বাস্তবে ঘটত এটা তারই আলোচনা মাত্র।

বর্তমান যুগেও পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে সুদখোর মহাজনদের পৈশাচিকতা, নির্মমতা, অসহায় বনী আদমকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার বহুমাত্রিক চিত্র দেখা যায়। গৃহকর্তার গৃহীত ঋণের জন্য তার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতীম সন্তানদের বাস্তুহারা হতে দেখা যায়। সামান্য ক'টি টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের জন্য ঋণ গ্রহীতার বাড়ি-ঘর নিলাম হওয়ার ঘটনা অহরহ পত্রিকার পাতায় পরিদৃষ্ট হয়। আবার কখনও কখনও তার বাসন-কোসন, কাপড়- চোপড়সহ সব মালামাল ক্রোক হতে দেখা যায়। এমনও খবর পত্রিকান্তরে জানা গেছে যে, সামান্য কটি টাকার জন্য ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার শবদেহ সৎকার করতে দেয়া হয়নি যতক্ষণ না মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। গরীব ও সর্বহারা মানতাকে নিয়ে এ হল সুদখোর মহাজনদের কুকীর্তির চিত্র, যা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশে হর-হামেশাই দেখা ও শোনা যায়।

কুরআন মাজীদ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, মহাজনী সুদ ছাড়াও সাধারণ সুদী কারবারকেও নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করছেন।"[১৯১]

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'রিবা'র কি অর্থ তা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। ফকীহদের মতে 'বা' 'ঈ' বা বেচাকেনার অর্থ হচ্ছে "স্বেচ্ছায় নিজের মালকে অন্যের মাল দ্বারা বিনিময় করা।"[১৯২]

---

১৮৯. আল-কুরআন, ৩:১৩০

১৯০. আল-কুরআন, ২:২৭৫

১৯১. আবুল হাসান বুরহান উদ্দীন আলী, আল-হিদায়া, কালাম কোম্পানী, করাচী, খন্ড-৩, পৃ. ১২৭

১৯২. আল-কুরআন, ২:২৭৮–৮০

Dhaka University Institutional Repository

সুদ হারাম করার সাথে কুরআনে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত যা গ্রহণ করেছ তা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সুদকে হারাম ঘোষণার পর ঋণগ্রহীতার নিকট যা পাবে তা মাফ করে দাও। মাফ না করলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। রসূলুল্লাহ (স.) নবুওয়াতের শেষ বর্ষে সুদ সম্পর্কিত কুরআনের এ শেষ নির্দেশটি সকলকে শুনিয়ে দেন। "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"[১৯৩]

বাণিজ্যিক সুদঃ

মহাজনী সুদ ছাড়াও ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেনেও সুদের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক লেনদেনে নিম্নের দুটি নীতি লংঘিত হলে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হবে। নীতি দুটি হলঃ

১. সমজাতীয় পণ্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে খাঁটি-অখাঁটি, সজ্জিত-অসজ্জিত, কম দামী-বেশী দামী, ভাল-খারাপ ইত্যাদি বিবেচনা না করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের পণ্য সমান ওজনের হতে হবে। কম-বেশী করা যাবে না। তাৎক্ষণিক বিনিময় করতে হবে। ধারে বা বাকীতে করা যাবে না। যেমন- সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ, কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস, মোনাক্কার বিনিময়ে মোনাক্কা প্রভৃতি সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ের সময় সমান সমান, হাতে হাতে লেনদেন করতে হবে। কম- বেশী করলে তা সুদ হয়ে যাবে।

২. ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সমজাতীয় না হলে, তাতে কম-বেশী করা যাবে। যেমন- সোনার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে গম প্রভৃতি লেনদেনে কম-বেশী করা যাবে। তবে এ জাতীয় পণ্যের বেচাকেনাও নগদ করতে হবে। ধারে বা বাকীতে করা যাবে না।

এ দুটি নীতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) এর নিম্নোক্ত সহীহ হাদিসটিকে ফকীসগণ মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি 'উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণ এবং হাতে হাতে তথা তাৎক্ষণিক ও নগদ হতে হবে। আর পণ্য সমজাতীয় না হলে যেভাবে খুশী কম-বেশী করা যাবে। তবে বাকীতে করা যাবে না এবং সংগে সংগে লেনদেন করতে হবে।[১৯৪] ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এটাকেই 'রিবা আল-ফদল' বলে আখ্যায়িত করেন।

মুসলিম ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীসটিকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া না হওয়া নির্ধারণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তাবলীর পরিপন্থী হলে তাঁরা তাকে সুদ হিসেবে অভিহিত করেন। আর ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ

---

১৯৩. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৩

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে বর্ণিত শর্তানুযায়ী হলে তাঁরা তাকে বৈধ মনে করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এ নীতিটিই পার্থক্য নির্ণয় করে। সাধারণ ব্যাংকিং-এ টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হয় বলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে সুদে পরিণত হয়, আর ইসলামী ব্যাংকিং এ মালামালের বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হলেও তাতে সুদ হয়না।

সুদী কারবারের সাথে জড়িত সবাই অপরাধীঃ

সুদের অনিষ্টতা আর তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইসলাম এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন ব্যক্তি যে কোন রূপে অংশীদার হোক না কেন; চাই তার দলীল ও চুক্তিপত্র লেখক হোক কিংবা তার সাক্ষী হোক তাদের সকলের প্রতিই অভিশাপ দিয়ে থাকে। জাবির (রা.) বলেন, " রসূলুল্লাহ (স.) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদী ব্যবসার লেখক এবং ঐ সম্পর্কের সাক্ষ্যদানকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সবাই সমান।"[১৯৫]

নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়নঃ

রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করেছিলেন, সব রকমের সুদই অবৈধ, তবে মূল অর্থ তোমাদেরই, সেটা তোমাদের পাওয়াও উচিত যাতে তোমরা অত্যাচারী না হও এবং অত্যাচারিতও না হও। আল্লাহ্ তাআলা শেষবারের মত ঘোষণা করেছেন, সুদী ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর আমি 'আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ ব্যবসার উপর সর্বপ্রথম এ নির্দেশ জারি করেছি। ভাল করে জেনে নাও, প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের ভাই। সমস্ত মুসলিমই পরস্পর ভাই ভাই। নিজের ভাইয়ের জিনিস জোর করে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়, হ্যাঁ যদি সে ইচ্ছা করে কিছু দেয়। তোমরা নিজেদের উপর অবিচার কর না। হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার পয়গাম পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছি।?"[১৯৬]

এ ভাষণ তথা মানবাধিকারের এ চার্টটি ঘোষিত হওয়ার পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা'এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[১৯৭]

উপরোক্ত ভাষণে রসূলুল্লাহ (স.) সুদকে কেবল নীতিগতভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং আপন চাচার সুদী কারবারের উপর এ নিষেধাজ্ঞা সর্বপ্রথম কার্যকরও করেছিলেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের অর্থ অসংখ্য লোকের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।[১৯৮] তিনি রীতিমত লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে সুদী কারবার পরিচালনা করতেন।

---

১৯৫. ইবনে হিশাম, আস-সীরাত আন-নববীয়াহ, ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত-১৯৮৫, খ. ২, পৃ. ১৪৬

১৯৬. আল-কুরআন, ৫:৩

১৯৭. ইবনে জারীর তাবারী, আত-তাবারী, তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক, ১৯৬৪, পৃ. ১৭৫৩

১৯৮. আল-কুরআন, ২:২৭৫ – ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সুদখোরের পরিণাম:

সুদখোর টাকার নেশায় বেসামাল হয়ে যায়। সে অসৎ চরিত্রের অন্ধকার গহবরে হারিয়ে যায়। মানবতার আলোকশিখা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, সমবেদনা, সহমর্মিতাকে সে অর্থহীন মনে করে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা ও অন্যদের সমূলে ধ্বংস করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। অভাবী ও অসহায়দের দুরবস্থা সে দেখেও দেখে না, সহায়-সম্বলহীনের আর্তনাদ তার কানে প্রবেশ করে না। সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এজন্য কুরআন মাজীদ পরকালে সুদখোরের পরিণতি এভাবে চিত্রিত করেছে, "যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিঅধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।"[১৯৯]

ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী এটা হল শেষ সীমা যে সুদকে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সুদখোরকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অতপর ঘোষণা করা হয়, "মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।"[২০০] অর্থাৎ সুদখোর পার্থিব জীবনে যে সুখের সন্ধান লাভের জন্য সুদ খেয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাতে তার সুখ আসে না, বরং তার দুঃখ-দুর্দশা বহুগণে বেড়ে যায়। কারণ তার শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায়, আরো অধিক সম্পদ লাভের আশায় সে পাগলের মত হয়ে যায়। সম্পদের আধিক্যের দরুন মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নানারকম অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠাবেন তখন সুদখোর ছাড়া সকলেই দৌড়াতে থাকবে। সুদখোররা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে, যেমন মাতাল ব্যক্তি পড়ে যায়। কারণ তারা দুনিয়ায় যে সুদ খেয়েছে আল্লাহ তাআলা তা তাদের পেটে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ভারী করে দিবেন। ফলে তারা দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাবে। অন্যান্য মানুষের ন্যায় দ্রুত হাঁটতে চাইলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। কাতাদাহ্ (র.) বলেছেন, "সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। এটাই সুদখোরদের আলামত। হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের চিনতে পারবে।"[২০১] আবদুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন "কোন জনপদে যিনা ও সুদ ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ সে জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি দেন।"[২০২]

---

১৯৯. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

২০০. আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয, আদ-দুররুল মানছুর, দারু ইবনিল আছীর, রিয়াদ-২০০১, পৃ. ২৭৮

২০১. প্রাগুক্ত।

২০২. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, আল-কাহেরা: দারুত তাকওয়া, তা.বি., খন্ড-১, পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সামুরাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্বপ্ন বিষয়ক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সুদখোরকে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোহিত নদীতে ফেলে সাতরানোর শাস্তি দেয়া হবে যা হবে রক্তের মতো এবং পাথর গিলানো হবে, তা হল সেই হারাম মাল যা সে দুনিয়ায় জমা করেছে, তাকে আগুনের পাথর ভক্ষণ করানো হবে যেমনিভাবে সে দুনিয়ায় হারাম জমা করে ভক্ষণ করেছে।" ইমাম আহমদ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ইসরা বা মিরাজের রজনীতে আমাকে এমন একদল লোকের কাছে নেয়া হল যাদের পেট ঘরের ন্যায় বিরাট, যেগুলোর ভিতর থেকে সাপ বের হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন-এর সুদখোর।"[২০৩]

আবু হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "চারজন জান্নাতে না ঢুকানো এবং তার নি'আমত আস্বাদন না করানো আল্লাহর হক। এরা হল-মদখোর, সুদখোর, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, তবে যদি তারা তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন।"[২০৪]

বর্ণিত আছে, সুদখোররা সুদ খাওয়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে কিয়ামতের দিন তারা কুকুর ও শুকরের আকৃতিতে উঠবে। যেমনিভাবে শনিবার ওয়ালাদের আল্লাহ নিষিদ্ধ মাছ ধরার কৌশল অবলম্বনের কারণে চেহারা বিকৃত করেছিলেন। তারা মাছের জন্য শনিবার গর্ত করে রাখত এবং সেদিন মাছ সেখানে পড়ত, পরে তারা রবিবারে সেগুলো শিকার করতো। তাদের এরূপ কৌশল অবলম্বনের কারণে আল্লাহতাআলা তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সুদে রয়েছে সত্তটি পাপ, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল কোন লোকের তার মাকে বিয়ে করার সমতুল্য (নাউযুবিল্লাহ)।"[২০৫]

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী।"[২০৬] অর্থাৎ পাপের দিক থেকে উভয়েই সমান।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য:

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একরকম হতে পারে না। নিম্নে তা তুলে ধরা হল-

১. ব্যবসায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মুনাফার সমান বিনিময় হয়। ক্রেতা পণ্যটির দ্বারা লাভবান হয়। আর ক্রেতার জন্য পণ্যটি জোগাড় করতে বিক্রেতা যে মেধা, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করেছে তার বিনিময় গ্রহণ করে। অপরদিকে সুদী লেনদেনের ক্ষেত্রে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদখোর নিশ্চিত লাভ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সুদ প্রদানকারী 'সময়' লাভ করে, যার দ্বারা লাভবান হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা যদি সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ঐ ঋণ নেয় তাহলে নিশ্চিতভাবে তা অলাভজনক এবং অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ নেয় তাহলে লাভ-ক্ষতি দুটোরই সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সুদের ভিত্তি হল একটি পক্ষের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ এবং অপরপক্ষের লোবসান অথবা অনিশ্চিত লাভের ওপর।

---

২০৩. আদ-দুররুল মানছুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

২০৪. ইবনে মাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১৩

২০৫. আদ-দুররুল মানছুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

২০৬. আল-কুরআন, ২:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২. ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে মাত্র একবারই লাভ গ্রহণ করে। তা যত বেশীই হোক। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে সুদখোর ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বর্ধিত হারে বার বার সুদ নিয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতা ঐ অর্থ থেকে সীমিত লাভ করলেও সুদখোর তার থেকে সীমাহীন লাভ করে। এমনকি ঋণদাতা তার স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু সুদখোরকে সমর্পণ করার পরও সুদখোরের দাবি শেষ হয় না।

৩. ব্যবসায়ে পণ্যের বিনিময় মূল্য পরিশোধ করার সাথে সাথে লেনদেন শেষ হয়ে যায়। ভাড়ার ক্ষেত্রে যে বস্তুটির জন্য ব্যবহারকারী ভাড়া দেয় তা অবিকৃত থেকে যায় এবং সে অবস্থায়ই তা মালিককে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পূণর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে ব্যক্তি অর্থ, শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সুদখোর শুধু তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে কোন প্রকার শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ না করে মুনাফার সিংহভাগের মালিক হয়ে যায়। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ-লোকসানের সমান অংশীদারিত্ব থাকলেও সুদখোর লাভ-লোকসানের পরোয়া না করে কেবল নির্ধারিত পরিমাণ লাভের দাবি করে।

এসব কারণে ব্যবসা ও সুদের অর্থনৈতিক মর্যাদার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রচিত হয়। যার ফলে ব্যবসায় মানবিক তমদ্দুনের লালনকারী শক্তিতে পরিণত হয় আর সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়।

ঘুষঃ

কোন সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিজের পক্ষে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য বা নিজের পক্ষে বিচারের রায় পাবার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে নিজেকে অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য যে মাল-সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, শরীয়াতের পরিভাষায় তাকেই রিশওয়াত বা ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয়। ঘুষখোররা যে ঘুষ নেয় তার কোন বিনিময় দেয় না, তবে ফাইল আটকিয়ে নেয় বলে এর নাম হয়েছে ঘুষ।

ঘুষের আয় হারাম। ঘুষ বা উৎকোচের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অবৈধ উপার্জন বলে চিহ্নিত। ঘুষকে বর্তমানে বখশিশ, উপরি আয়, Invisibtle cost, স্পিড মানি (Speed money) ইত্যাদি যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন এ আয় দিয়ে খাবার কিনে খাওয়া, জীবিকা নির্বাহ করা ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করা হারাম। কাজেই ঘুষের অর্থ ব্যয় করে খাবার খেয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। মহানবী (স.) বলেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী দুজনই জাহান্নামে যাবে।

কেউ ঘুষ গ্রহণ করেছে জানা গেলে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেলে, তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। ঘুষ যে নেয় তাকে ঘুষখোর বলা হয়।

ঘুষ এমন এক জঘন্য প্রবণতা; যে সমাজে তা ব্যাপকতা লাভ করে, সে সমাজে প্রশাসনের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে; ন্যায়-অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকে না, নিয়ম-নীতির কোন বালাই থাকে না, দুর্নীতি হুঁ হুঁ করে বাড়তে থাকে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও জুলুমের প্রতিকার করার প্রবণতা সে সমাজ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে লোপ পায়। অপরাধী বুক ফুলিয়ে চলে, আর নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ চরম অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যায়। নির্যাতিত নাগরিকগণ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ইনসাফ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা বোধ করে না। বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। এ কারনেই ইসলাম ঘুষের মাধ্যমে জঘন্য পন্থায় ধন উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়-অবৈধভাবে আত্মসাৎ করোনা, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য এর একাংশ শাসকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করনা।"[২০৭]

মহানবী (স.) ও এহেন প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন।

এছাড়াও ঘুষ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা রয়েছে। ঘুষের যাবতীয় পন্থাই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

জুয়ার সংজ্ঞা ও পরিচয়:

জুয়াকে আরবীতে 'মায়সির' ও 'কিমার' বলা হয়। বস্তুত মায়সির ও কিমার এমন খেলাকে বলা হয়, যা লাভ ও ক্ষতির মধ্যে আবর্তিত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট নয়।'[২০৮]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয়েরই সম্ভবনা থাকে। ফলে এতে লাভ কিংবা লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকে।[২০৯] যেমন দুই ব্যক্তি পরস্পর একে-অপরকে বাজি ধরে বলল, যদি তুমি দৌড়ে অগ্রগামী হতে পার, তাহলে তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। আর যদি আমি অগ্রগামী হই, তবে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করবে। এক্ষেত্র লাভ ও লোকসান অস্পষ্ট। জাহিলী আমলে নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল।

বর্তমানকালে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার ক্ষেত্রে আরো বহু নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন হাউজী, টাকা বাজি রেখে ঘোড় দৌড় ও তাস খেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, শুধু নাম পরিবর্তনের কারণে বস্তুর হাকীকত (মূল প্রকৃতি) এবং হুকুম পরিবর্তন হয় না। কাজেই প্রাচীনকালে প্রচলিত জুয়া সম্পর্কে যে হুকুম প্রযোজ্য ছিল, আধুনিককালের জুয়ার ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে।

শরীআতের দৃষ্টিতে জুয়া:

ইসলামী শরীআতে জুয়া হারাম। একাধিক আয়াত ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, তাহলেই তোমারা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামায আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।"[২১০]

---

২০৭. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৬

২০৮. শামী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৩৫

২০৯. আল-কুরআন, ৫:৯০–৯১

২১০. জাওয়াহিরুল ফিকহ্‌, ২খন্ড, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে মদ ও জুয়াকে ঘৃণ্য বস্তু আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। মদ ও জুয়াকে একই পর্যায়ভুক্ত করে মূর্তিপূজার সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতে এগুলো থেকে দূরে থাকার হুকুম করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু এর দ্বারা শয়তান মানুষকে নামায আদায় করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে। কাজেই মদের ন্যায় জুয়াও হারাম। এর হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন মজীদের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যদি কেউ এ হুকুমকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।[২১১]

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো, জুয়া খেলব। (এ কথার অপরাধের কারণে) সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য।"[২১২]

অতএব, জুয়াকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেমন কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই, তেমনি একে খেলা, মনের সান্ত্বনা, তৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপে গ্রহণ করাও বৈধ হতে পারে না।

জুয়ার অপকারিতাঃ

জুয়া কেলাতে বহু অপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১. জুয়ার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে। এতে বিজয়ী ব্যক্তির কেবল লাভই লাভ। আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। এ খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মাল বিজয়ীর হাতে চলে যায়। এতে যে ব্যক্তি লাভবান হয় সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে ক্রমেই রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। জয়লাভকারী ব্যক্তি রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। আর পরাজিত ব্যক্তি দিন দিন সম্পদ হারা হতে থাকে। জুয়ারী ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা না থাকলে সে সম্পদ বিক্রি করে প্রয়োজনে ঘরের সামানপত্র এমনকি ঘর বিক্রি করেও এ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাতেও সম্ভব না হলে চুরি, ডাকাতি করে হলেও খেলায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে থাকে। জুয়া খেলার সাথে চোর-ডাকাতের এবং খারাপ লোকদের সম্পৃক্ততাই সবচেয়ে বেশি। মোটকথা, এই খেলায় যেমন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমনি এতে মানুষের চারিত্রিক ক্ষতিও রয়েছে চরমভাবে।

২. জুয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে উপার্জনের ব্যাপারে অলস, উদাসীন ও নিস্পৃহ হয়ে যায়। তার একমাত্র চিন্তা থাকে বসে বসে বাজির মাধ্যমে অন্যের মাল হাতিয়ে নেওয়া, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন না হয়। এমনি করে অলস হয়ে তারা দেশ ও দশের উন্নয়নে আর কোন অবদান রাখতে পারে না।

৩. জুয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে জুয়া ও মদের মত পরস্পরের মধ্যে ফাসাদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। কেননা পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জুয়ার জয়-পরাজয় এক পর্যায়ে মারামারি এমনকি হত্যাকান্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৪. জুয়ারী ব্যক্তি জুয়ার নেশায় মদখোর ব্যক্তির ন্যায় মাতাল অবস্থায়ই থাকে সর্বদা। এ কারণে সে ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও আত্মীয় কারোর খবর রাখতে পারে না। ফলে জুয়াড়ী ব্যক্তি তার

---

২১১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাবী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯৫

২১২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সুন্দরভাবে গড়ে তোলতে পারে না, ছেলেমেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত বানাতে পারে না। বরং তারাও পিতার দেখাদেখি ঐ সর্বনাশা খেলায় অংশগ্রহণের প্রয়াস পায়। এমনি করেই জুয়াড়ী ব্যক্তির পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। জুয়াড়ী ব্যক্তির মেজাজে সর্বদা রুক্ষতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান থাকে। লাভবান ব্যক্তি আরো লাভের নেশায় মাতাল হয়ে উঠে। আর পরাজিত ব্যক্তি প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠে। তাই স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে তার বিবাদ, ঝগড়া ও অশান্তি সর্বদা লেগেই থাকে। বর্তমানে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, এ জাতীয় লোমহর্ষক ঘটনার পেছনে জুয়ার প্রভাবকে খাটো করে দেখা যায় না।

৫. জুয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতির দিকটি হলো, এ খেলায় মানুষ আল্লাহ্ বিমুখ এবং নামায, রোজা তথা ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন ও গাফিল হয়ে যায়। কেননা জুয়ারী ব্যক্তির একমাত্র ধ্যান-ধারণা, কেমল করে আরো টাকা হাসিল করা যায় অথবা কেমন করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কাজেই জুয়ার এ সর্বনাশা গ্রাস থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লটারিঃ

লটারিও একপ্রকার জুয়া। কাজেই লটারিকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং একে জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে জায়িয মনে করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। যারা লটারির ব্যবস্থাপনা করে থাকে, তাদেরকে এ সম্বন্ধে শরীআতের বিধান শুনানো হলে তারা বলে, এতে ক্ষতি কি? এতে তো মানুষের বহু উপকার রয়েছে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন বস্তুতে সাময়িক কিছু উপকার আছে বলেই তা হালাল হতে পারে না। কেননা, যে বস্তুতে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বস্তু স্বীকার করে নেওয়া যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সামগ্রিকতার বিচারে এগুলোকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় অপকার বেশি, শরীআত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা এমনকি জিনিস আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই। উপকার আছে বলেই এগুলেকে কেউ জায়িয মনে করে না। লটারির বিষয়টিও ঠিক তদ্রুপ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এতে কিছুটা উপকার আছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে জুয়া এবং ধোঁকা। কাজেই শরীআতের দৃষ্টিতে লটারিও হারাম। স্মর্তব্য, কোন মহৎ কাজের জন্য না-জায়িয তরীকা অবলম্বন করা কোনভাবেই বৈধ নয়।

বস্তুত জনকল্যাণের ধোঁয়া তুলে যারা এসব লটারির ব্যবস্থা করে থাকে, মূলত জনসেবার পরিবর্তে আত্মসেবাই তাদের সামনে থাকে মুখ্য। সুন্দর চাকচিক্যময় লেভেল লাগিয়ে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়াই তাদের লক্ষ্য। মুসলমান হিসেবে এসব প্রতারকদের থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।[২১৩]

---

২১৩. আল-কুরআন, ৮৩:১-৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়া ও ভেজাল মিশানোঃ

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওযনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরাশাদ হয়েছে, "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[২১৪]

নিজে গ্রহণের সময় বেশি মাপা এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়ার অশুভ পরিণতি কেবল পারলৌকিক নয় বরং তা ইহলৌকিকও বটে। আর তা শুধু নৈতিকভাবেই নয় বরং অর্থনৈতিকও বটে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) ওযনে কম না দিয়ে বেশি দেওয়ার জন্য হুকুম করেছেন। তিনি বলেন, ওযন কর এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও।"[২১৫]

বেচাকেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতারণা করা, পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা কিংবা ভুল প্রচারণা করা বা মালে ভেজাল মিশানো হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন খাদ্যস্তুপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপে হাত ঢুকিয়ে ভিতরে খাদ্যবস্তু ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্য মালিক এ কি? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। একথা শুনে তিনি বলেন, "যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।"[২১৬]

এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম।

অধিক মূল্য লাভের নিমিত্তে পশুর স্তন্যে দুধ জমিয়ে রেখে তা বিক্রয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরাশাদ করেন, "বাজারে পৌছার পূর্বেই (স্বল্পমূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাক্ষাত করবে না। পশুর স্তন্যে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।"[২১৭]

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দর-দাম করা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরাশাদ করেন, "তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।"[২১৮] এরূপ করাও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শরীআতে যেসব বস্তু হারাম, এর উৎপাদন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ "যে বস্তু পান করা হারাম, তা বেচাকেনা করা এবং বেচাকেনার পর এর মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম।"[২১৯]

এপ্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা লানত করেন। মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, প্রস্তুতকারীর উপর, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর, বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর।"[২২০]

---

২১৪. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৫৩
২১৫. প্রাগুক্ত
২১৬. ইমাম তিরমিযী, সুনানু তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪১
২১৭. প্রাগুক্ত
২১৮. আল-ফিকহ আলাল মাযাবিহিল আরবায়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬
২১৯. আবু দাউদ, পৃ. ৫১৭
২২০. আল-ফিকহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহ্গণের মতে, "মুসলিম দেশে হারাম বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা জায়িয নেই। এমনকি প্রকাশ্য হলে অমুসলিমদের জন্যও নয়।"[২২১]

অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জনঃ

হালাল উপায়ে উপার্জন করা ফরয এবং হারাম ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উপার্জন করা হারাম। অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে অর্থ সম্পদ হাসিল করা হয়, তা ভক্ষণ করে নামায-রোযা আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তার দু'আও কবুল হয় না। সর্বোপরি উপরোক্ত ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে, সাদাকা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। (অর্থাৎ হারাম মালের সাদাকা কারো পাপ মোচনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়না)। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎ কর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।"[২২২]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।" আহারের ব্যাপারে তিনি নবী-রাসূলগণকে যেরূপ হুকুম করেছেন, মু'মিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার ক ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"[২২৩]

"হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দান করেছি তা থেকে আহার কর।"[২২৪]

একখানা হাদীসের শেষাংশে তিনি জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উসকু-খুসকু অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস- পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিতপালিত। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির দুআ কেমন করে কবুল হবে।[২২৫]

অন্য হাদীসে আছে, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না। বরং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।"[২২৬]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়িয নেই। অনুরূপভাবে অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন করাও জায়িয নেই। যেমন গান-বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা জায়িয নেই।

---

২২১. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৪২
২২২. আল-কুরআন, ২৩:৫১
২২৩. আল-কুরআন, ২:১৭২
২২৪. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৪২
২২৫. প্রাগুক্ত
২২৬. ইবন মাজাহ, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আমর ইব্‌ন কুররা হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাত তাআলা আমাকে আশ্চর্য রকমের হতভাগা করে সৃষ্টি করেছেন। সকল দিক থেকেই আমার পথ বন্ধ। একটি মাত্র রাস্তাই আমার জন্য খোলা, যার মাধ্যমে আমি জীবিকার্জন করে থাকি। আমি দফ বাজিয়ে গান করে থাকি। বিনিময়ে যা পাই এ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দয়া করে আমাকে গান-বাজনার অনুমতি দানে বাধিত করুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছো। আমি এর জন্য তোমাকে কখনো অনুমতি দিব না। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য জীবিকার্জনের বহু পথ খোলা রেখেছেন। যেমন খোলা রেখেছেন আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য জীবের জন্য। অবশ্য তুমি হালাল রুজির পরিবর্তে হারাম রুজির পথ বেছে নিয়েছো। আমার মজলিশ থেকে চলে যাও। আল্লাহর নিকট তোমার কৃতকর্মের জন্য তাওবা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও। তুমি যদি অনুরূপ কাজে লিপ্ত হও, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। তোমাকে প্রহার করবো। তোমার মাথার চুল ন্যাড়া কর দিব। তোমাকে এ শহর থেকে বের করে দিব এবং তোমার ধন-সম্পদ মদীনার যুবকদের জন্য লুট করে নেওয়া হালাল করে দিব। এরপর আমর ইব্‌ন কুররা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌ জানেন তখন তার অবস্থা কি হয়েছিল? সে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এরা হচ্ছে নাফরমান। এদের থেকে কেউ যদি তাওবা চাড়া মারা যায়, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নপৃংসক ও উলঙ্গ অবস্থায় হাশর করবেন। যেমন তারা দুনিয়াতে ছিল। এমনকি অন্যান্য লোকের থেকে পর্দা করার জন্য আচলটুকু পর্যন্ত তাদের থাকবে না। যখনই উঠে দাঁড়াবে, আছার খেয়ে পড়ে যাবে।"[২২৭]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, গান-বাজনাকে জীবিকার্জনের মাধ্যমে বলে জ্ঞান করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ্‌। কেননা এতে অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয় এবং সাধারণভাবে চরিত্রহীনতা ও নিলর্জ্জতা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওরা তারাই, যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[২২৮]

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবরদখল:

মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইসলাম চুরির শাস্তি বিধান করেছে। বস্তুত গোপনভাবে কারো মাল হস্ত গত করাকে শরীআতের পরিভাষায় চুরি বলা হয়। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি যদি দশ দিরহাম বা তদুর্ধ মূল্যের কোন জিনিস চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে এবং আদালত কর্তৃক এ শাস্তি বাস্তবায়িত হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। চুরি করে নিজে স্বীকার করলে বা সাক্ষ্য প্রমাণে অপরাধ প্রমাণিত হলে চুরির বিধান প্রযোজ্য হবে। কেউ প্রথমবার চুরি করলে তার ডান হাত টাকা হবে। দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটা হবে। তৃতীয়বার চুরি

---

২২৭. আল-কুরআন, ৩১:৬

২২৮. আল-কুরআন, ৫:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করলে কোন কিছু না কেটে তাকে এ অপকর্ম থেকে তাওবা না করা পর্যন্ত জেলখানায় রাখা হবে। চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[২২৯]

এ দন্ডাদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কারো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। একদা মাখযূমী গোত্রের কোন এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়ে কুরায়শী লোকেরা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন হযরত উসমান (রা.) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর না করার জন্য সুপারিশ করছো? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন, "পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি করতো, তখন তাকে রেহাই দিতো; আর যখন দুর্বল বা ছোট বংশের লোক চুরি করতো তখন তার উপর দণ্ডাদেশ জারী করতো। আল্লাহর শপথ; আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।"[২৩০]

জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ইসলামে ডাকাতের শাস্তির বিধানও রয়েছে। যেহেতু ডাকাত মানুষের জীবন ও সম্পদ উভয়ের উপর হামলা চালায়, কখনো শুধু জীবনহানি ঘটায়, কখনো শুধু সম্পদ নিয়ে যায়, আবার কখনো শুধু ভয় দেখিয়েও হুমকি দেয় সেহেতু এর শাস্তিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবন ও সম্পদ উভয়ের হানির ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি শূলদন্ড, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু জীবন হানির ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড, তৃতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু সম্পদ হানির ক্ষেত্রে শাস্তি পরস্পর উল্টা দিক দিয়ে হাত-পা কেটে দেওয়া। অর্থাৎ ডান হাত কাটলে বাম পা এবং বাম হাত কাটলে ডান পা কেটে দিতে হবে। চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা নির্বাসন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাতের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।[২৩১]

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরাশাদ বলেন, "কেউ যদি প্রকাশ্য লুটপাট করে, তবে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্তও নয়।"[২৩২] অনুরূপভাবে ছিনতাই করার ব্যাপারেও ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এভাবে মাল ছিনিয়ে নিয়ে তা ভক্ষণ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "কারো অর্থসম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ব্যতীত ভক্ষণ করা কারো জন্য হালাল নয়।"[২৩৩] কারো সম্পত্তি জবরদখল করাও ইসলামে জায়িয নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "কেউ যদি কারো জমি থেকে অর্ধ বিঘত পরিমাণ জায়গা জবরদখল করে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জায়গা সাত তবক যমীনসহ বেড়ি বানিয়ে তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।"[২৩৪]

---

২২৯. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৩১৪
২৩০. আল-কুরআন, ৫:৩৩
২৩১. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৩১৩
২৩২. প্রাগুক্ত
২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণঃ

বেতনভোগী কর্মচারী নির্ধারিত দায়িত্বপালনের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ করা জায়িয নেই। বস্তুত এ ধরনের উপহার গ্রহণের মধ্যে হককে বাতিল কিংবা কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিলের আশংকা রয়েছে। আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) আযদ গোত্রের ইব্‌ন লাতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে কোথাও পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া তথা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) খতুবা দিয়ে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আম্মা বাদু' আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেসব বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করেছেন, এর কোন একটির ব্যাপারে আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিয়োগ করি। তারপর সে এসে বলল, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের। আর এগুলো আমাকে দেওয়া উপহার। সে তার বাপের ঘরে অথবা মায়ের ঘরে বসে দেখে না কেন, তাকে উপহার দেওয়া হয় কিনা? আল্লাহর শপথ! কেউ যদি অন্যায়ভাবে যাকাতের কোন মাল নিয়ে যায়, তবে সে তা কাঁদে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে।[২৩৫]

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা বোঝা যায় যে, বেতনভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উপহার গ্রহণ করা জায়িয নেই। কেননা এর পেছনে কোন অসদুদ্দেশ্য থাকাটা স্বাভাবিক।[২৩৬]

মজুতদারী ও কালোবাজারিঃ

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রেখে অস্বাভাবিকভাবে মুনাফা হাসিল করাকে শরীআতের পরিভাষায় 'ইহতিকার' বা মুজতদারী বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, "যেসব জিনিস আটকিয়ে বা মজুত রাখলে সর্বসাধারণের কষ্ট ও ক্ষতি হয়, তাকে ইহতিকার বা মজুতদারী বলে।"[২৩৭]

মজুতদারীর ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়, এজন্য ইসলামী শরীআতে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) মজুতদারকে পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[২৩৮]

অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট।[২৩৯]

তিনি আরো বলেন, "মজুতদার ব্যক্তি খুবই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। যদি জিনিসপত্রের দর হ্রাস পায়, তবে তারা চিন্হিত হয়ে পড়ে। আর যদি দর বেড়ে যায়, তবে আনন্দিত হয়।"[২৪০]

তিনি আরো বলেন, কেউ যদি মুসলমানদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে (মজুতদারী করে), তবে আল্লাহ তাআলা তার উপর মহামারী ও দারিদ্রতা চাপিয়ে দেন।[২৪১]

---

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
২৩৬. আল-হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৭০
২৩৭. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৫০
২৩৮. প্রাগুক্ত
২৩৯. প্রাগুক্ত
২৪০. প্রাগুক্ত
২৪১. আল-হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শামী (র.) বলেন, দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যদি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বিচারক বা আদালত মজুতদারকে খাদ্যশস্য বিক্রি কর দেওয়ার জন্য আদেশ জারী করেন। মজুতদার যদি হুকুম তামিল না করে, তবে বিচারক তার খোরাকী বাবদ খাদ্যশস্য রেখে বাকীগুলো বিক্রি করে দিবে। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য খরীদ করার মত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে বিচারক ক্রমশ তা বন্টন করে দিবে। পরে তাদের হাতে খাদ্যশস্য আসলে আদালত তাদের নিকট থেকে তা উসূল করে দাতার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অবশ্য কেউ যদি নিজের জমির ফসল হতে নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে রাখে, তবে তাতে কোন দোষ নেই।"[২৪২]

চোরাচালান:

১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনের ২ (ঠ) ধারা মোতাবেক কেবল অবৈধ পথে আমদানী ও রফতানীকে চোরাচালান বলা হয়। একই সাথে বৈধ পথে কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বেআইনী আমদানী ও রফতানীকেও চোরাচালান বলা হয়। চোরাচালান স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে হয়ে থাকে। চোরাচালান জাতীয় অর্থনীতি তথা দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। অধিকাংশ দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের উপর আবগারী শুল্ক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে এ শুল্ক তুলে নেয়া সম্ভব নয়। অথচ চোরাইকৃত দ্রব্যের উপর কোন আমদানী শুল্ক দিতে হয় না। এ সুযোগে বিদেশী পণ্য বাজার দখল করে নেয়। চোরাচালান পদ্ধতি অর্থনীতি ও শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন অন্তরায় তদ্রূপ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে। এ জন্যই ইসলামে চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২৪৩]

সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ:

সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা জঘন্য অপরাধ। ব্যক্তির অপরাধ ব্যক্তি ক্ষমা করে দিতে পারলেও সরকারী সম্পদ আত্মসাতের পাপ ক্ষমা করার অধিকার কারো নেই। কারণ সরকারী সম্পদের মালিক দেশের সকল মানুষ। কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, "কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তার নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।"[২৪৪]

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে খায়বর যুদ্ধে গমন করি। যুদ্ধে আমরা গণীমাত হিসেবে কোন স্বর্ণ-রৌপ্য লাভ করিনি, তবে খাদ্যবস্তু ও কাপড়-চোপড় লাভ করেছি। এরপর আমরা একটি মাঠে চলে যাই। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাঁর একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে গোলামটি উপহার দিয়েছিল। আমরা মাঠে পৌঁছে যখন কাফেলা থেকে অবতরণ করলাম তখন গোলাম উষ্ট্র বহরের সাথে অবস্থান করছিল। একদিক থেকে একটি তীর এসে তার দেহ বিদ্ধ হয় এবং তাতে সে মারা যায়।

---

২৪২. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৭

২৪৩. আল-কুরআন, ৩:১৬১

২৪৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২৩৪, পৃ. ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আমরা বলাবলি করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! লোকটির কতই না সৌভাগ্যে সে শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: কখনো নয়। আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় সে লম্বা চাদরটি আগুন হয়ে তার দেহ দগ্ধ করবে, যা সে খায়বর দিবসে গণীমাত বন্টনের পূর্বে গোপনে তুলে রেখেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ একথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং যার কাছে একটি কিংবা দুটি জুতার ফিতা ছিল তাও জমা দেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: একটি জুতার ফিতা কিংবা দুটি জুতার ফিতা এগুলোও আগুনের অংশ।"[২৪৫]

অপর এক হাদীসে আছে: "নবী (স.) একবার বনী আসাদের ইবনে লুতবিয়্যাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ প্রদান করেন। সে দায়িত্বপালন শেষ করে এসে বলল: এগুলো যাকাতের মাল আর এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী (সা.) মিম্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করে বললেন: আমি তোমাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটি জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে, এ হচ্ছে আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। তবে সে কেন তার পিতা কিংবা মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না যে, তাকে উপহার দেয়া হয় কিনা? আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি তার বিন্দুমাত্র কিছু খিয়ানত করবে সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয় তবে চিঁ চিঁ শব্দ করবে, গরু হলে হাম্বা হাম্বা করবে এবং ভেড়া কিংবা বকরী হলে ম্যা ম্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর হাত দুটো এত উপরে ওঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম এবং তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় তোমার নির্দেশ পৌছে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় তোমার নির্দেশ পৌছে দিলাম।"[২৪৬]

অপর এক হাদীসে আছে, "আমি তোমাদের মধ্যকার কাউকে যখন কোন কাজে নিযুক্ত করি আর সে আমাদের নিকট একটি সূঁচ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুও গোপন করে, তা নিশ্চয় আমানতের খিয়ানত হবে এবং তা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।"[২৪৭]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করে যে সম্পদ উপার্জন করা হয় তা কোনক্রমে বৈধ নয়।

চাঁদাবাজীর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ:

চাঁদাবাজিসহ জবরদস্তিমূলক সব ধরনের সম্পদ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা উঠায় তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয় তদ্রূপ যে পথে তা ব্যয় করে, তাও অনেক ক্ষেত্রে বৈধ পথ নয়। সম্পদের মালিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে চাঁদা প্রদান করে কেবল তাই হালাল। মহানবী (স.) বলেন, "সাবধান" তোমরা কেউ কারো প্রতি যুলুম করবে না। সাবধান! কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হালাল নয়।[২৪৮]

২৪৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৯৭, পৃ. ২০৪

২৪৬. ইমাম মুসলিম: সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৩৯, পৃ. ১০০৭

২৪৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ, বায়তুল আফকার আদ-দাওলিয়া, রিয়াদ-১৪১৯/১৯৯৮, হাদীস নং-২০৯৭১, পৃ. ১৫১৮

২৪৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. হাদীস নং-২৮৩, পৃ. ৬৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র-প্রশাসনের যে ব্যক্তি যে পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন কোন প্রকার অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা ইসলামে হালাল নয়।

লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন:

ইসলামে ধোঁকা ও প্রতরণা কোনটাই হালাল নয়। মহানবী (স.) ক্রয়-বিক্রয়সহ ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল পর্যায়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে তার কুফল সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হাদীসে আছে: "একবার রাসূলুল্লাহ (স.) বিক্রয় করার জন্য স্তূপীকৃত খাদ্যবস্তুর একটি স্তূপের নিকট দিয়ে গমনকালে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাত কিছুটা স্যাঁৎস্যাতে ভাব অনুভূত হলো। তখন তিনি বিক্রেতাকে বললেন: হে খাদ্য বিক্রেতা! এ কি, ভেজা কেন? লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। নবী (স.) বললেন: তুমি ভেঁজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকজন তা দেখে নিতে পারে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[২৪৯]

ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া এবং বেশি গ্রহণ করা উভয়ই অপরাধ। এর মাধ্যমে ক্রেতাকে ঠকানো হয় অথচ ক্রেতা মনে করে, সে তার প্রাপ্য অধিকার যথার্থই লাভ করেছে। এ অপরাধ সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আল্লাহতা'আলা বলেন: "মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"[২৫০] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন; "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে ওজন করে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে আর যখন তাদের জন্য মেপে কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[২৫১]

মহানবী (স.) মদীনায় আবু জুহায়লা নামক এক ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পান যার ব্যবসা কেন্দ্র সাধারণকে মেপে দিত। তার প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। উল্লেখ্য যে, যে সমাজে মাপে কম দেয়ার খিয়ানত চলে, সেখানে আল্লাহ দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন এবং ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেন। ওজন ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে নবী (স.) বলেন: "তোমাদের উপর এমন দুটি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যাতে (ত্রুটি করার অপরাধে) তোমাদের পূর্বেকার অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে।"[২৫২]

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি মাপে কম দেয় সে প্রকৃতপক্ষে লোক চক্ষুর অন্তরালে চুরি করে এবং হারাম উপার্জন করে। শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান না করাও একই ধরনের অপরাধ। হযরত শু'আইব (আ.)-এর উম্মাত ওজনে কম দেয়ায় তাদের উপর ভূমিকম্প নেমে আসে। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

---

২৪৯. আল-কুরআন, ২৬:১৮১—১৮৩

২৫০. আল-কুরআন, ৮৩:১—৩

২৫১. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২১৭, পৃ. ১৭৭৩

২৫২. আল-কুরআন, ১৭:৩২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন: পাশ্চাত্যে ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসাবে গণ্য করা হয়। তারা ব্যভিচারীদেরকে Sex Worker (যৌন কর্মী) বলে আখ্যায়িত করে। একর্ম তাদের অন্যান্য পেশার ন্যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। ইসলামে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এতে অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[২৫৩]

মহানবী (স.) বলেছেন, "ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত আয় অপবিত্র।"[২৫৪] শুধু ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারামই নয় বরং অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়ায় এমন সব পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যও হারাম। যেমন-সিনেমার অশ্লীল পর্ণোগ্রাফী, বই-পুস্তক, উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ ছবি- পোস্টার প্রচার, অশ্লীল নাচ-গান ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[২৫৫] সুতরাং কোন অবস্থায় ব্যভিচারকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হালাল নয়।

মাদক দ্রব্যের ব্যবসা:

মাদক দ্রব্যের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার, উৎপাদন, পরিবহণ ও বিপণন এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[২৫৬] হাদীসে আছে, "প্রত্যেক নেশাদার বস্তু মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম।"[২৫৭]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা যেমন মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তদ্রূপ তার ব্যবসা করাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ যে বস্তুর পানাহার ইসলামে নিষিদ্ধ তার ব্যবসাও ইসলামে নিষিদ্ধ। গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন, মরফিন, পেথিডিন, সিডাকসিন, মারিজুয়ানা, ফেনসিডিল, কোকেন, ইয়াবা, এলকোহল-এসবই মাদকদ্রব্যের অন্ত র্ভুক্ত। কাজেই এসব দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থ-উপার্জন করা হারাম। একই সাথে মদ প্রস্ত তকারক প্রতিষ্ঠানে চাকরী ও মদ জাতীয় বস্তু উপহার ইসলামে বৈধ নয়। তাই মহানবী (স.) বলেছেন: "মদের নির্যাস বেরকারী, প্রস্তুতকারক, পানকারী, পরিবেশক, আমদানীকারক, যার জন্য আমদানী করা হয়, বিক্রেতা, ক্রেতা, সরবরাহকারী, লভ্যাংশ ভোগকারী মদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই দশ শ্রেণীর লোক অভিশপ্ত।"[২৫৮] মোটকথা, মাদকদ্রব্যের ব্যবসাসহ মদজাতীয় বস্তু দ্বারা কোন প্রকার উপকার হালাল নয়।

সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কুটিল কারসাজির মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। এতে ক্রেতা সাধারণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও সুনাম নষ্ট হয়। তাই এ পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বভোগী বলতে একটি গোষ্ঠী আছে। এদের কারণে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণী প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য ইসলাম এহে প্রক্রিয়ায় সম্পদ অর্জনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাজেই এমন কোন কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা ইসলাম সম্মত নয় এবং যা মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনে।

---

২৫৩. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০০৯, পৃ. ৯৫০
২৫৪. আল-কুরআন, ২৪:১৯
২৫৫. আল-কুরআন, ৫:৯০
২৫৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২১৯, পৃ. ১০৩৬
২৫৭. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯৫, পৃ. ১৭৮১
২৫৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬, পৃ. ৬৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ও ক্ষেত্রসমূহ

* ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা
* ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ
* যাকাত
* ওশর
* মীরাস ও উত্তরাধিকার সম্পদ
* অসিয়্যত
* ওয়াকফ
* সাদাকাতুল ফিতর
* মোহর ও নাফাকাত
* কাফফারাহ ও ফিদিয়া
* উদহিয়া, আকীকাহ্ ও নযর
* হিবা ও সাদাকাহ
* জারার ও মিনাহ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা:

ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় করা, যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে। কুরআনে 'ইনফাক' সম্পর্কে বলা হয়েছে, "লোকেরা আপনাকে কী ব্যয় করবে (ইনফাক) সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; আপনি বলুন, যা ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারী মুসাফিরদের জন্য।[১]

"লোকের আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত তা।"[২]

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা থাকে। আল্লাহ যাকে চান এরূপ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৩]

"যারা আল্লাহর পথে ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৪]

"শোন হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে এবং তা থেকে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই; কিন্তু তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ করবে না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৫]

"যারা নিজেদের ধন-দৌলত রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৬]

"যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না, শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কতনা মন্দ।"[৭]

" আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করে না। তারা ছোট কিংবা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদের দিতে পারে।"[৮]

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।"[৯]

উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ তিনটি পন্থায় ব্যবহার করে। যেমন:

(১) মওজুদ বা সঞ্চয় করে; (২) বিনিয়োগ (Invsestment) করে; (৩) ব্যয় বা খরচ করে।

---

১. আল-কুরআন, ২:২১৫
২. আল-কুরআন, ২:২১৯
৩. আল-কুরআন, ২:২৬১
৪. আল-কুরআন, ২:২৬২
৫. আল-কুরআন, ২:২৬৫
৬. আল-কুরআন, ২:২৭৪
৭. আল-কুরআন, ৪:৩৮
৮. আল-কুরআন, ৯:১২১
৯. আল-কুরআন, ৯:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ-সম্পদ নিশ্চল সঞ্চয় বা জমা করে রাখাকে ইসলাম পছন্ধ করেনি। হালাল পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয়:

উপার্জিত অর্থ বৈধ পন্থায় ব্যয় করা ইবাদত। বৈধ পন্থায় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে-

১. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা;

২. স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতির ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা;

৩. পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের জন্য ব্যয় করা।

৪. ফরজ, ওয়াজিব ও নফল অবলিগেশনসমূহ পূরণে ব্যয় করা।

ফরজ-ওয়াজিব-নফল (Obligation) সমূহ		
ফরজ	ওয়াজিব	নফল
যাকাত	সাদাকাতুল ফিতর	সাদাকাতে নাফেলা
কাফফরাত	নাফাকাত	ওয়াক্ফ
ফিদিয়া	নজর-মানত	ওয়াসিয়াত
মোহর	আকীকা	জারাইর
	কুরবানী	মিনাহ্

৫. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজে ব্যয় করা।

৬. অভাবী-দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা।

৭. এরপরও সম্পদ থাকলে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তার সম্পদ ইসলামী মীরাসী আইন অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে। একজনের মালিকানা তার জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার ইনতিকালের পর যে সম্পদ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করা হয়ে যাবে।

অল্পে তুষ্টি:

ইসলামী ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ভোগ আচরণকে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসেবে গণ্য করে। অল্পে তুষ্টি ভাল। অনর্থক লালসা ভাল নয়। অনর্থক লালসার একমাত্র ফলাফল দুঃখ ও বঞ্চনা। অতিরিক্ত জীবনোপকরণ সংগ্রহের নাম সুখ নয়, সুখের সম্পর্ক মনের সাথে। মহানবী (স.) বলেন,"সফল সে ব্যক্তি যে ইসলামের পথ পেয়েছে এবং তার মোটামুটি রিযিকও আছে সে তাতে তৃপ্তও।"[১০]

---

১০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সহজ-সরল জীবনযাপনঃ

সহজ সরল জীবন যাপন ইসলামী মাকাসিদের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মানুষ, জীবন যাপন করতে হবে সহজ সরল সাদাসিধাভাবে। কোন প্রকার ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক জীবন স্টাইল ইসলাম অনুমোদন করে না। শরীয়ার লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেককে সহজ, সরল ও বিনীত জীবন-যাপন তথা সুশৃঙ্খল নেক জীবনের অধীন করে সকলের ফালাহ বা কল্যাণ নিশ্চিত করা। মহানবী (স.) জীবন ধারায় সহজ, সরল ও অনাড়ম্বরভাবে চলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদেরকে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ আমাকে অহী মারফত জানিয়েছেন যাতে কেউ অন্যের প্রতি কোন অন্যায় করতে না পারে এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে না পারে।'[১১] কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের জন্য সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, অসার দম্ভ এবং সম্মানের বৈষয়িক প্রতীকের জন্য সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা হারাম।[১২]

মধ্যপন্থা অবলম্বন করাঃ

একজন ইসলামী ভোক্তা ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হতে হলে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মহানবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।'[১৩]

ইসরাফ বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করা যাবেনাঃ

অপচয়, অপরিমিত ব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার করা, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা (Wastage)। ইসরাফ হলো হালাল খাতে এমন ব্যয় যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। হালাল সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা। যদি কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত করা হয়; তখন সেটা ইসরাফ হয়। অন্যকথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই সেটা ইসরাফে পরিণত হয়। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় 'ইসরাফ' অর্থ সীমা অতিক্রম করা বা অপচয় করা। মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই অপচয় করছে। কাজ না করে সময়ের অপচয় করছে, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার না করে অপচয় করছে। পানাহারে বা ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ভোগবাদী জীবনধারার অনুসরণ ফুটে উঠে। ইসরাফ না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তাগণ তাদের নজি নিজ মাসয়ালা অনুসরণ করার অজুহাতে ইসরাফের কবলে পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ নিজেদের উদর পূর্তি করতেগিয়ে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীর কথা ভুলে যেতে পারে। সামাজিক পর্যায়ে ইসরাফ সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, বন্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইনসাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও ইসরাফ পরিহার করবে। ব্যয়ের ইসলামী নীতিতে তাই আদর্শও কাম্য।

১১. ইমাম আবু দাউদ, সুনানু আবি দাউদ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২
১২. ইমাম সায়বানী, কিতাবুল কাসাব, খণ্ড ৩০, পৃ. ২৬৬–৬৮
১৩. প্রাগ্যক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাবজীর বা অপব্যয়:

হালাল সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় করা, অশ্লীল কাজে ব্যয় করা, ইসলামের ক্ষতিসাধনে ব্যয় করা। কোন বস্তুকে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যয় না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করলে, হারাম খাতে ব্যয় করলে, অপব্যবহার করলে, সেটাকে বলা হয় তাবজীর। ইসরাফের তুলনায় তাবজীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবজীরকারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

অবৈধ উপার্জন হতে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়; হালাল উপার্জন হতেও অবৈধ খাতে ব্যয় নিষিদ্ধ। এজন্যই ইসলামে তাবজীরকারী বা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করা হয় না। অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব-অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। এজন্য অপব্যয় বা তাবজীর ইসলামে অপরাধ।

বুখল বা কৃপণতা:

সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার না করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করা অত্যন্ত দূষণীয়। কৃপণতা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। ইসলামী জীবন বিধানে কৃপণতার কোন স্থান নেই। কৃপণতা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। বরঞ্চ তা সময়ের ক্ষতিই করে থাকে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বুখল বা কৃপণতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১. লালসা ও প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করণের স্পৃহাই কৃপণতার প্রধান কারণ।

২. দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কামনা ও কৃপণতার আরেকটি কারণ।

৩. সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনও কৃপণতার অন্যতম কারণ। সন্তান-সন্ততির জন্য ধন-সম্পদ রেখে যাওয়াকে অনেকে নিজের স্থায়িত্ব মনে করে; এ কারণে কৃপণতা দোষ তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠে।

৪. ধনাসক্তিও কোন কোন সময় কৃপণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কৃপণ ব্যক্তি হয় অত্যধিক লোভী। তারা ধন-সম্পদ কেবল জমা করতে থাকে। এ সম্পদ না তাদের নিজের কাজে লাগে, না অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় হয়। তারা কেবল প্রাচুর্যের হিসাব করে জীবন অতিবাহিত করে। ইসলামে বুখলকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলাম কৃপণকে পছন্দ করে না। কৃপণতা বড় ধরনের অপরাধ। ইসলামী অর্থনীতিতে বুখল নীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, অতিরিক্ত খরচ যেমন পছন্দনীয় নয়, তেমনি কৃপণতাও গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তার উৎপাদনশীলতা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার আবর্তন হয় না। এজন্য ইসলামে বুখল পরিহার করে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ

যাকাত:

যাকাত কি? যাকাত হল মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এর অনুকরণেই পরবর্তীকালে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধায়ক কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়।[১৪]

১৪. আব্দুস সামাদ, আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুঁথিঘর, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের শাব্দিক অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। যাকাত যাকাতদাতাকে পাপ ও কৃপণতা হতে পবিত্র করে। ধনের কিয়দংশ দ্বারা অবশিষ্ট ধন পবিত্র হয়। তাই মহানবীকে (স.) সম্বোধন করে আলাহ্ বলেন "তাদের ধন হতে সাদাকাহ্ (যাকাত) আদায় কর; এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দেবে।"[১৫] যাকাতের ফলস্বরূপ ধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে উলেখ আছে "তোমাদের মধ্যে যারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দান করে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।"[১৬] এতে বুঝা যায় যে, যাকাতই ধনের প্রাচুর্য ও বৃদ্ধির কারণ এবং তদুপরি যাকাত প্রদানে মানুষ আত্মশুদ্ধি লাভ করে। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ধনের যে নির্ধারিত অংশ আলাহর পথে ব্যয় করা মানবের উপর অবশ্যই কর্তব্য (ফরয) করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে।[১৭]

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়- "ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ কারও নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার চলিশ ভাগের এক ভাগ আলাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করার প্রথাকেই যাকাত বলা হয়।[১৮] অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকে যাকাত বলে। এটা ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। হাদীস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ একবছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরয হয় না।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের অন্যতম। ইসলামে সালাত বা নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। কেননা, আল-কুরআনে বহু আয়াতে নামায ও যাকাতের কথা একই সঙ্গে উলে-খিত হয়েছে, "আর নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় কর এবং প্রণতিকারীদের সাথে প্রণতি জানাও।" "নামায রীতিমত পালন করতে থাক এবং যাকাত প্রদান করতে থাক এবং আল-াহ্ তায়ালাকে উত্তমরূপে করজ প্রদান কর।[১৯]

যাকাত দরিদ্রের প্রতি ধণীদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত অনুগ্রহ নয়। এটা আবশ্যিক দরিদ্র কর। এটা আলাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য ও একটি ইবাদত, মানুষকে পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর দ্বারা দ্বিবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। প্রথমতঃ যাকাত প্রদান করে যাকাত আদায়কারী পাপ, ধনলিপ্সা এবং ধনের প্রতি আসক্তি হতে উদ্ভূত চারিত্রিক রোগসমূহের দোষ হতে অব্যহতি পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ দীন-দরিদ্র, অনাথ, শিশু, বিধবা নারী, বিকলাঙ্গ; উপার্জনে অক্ষম নারী-পুরুষ, ফকীর, মিসকিন প্রভৃতি যারা জীবন ধারণোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে অসমর্থ, জাতির এমন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা তদ্বারা লালিত-পালিত হয়ে থাকে। যাকাতদাতার কল্যাণ সাধনই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল আনুষাঙ্গিকভাবেই সাধিত হয়ে থাকে। এ জন্যই কোন স্থানে,

কোন সময়ে অনাথ, বিধবা, ফকীর, মিসকিন প্রভৃতি না থাকলেও ধনীদের প্রতি যাকাত প্রদানের আদেশ সমভাবে বলবৎ থাকবে।[২০]

---

১৫. আল-কুরআন, ৯:১০৩

১৬. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

১৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪৫

১৮. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২৫২

১৯. আল-কুরআন, ৭৩:২০

২০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের নিসাব (পরিমাণ):

নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ অথবা অর্থের অধিকারী হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয় এবং যা অপেক্ষা কম হলে যাকাত ফরয হয় না, ঐ পরিমাণ সম্পদকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।[২১] যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয় সে ব্যক্তিকে ফিকহ এর পরিভাষায় 'সাহেব-এ-নিসাব' বা যাকাতদাতা বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ বা নগদ টাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব।[২২] এ পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট পূর্ণ এক বছর থাকলে সে সব সম্পদের $\frac{১}{৪০}$ অংশ যাকাত প্রদান করা ফরয। নিসাবের কম হলে এবং এক বছর পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হয় না।

বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের নিসাব :

স্বর্ণ ও রৌপ্য:

খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য যে কোন আকারে থাকুক না কেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের হোক বা না-হোক প্রকৃতিগত কারণেই উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং এগুলোর মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হলেই যাকাত আদায় করতে হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে পিন্ড আকারে রক্ষিত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন, অলংকার-এসব তৈরীর মূল্যসহ হিসেব করে শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।[২৩]

নগদ অর্থ:

নিজের কাছে বা ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ অর্থ বলে গণ্য হবে। এছাড়া পূর্বের বকেয়া পাওনা ঋণ, চলতি বছরে দেয়া ঋণ এসবকেও নগদ অর্থের মধ্যে ধরে যাকাত হিসেবে করতে হবে। তবে যে সব ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই সেগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। তবে এসব ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে এর যাকাত দিতে হবে। প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় যেহেতু সুদ আছে সে জন্য ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়, জীবন বীমা সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থের মধ্য থেকে সুদ পৃথক করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে এবং বাকী অংশের ওপর যাকাত দিতে হবে।[২৪] প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে সুদ ও মূল অর্থের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম পালন করতে হবে। পেনশন বাবদ প্রাপ্য অর্থও হিসেবে ধরতে হবে।

ব্যবসায়ের মালামাল:

ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামালের যাকাত নিরূপণকালে বছর শেষে হিসেব সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার ওপর যাকাত দিতে হবে। সমাপ্তি দিবসে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর যে স্থিতিপত্র (Balance Sheet) তৈরী করা হয়, এতে সাকুল্য দেনা-পাওনা যথা: মূলধন, সম্পদ, চলতি মূলধন, অর্জিত মুনাফা, ক্যাশে এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ, দোকান এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন মাল, প্রস্তুতকৃত মাল,

---

২১. মাওলানা মুনতাছির আহমাদ রহমানী, যাকাত দর্পণ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৯

২২. ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

২৩. মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, যাকাত কী ও কেন? ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১২–১৩

২৪. ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ, দেনা ও পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসেবে আনতে হবে। এ সবের মধ্য থেকে স্থায়ী মূলধন সামগ্রী যেমনঃ মেশিন, দালান, জমিসহ ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিটকৃত মাল এবং অন্যান্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের ওপর যাকাত হিসেব করতে হবে। যে সব পাওনা ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই সেগুলো পাওয়ার পর যাকাত দেয়ার শর্তে বাদ রাখা যেতে পারে বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রীত জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদও হিসেবে নিতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে।[২৫] কেননা, এসব দ্রব্য উৎপাদনশীল; যন্ত্রপাতির মালিক তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম। তাছাড়া কোন ব্যক্তির একাধিক ব্যবসা থাকলে এবং তার পরেও সোনা-রূপা, মূল্যবান পাথর, নগদ অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি থাকলে এ সম্পরে হিসেবের যোগফলের ভিত্তিতে যাকাত নিরূপণ করতে হবে। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে হিসেব করা যাবে না।

কৃষি ফসলঃ

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণীর ফসলের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে হিসেব করে যাকাতযোগ্য পরিমাণ ফসল হলে যাকাত বা ওশর দিতে হবে। যেমন- ধান, পাট যদি সাড়ে ২৬ মণ বা তার বেশী হয়, তাহলে ফসল তোলার সময়েই তার যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে কলাই, সরিষা, মধু ইত্যাদি প্রত্যেকটির নিসাব পৃথকভাবে ধরতে হবে।

খনিজ সম্পদঃ

খনিজ সম্পদেরন ক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই। খনি যদি ব্যক্তি মালিকানায় থাকে সম্পদ উত্তোলনের পরই হিসেব করে এর যাকাত দিতে হবে। তবে খনি সরকারী মালিকানায় থাকলে এর যাকাত দিতে হবে না। খনিজ সম্পদের যাকাতের হার শতকরা ২০ ভাগ।

পশু সম্পদঃ

গরু-মহিষঃ নিজের কাজে খাটে এবং বিচরণশীল (সায়েমা) নয় এমন গরু/মহিষ বাদ দিয়ে ৩০টি গরু-মহিষ হলেই তার ওপর যাকাত দিতে হবে। প্রতি ৩০টি গরুর জন্য এক বছর বয়সের একটি গরু এবং প্রতি ৪০টি বা তার অংশের জন্য দুই বছর বয়সের একটি গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

ছাগল-ভেড়াঃ

ছাগল/ভেড়ার সংখ্যা ৪০টি হলে ১টি, ১২০টি পর্যন্ত ২টি, ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি এবং এর অধিক ১০০ ও তার অংশের জন্য আরও ১টি করে ছাগল যাকাত প্রদান করতে হবে।

উটঃ উটের নিসাব ৫টি। প্রতি ৫টি উটে ১টি করে ছাগল ভেড়া যাকাত দিতে হবে। কিন্তু উটের সংখ্যা ৪৪ হলে ১টি ১ বছরের উট-শাবক যাকাত দিতে হবে।[২৬] সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এ হারে যাকাত দিতে হবে।

ঘোড়াঃ হযরত উমর (রা.) ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর পূর্বে ঘোড়ার ওপর কোন যাকাত ছিল না। ঘোড়া যদি যানবাহন, বোঝা-বহন বা জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা না হলে ঘোড়ার মূল্য ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার বেশী হলে তার ওপর শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে।[২৭]

---

২৫. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, সহীহ্ বুখারী, কুতুব খানা রশিদীয়া, দিল্লী-১৪০৯, হি., পৃ. ২২৮

২৬. প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।

২৭. মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতমুক্ত সম্পদঃ

যাকাতমুক্ত সম্পদ সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন, "বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহণের পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফলসমূহ যা বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্প দিনে বিনষ্ট হয়ে যায়, যথাঃ আম, পেঁপে, শসা, তরমুজ, খরবুজা, বাঙ্গী, লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই।[২৮] হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথাঃ বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশ ব্যতীত অন্য সমস্ত সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে সেগুলো হলঃ

১. জমি;

২. মিল, ফ্যাক্টরী, ওয়্যার হাউজ, গুদাম ইত্যাদি;

৩. দোকান

৪. বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি;

৫. এক বছরের কম বয়সের গবাদি পশু;

৬. ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক;

৭. বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী;

৮. গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্ট্যাম্প;

৯. অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জাম;

১০. গৃহপালিত সকল প্রকার মুরগী ও পাখি;

১১. কলকজা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী;

১২. চলাচলের জন্তু ও গাড়ী;

১৩. যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম;

১৪. ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য;

১৫. বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ;

১৬. যাকাত বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরের মধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ;

১৭. দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত;

১৮. সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য সম্পদ;[২৯]

উপরন্তু মূল্যবান সুগন্ধি, মণি মুক্তা, লোহিত-বর্ণ প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে আহৃত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর যাকাত নেই। যে সমস্ত পশু ও বাহন ভাড়ায় খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হয় না।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহঃ ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেবলমাত্র স্বাধীন পূর্ণ বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। যেমন-

---

২৮. বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত।

২৯. মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের ওপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা:

সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। মালিকানা বলতে সম্পদ মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের ওপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করাকেই বোঝায়। যে সব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয় তার ওপর কোন যাকাত নেই। যেমন: সরকারী মালিকানাধীন ধন-সম্পদ। অনুরূপভাবে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াক্ফ্কৃত সম্পদের ওপররেও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াক্ফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয় তবে তার ওপর যাকাত দিতে হবে। যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই তার ওপর যাকাত ধার্য হবে না।

সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া:

যাকতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার আবশ্যক নয়, বরং সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। যেমন: গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কৃষিজাত ফসল, খনিজ সম্পদ, মধু, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল।[৩০] তাই এ সবের ওপর যাকাত ধার্য হবে। যে সকল মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয় সে সবের ওপরে যাকাত অপরিহার্য নয়। যেমন: বাসন-কোসন, বাড়ি, গাড়ি, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, চলাচলের বাহন, মাটির নীচে প্রোথিত সম্পদ যার হদিস জানা নেই।

যাকাতযোগ্য পরিমাণ সম্পদ থাকা:

যাকাত ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। শরীয়াত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। সাধারণত সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারও নিকট সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা উভয়টি মিলে সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উট ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা:

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হয়। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "লোকজন আপনার নিকট জানতে চায়, তারা আলাহর পথে কি ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আলাহ্ এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন।"[৩১] হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, "অতিরিক্ত বলতে পরিবারের ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বোঝায়।"[৩২] ইউসুফ আল কারযাভীর মতে, "স্ত্রী-পুত্র, পরিজন ও পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের ভরণ-পোষণও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত।"[৩৩]

---

৩০. ড. এম.এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৩১. আল-কুরআন, ২:২১৯

৩২. উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩৩. ইউসুফ আল-কারজাভী (অনু. আব্দুল কাদির), ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

ঋণমুক্ত হওয়া:

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা নিসাব তার চেয়ে কম হয় তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধ করার পর বা ঋণের পরিমাণ সম্পদ বাদ দেয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল তার ওপর যাকাত ধার্য হবে। কেউ কেউ বলেন যে, যে ঋণ কিস্তিতে শোধ করতে হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে যে বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে সে বছর সেই পরিমাণ ঋণ বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর ঋণ পরিশোধ অবশ্যই করতে হয়। অন্যথায় সে সম্পদের ওপর যাকাত দেয়া উচিত।

সম্পদ এক বছর থাকা:

কারও নিকট কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর হাতে থাকলেই কেবল সে সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (ওরশ) প্রতিটি ফসল তোলায় সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসেব সমাপ্তির দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে (Balance Sheet) বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসেব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত:

অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাত:

ধন-সম্পদের মালিক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার আইনানুগ অভিভাবককেই তার সম্পদের যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

যৌথ মালিকানাধীন যাকাত:

যৌথভাবে যদি একাধিক লোক কোন সম্পদের মালিক হয় তবে তাদের প্রত্যেকের সম্পদে নিজ নিজ অংশের জন্য যাকাত পরিশোধ করতে হবে, অবশ্য যদি তার অংশ নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেমী হয়। সম্পদের এই অংশ তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করে যদি নিসাবের শর্ত পূরণ হয় তবে তাকে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তির যাকাত:

নির্ধারিত যাকাত আদায় পরিশোধের পূর্বেই সম্পদের মালিক মারা গেলে তার ওয়ারিস বা উত্তাধিকারীগণ অথবা তার অছি কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা এবং কোন ঋন থাকলে তা পরিশোধ করে অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তাধিকারীরে মধ্যে বন্টন করবেন।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত:

মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে যদি সম্পদ ন্যস্ত করা হয় তাহলে মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ককে সে সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

বিদেশে অবস্থিত সম্পদের যাকাত:

কারও সম্পদ যদি বিদেশে থাকে আর সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে তার উপরও তাকে যাকাত দিতে হবে। তবে সে দেশের সরকার ইসলামী হলে এবং উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। সম্পদ দেশে আর সম্পদের মালিক দেশের বাইরে থাকলে মালিকের প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ থেকে যাকাত দেবেন।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ:

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদারগণ হল (১) দরিদ্র, (২) নিঃস্ব, (৩) যাকাত সংগ্রহকারী ও বিতরণকারী, (৪) নওমুসলিম, (৫) দাস মুক্তির জন্য, (৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, (৭) আলাহর পথে সংগ্রামকারী, (৮) বিপদগ্রস্ত পথিক।[৩৪]

বস্তুতঃ আল-কুরআনে বর্ণিত এ আট শ্রেণীর লোকই কেবল যাকাতের দাবিদার। এ খাতসমূহের বাইরে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করার অধিকার কারো নেই।আয়াত থেকে বুঝা যায় আট শ্রেণীর লোক যাকাতের হকদার। তারা হলেন:

১. ফকীর:

ফকীর সেই ব্যক্তি যার নিসার পরিমাণ সম্পদ নেই। যে রিক্তহস্ত, অভাব মেটানোর যোগ্য সম্পদ নেই সে-ই ফকীর। ভিক্ষুক হোক বা না-হোক এরাই ফকীর। যে-সকল স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্র মুসলমান যথাসাধ্য চেস্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাত্যহিক ন্যায়সঙ্গত প্রযোজনটুকু মেটাতে পারে না তারাই ফকীর। অন্য কথায়- যাদের নিকট অভাব মোচনের যোগ্য সম্পদ থাকে না এবং যারা অতিকষ্টে অভাবের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করে, কিন্তু কারো নিকট কিছু ভিক্ষা করে না তারাই ফকীর।[৩৫]

২. মিসকীন:

মিসকিন হলো সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই। যে-সব লোকের অবস্থা এমন খারাপ যে, পরের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয়, নিজের পেটের আহারও যারা যোগাতে পারে না, তারা মিসকীন। যারা সক্ষম কিন্তু বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, হযরত ওমর তাদেরকেও মিসকীনের মধ্যে গণ্য করেছেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "মিসকীন সেই ব্যক্তি যে ভিক্ষা করে দু' এক গ্রাস আহার কিংবা দু' একটি খেজুর পেলেই চলে যায়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে, যে নিজের অভাব মোচনের সামর্থ্য রাখে না অথচ নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করে লোকের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায় না।"[৩৬]

৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী:

যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী যাকাত তহবিল হতে বেতন পাবে। এসব কর্মচারী নিজেরা ফকীর-মিসকীন না হলেও এমন কি বিপুল সম্পদের মালিক হলেও তাদের বেতন-ভাতা যাকাত ফান্ড থেকে দেয়া হবে।

৪. মন জয় করার জন্য:

দু'ধরনের লোক এ শ্রেণীভুক্ত। প্রথমতঃ যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তাদেরকে প্রকাশ্যে প্রকাশ্য মুসলিম দলভুক্ত করে নেয়ার জন্য যাকাতের অংশ প্রদান করা। দ্বিতীয়তঃ নবদীক্ষিত মুসলিম যাদের অন্তর ইসলামে সুদৃঢ় হয়নি, যাকাত তহবিল হতে তাদেরকে প্রদান করা যাতে তারা প্রকৃত খাঁটি মুসলমান হয়। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো- যে-সব লোক ইসলামের বিরোধীতায় তৎপর, কিন্তু অর্থ দিয়ে তাদেরকে বিরোধীতা থেকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে। কিংবা বিজাতীয় এমন লোকদের অর্থ দিয়ে মুসলিমদের সাহায্যকারী বানানো অথবা এমন লোক যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু আশংকা হয় যে, অর্থ দিয়ে বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীতে ফিরে যেতে পারে- এসব লোকদের মন জয় করার জন্য স্থায়ী সাহায্য, স্থায়ী ভাতা বা সাময়িক সাহায্য দান করে তাদেরকে

---

৩৪. আল-কুরআন, ৯:৬০
৩৫. আল-কুরআন, ৯:৬০
৩৬. বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সমর্থক, সাহায্যকারী, অনুগত কিংবা অক্ষতিকর শত্রুতে পরিণত করা। এ ধরনের লোকদের যাকাত দেয়ার জন্য ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হওয়া জরুরী নয়, বরং তারা ধনী ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

৫. দাসত্ব মুক্তিঃ

দাসত্ব থেকে মুক্তি বা বন্দী থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। যে ব্যক্তি দাসত্বের শৃংখলে বন্দী এবং মুক্তি পেতে চায় তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যায়। উক্ত অর্থের বিনিময়ে সে মনিবের দাসত্ব হতে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। বর্তমান যুগে দাস প্রথার প্রচলন নেই। এ যুগে যারা অর্থাভাবে জরিমানা আদায় করতে না পেরে কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে বা যারা অর্থাভাবে মামলা পরিচালনা করতে পারছে না তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে।[৩৭]

৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধঃ

যে-সব লোক ঋণী অথবা ঋণ আদায় করার সম্বল যাদের নেই তাদেরকেও যাকাতের টাকা দ্বারা ঋণভার হতে মুক্তি দেয়া যাবে। তবে ঋণ শোধ করার পর যাকাত ফরয হতে পারে, এ পরিমাণ অর্থ তার কাছে না থাকলে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

৭. আল্লাহর পথেঃ

কুরআনে এ খাতের নাম বলা হয়েছে 'ফী সাবীলিল্লাহ্', যার অর্থ আলাহ্র পথে। 'আলাহ্র পথে' বাক্যটি অত্যন্ত ব্যাপক। তফসীরকারগণ এখানে 'আলাহ্র পথে' বলতে আলাহর পথে জিহাদ করার অর্থ দিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আছে সেখানে একে কায়েম রাখার জন্য যে-সব বিশাল কাজের আয়োজন করতে হয় সে-জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। মহানবী (সঃ) বলেছেন যে, "ধনী ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়, তবে ধনী ব্যক্তি যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়, তবে তাকে যাকাত দিতে হবে।"[৩৮] ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ইসলামকে শক্তিশালী করার কাজে অর্থ ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অমুসলিম সমাজ-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী ভাবধারায় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সফর, যানবাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এ-সব কাজে নিয়োজিত লোকজন নিজেরা সচ্ছল হলে এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্যের দরকার না হলেও যাকাত গ্রহণ করায় তাদের কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সকল শ্রম ও সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাকাত থেকে এককালীন বা নিয়মিত সাহায্য দেয়া যেতে পারে। যে-সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে সমাজে এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব অনেক বেশী।

৮. পথিক/প্রবাসীঃ মুসাফির বা প্রবাসী লোকের বাড়ীতে যত ধন-সম্পত্তিই থাকুক না কেন, পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে যাকাত তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই দিতে হবে।

---

৩৭. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (অনু. মাও. আব্দুর রহীম), যাকাতের হাকিকত, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ৫৪
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

যেসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারেঃ

আল-কুরআনে উলেখিত যাকারে হকদার ৮ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ৬ শ্রেণীর লোকই দারিদ্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাই দরিদ্র, অভাবী ও ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা, পুনবার্সন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে কাজ করা যেতে পারে তাহলোঃ

- যাকাত ফান্ড বা তহবিল থেকে দরিদ্র-অভাবী, দুঃস্থ নর-নারী, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, এতিম এবং অনুরূপ অসহায় লোকের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

- দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর সক্ষম অংশকে এমনভাবে পুনরার্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।

- মুসাফিরদের যাতে যাতায়াতের পথে কোন প্রকার কষ্ট করতে না হয় সে জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

- সঙ্গত কারণে যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য এমন সব ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তারা ঋণমুক্ত হয় বা ঋণগ্রস্ত হতে না হয়।

- ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হয়। এ জন্য গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

- দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা-সুবিধা দানের জন্য হাতপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী প্রভৃতি নির্মাণ করা।

- বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য নিয়মিত স্টাইপেন্ড, স্কলারশীপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে। মোট কথা, পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয়-বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে যে কোন দেশে দারিদ্র দূরীকরণের ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ওশর

ওশর আরবী শব্দ, অর্থ দশমাংশ, দরিদ্র সাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। ওশর ফরয। জমির সব ধরনের উৎপন্নের উপরই ওশর ফরয। ওশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অন্য কথায় যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সে ফসলের প্রত্যেকটি হতেই নিসাব পরিমাণ ফসল হলে ওশর আদায় করতে হবে। আদায়কৃত ওশর দারিদ্র্য বিমোচনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মহানবী (স.) এর সময় যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ওশর আদায় করতেন। তবে কোন কোন সময় ওশর আদায়ের জন্য পৃথক কর্মকতাও নিয়োগ করা হত। এ ধরনের কর্মকর্তাকে সাহিবুল ওশর বলা হত।

Dhaka University Institutional Repository

ওশর পরিচিতিঃ

যাকাতের বিধানবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষিজ পণ্যই এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ভূমি একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। মানুষের রিয্ক ও জীবন ধারনের মূল এবং স্থিতি স্থাপনের ক্ষেত্র। এটা যাকাত আইনেরও মূল ভিত্তি। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা অনন্য, অপূর্ব ও ইনসাফপূর্ণ। এ ভূমি ব্যবস্থারই অন্যতম দিক হলো উশর ও খারাজ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়ী মালামালের এক চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হয়। গবাদি পশুর জন্য ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ভূমির যাকাতের বিধান অন্যরূপ। কোন কোন অবস্থায় উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ দেয়া ফরয হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ ভাগ দিতে হয়। কিন্তু ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় সহজভাবে বলার জন্য 'উশর' শব্দটি দ্বারা এর বিশ্লেষণ করা হয়।

উশর ফরয হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আল-কুরআনে যা বলা হয়েছে, তা হলো-

(ক) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং তোমাদের এই ব্যয় করণে তার মধ্যে থেকে নিকৃষ্ট জিনিষের দিকে লক্ষ্য নিবন্ধ করো না; কেননা অবস্থা এই যে, তোমরা নিজেরাই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া তা কখনই গ্রহণ করবেনা। তোমরা অবশ্যই জানতে, আল্লাহ্ স্বতঃই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৩৯]

'আয়াতটির মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছেঃ ঈমানদার লোকদের উপার্জন অবশ্যই পবিত্র এবং হালাল হতে হবে। সে উপার্জন দু'প্রকার। (১) দৈহিক শ্রম, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে এবং (২) আল্লাহর জমির ফসল হিসেবে যা কিছু দান করেন। জমির ফসল লাভেও মানুষের শ্রম অপরিহার্য এতে সন্দেন নেই। কিন্তু তা শুধু শ্রম নিয়োগ করেই লাভ করা যায় না। এমনও হতে পারে যে, মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে জমিতে বীজ বপন করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফসল ফলল না। অথবা ফসল ফলল; কিন্তু তা পোকায় খেয়ে ফেলল কিংবা বন্যায় ভেসে গেল। বীজ দীর্ণ করে অংকুরোদম হওয়া ও ফসল ধরা একান্তভাব আল্লাহর উৎপাদন' বলা হয়েছে। এ দু'প্রকারের উৎপাদন থেকেই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে।[৪০]

আয়াতটির প্রথম অংশের দ্বারাই মানুষের যাবতীয় উপার্জনের উপর যাকাত ফরয প্রমাণিত হয়েছে। পালিত চতুস্পদ জন্তু ও নগদ সম্পদের ন্যায় ভূ-সম্পত্তির ফসল ও পণ্য দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয। আর আয়াতের 'তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু উৎপাদন করেছি' এ অংশ থেকে জমির ফসলের জন্য যাকাত বা উশর দেয়া ফরয প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ উশর দিতে হবে এবং উশর বাবদ মন্দ ও নিকৃষ্ট ফসল দেয়া যাবে না।

(খ) "তিনিই আল্লাহ্, যিনি নানা প্রকারের লতা-গুল্ম, যা ঝাঁকা দিয়ে উঁচুতে তুলে রাখা হয় এবং যার জন্য তা করতে হয় না, যা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, এইরূপ বৃক্ষরাজি সংলগ্ন বাগান রচনা করেছেন; যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়; যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন-যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সদৃশ হলেও বিভিন্ন স্বাদ সম্পন্ন। তোমরা এ সবের ফল থেকে খাদ্য হিসেবে যা কিছু গ্রহণ কর যখন তাতে ফল ও ফসল ধরবে। আর তা কাটাই-মাড়াই করার দিন তার উপর ধার্য আল্লাহর হক' দিয়ে দাও। তোমরা অবশ্যই সীমালংঘন করবেনা; কেননা, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না।"[৪১]

---

৩৯. আল-কুরআন, ২:২৬৭

৪০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪১. আল-কুরআন, ৬: ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

এখানে 'আর তা কাটাই-মাড়াই করার দিন তার উপর ধার্য আল্লাহর 'হক' দিয়ে দাও'-এ আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্ষেতের ফসল ও উৎপাদন আহরণ করার সময় এর একটা নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর হক হিসেবে আদায় করা ফরয এবং তা কাটার ও আহরণের সময়েই এ হক আদায় করা ফরয হয়ে যায়। এরই নাম উশর। হযরত ইবন আব্বাস (রা.), ইবন জরীর তাবারী, আল্লামা আবূ বকর 'জাস্সাস, ইমাম সুয়ূতী, আল্লামা মাহমুদ আলুসী প্রমুখ বিখ্যাত তাফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেছেন।[৪২]

সুতরাং উশর দেয়া যে ফরয তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, মহানবী (সা.) এর কথা ও কাজই তা করা অবশ্য দেয়া প্রমাণ করেছে। তা ছাড়া জমির সেচ ব্যবস্থার পার্থক্যের দরুন উশর বা অর্ধ-উশর দেয়া ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ফিকহবিদই সম্পূর্ণ একমত-ইজমা হয়েছে।"[৪৩]

আল-কুরআনের ন্যায় হাদীসেও উশর ফরয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স.) ফসল এবং ফলের যাকাত অর্থাৎ উশর দু'ভাবে নির্ধারণ করেছেন। যেসব জমিতে বৃষ্টির পানিতে শস্য উৎপাদিত হয়, তার জন্য উশর অর্থাৎ এক দশমাংশ। নানারূপ সেচের পানিতে উৎপাদিত জমির ফসলের উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ।

মহানবী (স.) বলেছেন, "যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে তা থেকে উশর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে। আর যেসব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে।"[৪৪] আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) বর্ণিত হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেনঃ "পাঁচ ওয়াসাক থেকে কম যে ফসল হবে তাতে যাকাত নেই।"[৪৫] আমর বিন দীনার বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) বলেছেনঃ "যে ফসলকে আকাশের পানি সিক্ত করে, তাতে উশর, আর যাকে বালতি ও রশি ইত্যাদির সাহায্যে সিক্ত করা হয়, তাতে উশরের অর্ধেক।"[৪৬]

---

৪২. আল্লামা ইমামুদ্দীন ঈসমাইল ইবন কাসীর, তাফসীর-ই-ইবন কাসীর, সুহাইল একাডেমী, লাহোর, ১৯৮৪ইং, পৃ. ১৮১

* ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসীরে কবীর (১৩ খন্ড), মিসর, ১৯৩৮ইং, পৃ. ২১৩

* আল্লামা ফকরুদ্দীন রাজী, তাফসীরে কবীর (১৩ খন্ড), মিসর-১৩৩৮ইং, পৃ. ২১৩

* আল্লামা আবূ বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন (৩য় খন্ড), মিসর-১৩১২ হিজরী, পৃ. ২১২–১৩

* হুমায়ন খান অনূদিত, ফারিশতা জ.দ. যায়াস, যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং, পৃ. ২০৩

* মুফতী মুহাম্মদ শফী, (মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত), ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-১৯৮৬ইং, পৃ. ১৬৫

৪৩. সায়িদ আহামাদ উরুজ কাদেরী, উশর ও যাকাত আউর সুদকে চান্দ মাসায়েল, মারকাযী মাকতাবায়ি ইসলামী, দিল্লী, পৃ. ১০২, ১০

৪৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুকঅরী, বুখারী শরীফ, কিতাবুল যাকাত।

৪৫. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারায (উর্দু), করাচী, পৃ. ২২৭

৪৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

উশর ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

উশর ফরয হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া। কেননা, উশরের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের দিকটিও নিহিত। এজন্য অমুসলমানদের উপর উশর ফরয নয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ভূমি উশরী হতে হবে। খিরাজী ভূমির উপর উশর ফরয হয় না।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে ভূমি থেকে ফসল লাভ করা। তবে কোন কারণে ফসল উৎপাদিত না হলে উশর দিতে হবে না। তা কোন প্রাকৃতিক কারণ হোক, অলসতা, অবহেলায় চাষাবাদ না করুক, পরিচর্যা বা রক্ষণা-বেক্ষণ না করার কারণে হোক, সর্বাবস্থায়ই উশরের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ফসল এমন জিনিস হতে হবে যা ভূমি হতে জন্মানো ও উৎপাদন করার প্রথা রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এর চাষ করে লাভবান হতে হয়। আপনা থেকে উৎপন্ন কোন ঘাস বা অকাজের গাছ-গাছড়া যদি কোন ভূমিতে হয়, তবে তার উশর হয় না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য যদি, ঘাস, বাঁশ জন্মানো হয় তবে তাতে উশর হবে। আর আপনা হতে কোন গাছ জন্মিলে তাতে উশর হয় না।[৪৭]

উশর ফরয হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। তাই ওয়াক্ফ করা জমিতেও উশর ফরয। এমনিভাবে যার নিজের কোন জমি নেই, সে কারো থেকে ঋণ বা ইজারা ও ভাড়া হিসেবে ভূমি গ্রহণ করে তাতে চাষাবাদ করে ফসল ফলালে উৎপন্ন ফসলের উশর আদায় করা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব হয়, যে ফসল লাভ করে। ভূমির মালিকের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় না।[৪৮]

এ থেকে এও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি তার জমি নগদ টাকায় ভাড়া দেয় তবে ফসলের উশর জমির মালিকের উপর ফরয হবে না। যে লোক ভাড়া বা লগ্নি নিয়েছে তাকেই উশর আদায় করতে হবে। কেননা সে-ই চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করেছে। এ মতের উপরই ফতোয়া হয়েছে।[৪৯]

কোন লোক ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করে তাতে চাষাবাদ করলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের উপরই উশর ফরয হবে। ব্যবসার যাকাত ফরয হবে না। উশরী জমির চাষাবাদের যদি বৃষ্টি ও পুকুর বা কুয়ার পানি দিয়ে সিক্ত করা হয় তবে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতেই উশর নির্ধারিত হবে। যেমন-বৃষ্টির পানিতে বেশি সিক্ত হলে উশর, আর পুকুর, কূপ ইত্যাদির পানিতে বেশি সিক্ত করা হলে অর্ধেক উশর দিতে হবে।[৫০] আর উভয় প্রকার পানিতে যদি সমান সমান সিক্ত হয় তবে অর্ধেক ফসলে উশর এবং অর্ধেক ফসলের আধা-উশর ফরয হবে।[৫১]

উৎপাদন খরচ বাবদ উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ বাদ দেয়ার পর যদি তার পরিমাণ ২৬ মণ বা তার অধিক হয় তবে উশর প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেছেন, মোট উৎপাদিত ফসলের উপরই উশর, আধা-উশর ওয়াজিব। চাষ, বীজ, বপন, শ্রমিক, সংরক্ষণ প্রভৃতি খরচ উশর আদায়ের পরেই নির্ধারণ করতে হবে। উশরের সাথে এসব খরচের কোন সম্পর্ক নেই।[৫২]

---

৪৭. আল বাদায়েউ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে, মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-৯৩

৪৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪

৪৯. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৫০. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, আল বাদায়েউ ২য় খন্ড, পৃ. ৬২

৫১. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, ইমদাদুল ফতওয়া-২য় খন্ড, পৃ. ৫৩ হতে উদ্ধৃত।

৫২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উশর ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত:

উশর জমির উৎপন্ন কৃষিজ সম্পদের যাকাত কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। কৃষিজ পণ্যই যাকাতের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, কৃষিপণ্যই যেমন মানুষের জীবন ধারণের মূল উৎস, তেমনি এটা আবার যাকাত দর্শনেরও মূল ভিত্তি। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। আর অন্যান্য ধন-সম্পদ যেমন- সোনা, রূপা, পশু এবং ব্যবসা পণ্যের ইসলামী বিধান মুতাবিক অপরিহার্য দেয়াকে যাকাত বলে। যাকাত ও উশরের আদায় করার বিধি-বিধানে বেশ পার্থক্য রয়েছে। তাই ইসলামে উশরকে যাকাত থেকে ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে-

(ক) উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়িতে এনে পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফসলের উশর দেয়া ফরয হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।[৫৩] এ পার্থক্যের কারণে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উশর ফরয হয়।

(খ) উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়।[৫৪] কিন্তু উশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(গ) উশর ফরয হওয়ার জন্য আকেল ও বালেগ অর্থাৎ সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল ব্যক্তির ফসলেরও উশর ফরয হয়, কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।[৫৫]

(ঘ) উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কারো জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল উপার্জন করে অথবা ওয়াকফকৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে উশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।[৫৬]

মোটের উপর, জমির বা জমির উৎপন্ন ফসলের মালিক শিশু, বালক-বালিকা বা পাগল হলেও ইমাম আবু হানীফার (র.) মতে তার জমির উৎপন্ন ফল-ফসল থেকে উশর অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। কেননা, ধন-সম্পদের যাকাত হচ্ছে বিশুদ্ধ ইবাদত; তাতে নিয়তের প্রয়োজন, যা একজন পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মালিকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু উশর এক দিক দিয়ে ইবাদত বটে; তবে তাতে 'খাদ্য সরবরাহের তাৎপর্য নিহিত। 'উশর' ইবাদত হওয়ার কারণে মালিকের শুধু মুসলিম হওয়া শর্ত, এ কারণে কাফিরের নিকট থেকে 'উশর' নেয়া যাবে না।

---

৫৩. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.) (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ), আল-হিদায়া (১ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৮ইং, পৃ. ১৮৫

৫৪. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৫৫. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৫৬. ইমদাদুল ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

উশরী ফসলঃ

পূর্বোক্ত সূরা আল বাকারাহ ও সূরা আল আন'আমের আয়াত ও নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যের আলোকে সব ধরনের উৎপাদনের উপর উশর ফরয। এসব আয়াতে ও হাদীসে বিভিন্ন ধরনের ফসলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম আবু হানীফা (র.) উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, জমিতে যেসব ফল-ফসল ও শাক-সব্জীর উৎপাদন হয় তার সব কিছুতেই আল্লাহর হক (উশর) এবং সেসব কিছু থেকেই আল্লাহর নির্দেশ মতই 'ইনফাক' করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফার (র.) এ মতের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কুরআনের উভয় আয়াতের সাধারণ ও নিঃশর্ত নির্দেশ। কেননা, তাতে জমির প্রকারভেদ বা ফসলের রকমারির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই করা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে নবী করীম (সা.)-এর হাদীস। তিনি ইরশাদ করেছেন 'আকাশের বর্ষণে যে জমি সিক্ত হয় এবং ফলও উৎপাদন করে, তাতেই উশর ধার্য হবে।" উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসের সাধারণ বা নিঃশর্ত বক্তব্যের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রা.) বলেছেন, জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, যা ফলিয়ে জমির প্রবৃদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয় এবং বাগানসমূহে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার সব কিছুতেই উশর ফরয, তার কোন স্থায়ী অর্থাৎ টিকে থাকা ফল হোক, আর নাই হোক। গম, বার্লি, কিসমিস ও খেজুর প্রভৃতি স্থায়ী থাকা ফল-ফসল, আর কাঁচা শাক-সব্জী, কাঁচা ফল, যেমন- পেঁপে, কঁচু, কুমড়া, শসা, ঝিংগা ইত্যাদি। নল-খাগড়া, ইক্ষু, বাঁশ ইত্যাদি সব কিছুতেই উশর ধার্য হবে।[৫৭] কিন্তু ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.) বলেছেন, "খেজুর, আঙ্গুর, গম, বার্লি, মটর, কলাই (বিভিন্ন প্রকারের ডাল), চাল ও অন্যান্য যা কিছু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কেবল তাতেই উশর-যাকাত ফরয। এগুলো ছাড়া অন্য কিছুতেই উশর ফরয নয়।[৫৮]

ইমাম আবূ ইউসুফের (রা.) মতে, 'উশরী' জমিতে উৎপন্ন এমন সব ফসলের উপরই কেবল উশর আরোপিত হবে, যা মানুষের নিকট সঞ্চিত ও সংরক্ষিত করে রাখা যায়। যেসব জিনিস সঞ্চিত করে রাখা যায় না, যেমন-শাক-সব্জী, চারা এবং ইন্ধন বা জ্বালানী এসবের উপর উশর নেই। যেসব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় না (নষ্ট হয়ে যায়), যেমন-তরমুজ, কাঁকরল, লাউ, খিরা, গাঁজর, বেগুন, বিভিন্ন তরি-তরকারী, তুলসী পাতা, নারারূপ সুবাসিত চারা এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের উশর নেই।"[৫৯]

তিনি আরও বলেন, "যে সব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় (নষ্ট হয় না), ওজনের পাত্রে ও পাল্লায় মাপা যায়, যেমন-গম, যব, ভুট্টা, ধান-চাল, অন্যান্য খাদ্য-শস্য, পাট, বাদাম, চাল গুঁড়া, আখরোট, পেস্তা, জাফরান, যয়তুন, ধনিয়া, জিরা, মিঠা জিরা, পেঁয়াজ, রসুন এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস জমিতে পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার অধিক উৎপন্ন হলে তার উশর বা উশরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হবে।"[৬০]

---

৫৭ ফারিশতা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২, ২০৩, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৫৮. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৫৯. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪ (আবুল হুসাইন আহামাদ (অনু. মাওলানা বদিউল আলম), আল-মুখতাছারুল কুদুরী মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯৫ইং, পৃ. ১২২)

৬০. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ আলু, মসুর, বুট, খেসারী প্রভৃতি ডাল, খেজুর,কিসমিস প্রভৃতি শুকানো ফল, এসবের উপর ও যাকাত ফরয, যদি তা পাঁচ ওয়াসাক বা তার বেশি উৎপন্ন হয়। এর কম হলে যাকাত ফরয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, "আখ ও বাঁশ উশরী জমিতে হলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে, কেননা আখ খাদ্য জাতীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। বাঁশ খাদ্য জাতীয় না হলেও এক মূল্যবান ও উপকারী জিনিস।"[৬১]

যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না, যেমন-জাফরান ও তুলা এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, "যখন এগুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়ে যাবে তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে।"[৬২]

যা হোক, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উপর্যুক্ত মতের সাথে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)- ও একমত। মণীষীত্রয়ের কেউই 'শাক-সব্জী ও লাউ জাতীয় ফল-ফসলে উশর দিতে হবে' একথা স্বীকার করতে পারেননি। উক্ত তিনজন মনীষী বলেছেন, নবী করীম (স.)-এ সব জিনিসকে উশর, অর্ধ-উশর ধার্য হওয়ার আওতার বাইরে রেখেছেন। কেননা এগুলো যেমন সংরক্ষণ করা যায় না, তেমনি সাধারণত ওজন করা বা পাত্র দিয়ে মাপাও হয়না। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে বলা হয়েছে, "হযরত মুয়াজ (রা.) নবী করীম (স.) এর নিকট পত্র লিখে শাক-সব্জী ও লতা-গুল্মের ফুল-ফল ও ঔষুধির 'উশর' দিতে হবে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, এসবে কিছুই ধার্য হয়নি।"

হাদীসটি ঈসা ইবনে তালহা (র.) কর্তৃক বর্ণিত এবং এর একজন বর্ণনাকারী হাসান। হাদীসবিদদের মতে, তিনি যয়িফ বা দুর্বল। শুবাও তাকে যয়িফ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মুবারক তাকে বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন, এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ্ হয়।[৬৩] কিন্তু সর্তকতার সাথে তা পর্যালোচনা করলে ঈসা ইবন তালহার বর্ণনাকে নেহাত অসহীহ বলেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ সম্পর্কিত বহু যুক্তি প্রমাণসহ দীর্ঘ আলোচনার পর মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেছেন, "এই দীর্ঘ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শাক-সব্জী পর্যায়ের ফসলে 'উশর' ধার্য না হওয়ার দলীলই অকাট্য। অথব ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হচ্ছে, শাক-সব্জীসহ জমির সকল উৎপাদনেই 'উশর' ধার্য হবে। মনে হয়, ইমাম আবূ হানীফার মত হাদীসে প্রমাণিত নীতির পরিপন্থী। কিন্তু একথা সত্য নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) হাদীসের ভিত্তিতেই তাঁর রায় ঘোষণা করেছেন।

বহু সংখ্যক হাদীসেই বৃষ্টির পানি পেয়ে জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, সাধারণভাবে তাতেই উশর ধার্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলোই তাঁর দলীল। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মূলত যাকাত-উশর উক্ত চার পাঁচ প্রকারের ফসলের (খেজুর, কিসমিস, গম ও বার্লি এবং ভুট্টা) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এসব হাদীসে সুস্পষ্টভাবে চারটি বা পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ হলেও এগুলো নিতান্তই দৃষ্টান্তমূলক। হাদীসে উক্ত চারটি জিনিসের পূর্বে 'মিসাল' শব্দটি উহ্য ধরতে হবে। এর অর্থ হবে এ ধরনের ফসলের উশর ধার্য হবে এবং তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করে দিতে হবে।'

৬১. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৬২. বুহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৬৩. আবূ ঈসা আল তিরমিযী (র.), তিরমিযী শরীফ (১ম খন্ড), পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ সাধারণ অবস্থায় খাদ্য হিসেবে গণ্য হওয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে এ ধরণের সব ফল ও ফসলের উপরই 'উশর' ধার্য হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাদৃশ্য (Similarity) গণ্য হওয়া উচিত পরিমাণ যোগ্যতা (Measurement), ওজনত্ব (Weight) ও সঞ্চয় যোগ্যতা ইত্যাদির দিক দিয়ে। কেননা, যাকাত ও উশর ধার্য হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ দ্বারা অর্জিত সচ্ছলতা-খাদ্য বা রসদ হওয়ার (Victuals) দিক দিয়ে নয়। অতএব জমিতে উৎপন্ন যে জিনিসই পরিমাণ করা যাবে (পাত্র বা গজ ফিতে দিয়ে) বা ওজন করা যাবে (যে কোন ওজন যন্ত্র বা দাড়িপাল্লা দিয়ে), সঞ্চয় করে রাখা যাবে এবং যা থেকেই অর্থ সম্পদ আহরণ করা যাবে, তাতেই উশর ধার্য হবে। এটিই হচ্ছে সুচিন্তিত মত।"[৬৪]

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী সব মতামত ও তাদের যুক্তি আলোচনার পর কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সব ধরণের ফসলেই উশর হবে বলে মত দিয়েছেন।[৬৫]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, 'মধু যদি উশরী জমিতে পাওয়া যায় বা আহরণ করা হয় তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে। আর খারাজী জমি, ময়দান, পাহাড়-পর্বত, বন, বৃক্ষাদি বা গুহায় পাওয়া গেলে কিছুই দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যেসব ফল, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা বা বনে-উৎপন্ন হয় তাতে উশর বা খারাজ নেই। অনুরূপভাবে নারিকেল, জ্বালানী কাঠ, ঘাস, ভূষি ও খেজুরের ডাল-পালা ইত্যাদিতে উশর নেই।"[৬৬]

ইমাম আবূ হানাফীর (র.) মতে, মধু অল্প হোক বা বেশি তাতে উশর ওয়াজিব হবে। তিনি এতে কোন নিসাব ধার্য করেননি।[৬৭] ইমাম যুহরী ইমাম আওযায়ী প্রমুখের মতেও মধুতে উশর দিতে হবে। কিন্তু ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহম্মদ (র.)-এর মতে, মধুতে কোন যাকাত নেই।[৬৮]

নিসাব বা পরিমাণঃ

কি পরিমাণ ফসলে উশর ফরয হবে এ নিয়ে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে। তবে কি পরিমাণ উশর আদায় করা ফরয হয় তার বিশ্লেষণে নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ভূমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে উশর (এক দশমাংশ) ফরয হয়। আর বড় বড় বালতি বা পাত্র দ্বারা কূপ হতে পানি উঠিয়ে যে ভূমিতে ফসল ফলানোর জন্য পানি সেচন করা হয়, তার ফসলের উশরের অর্ধাংশ উশর আদায় করা ফরয হয়। (বুখারী, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা)।

এটি একটি সাধারণ অর্থবোধক সহীহ হাদীস। এর সারারণ অর্থবোধকতা থেকেই ইমাম আবু হানীফা (র.) ও অন্যরা জমির ফসলে কোন নিসাব ধার্য করেননি। বরং যতটাই উৎপন্ন হোক; তাতে উশর বা উশরের অর্ধেক দেয়া ফরয। এমনকি তরি-তরকারী, শাক-সব্জী প্রভৃতি যেসব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় না, তাতেও যাকাত ওয়াজিব। কেবল ঘাস, বাঁশ ও নারিকেলে যাকাত নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[৬৯]

---

৬৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৬৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য, ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, (১ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৪৩১-৩৪)

৬৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৬৭. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৬৮. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

মূলত নিসাব নির্ধারণের দলীল খুবই সুদৃঢ়। মালেকী, শাফিঈ, হাম্বলী মাযহাবের সর্বসাধারণ ইমাম ও আলিমগণ এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান ফল ও ফসলে নিসাব নির্ধারণের পক্ষে। তাঁদের মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.), জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.), আবু আইউব আনসারী (রা.) প্রমুখ থেকে মারফু হাদীসগুলোই হলো তাঁদের দলীল। কেননা, নবী করীম (সা.) সহীহ হাদীসে পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে যাকাত নেই বলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে যাকাত নেই।' (বুখারী মুসলিম)

এসব দলিলের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফার (র.) শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (র.) বলেছেন, 'ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে, যমিন থেমে কম-বেশি যা কিছুই উৎপন্ন হবে তা থেকেই উশর বা অর্ধ-উশর আদায় করতে হবে। তবে আমরা তাঁর কথা এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। বরং নবী করীম (সা.) হতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করব। তিনি বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই।[৭০]

বস্তুত প্রথম হাদীসে সাধারণ হুকুম দ্বারা ফল ও ফসলে যাকাত ফরয করা হয়েছে। এখানে নিসাব নির্ধারণ করা হয়নি। অপর হাদীসে নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে নির্ধারণ করা হয়নি। অপর হাদীসে নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাঁচ ওয়াসের কমে যাকাত নেই। প্রথমটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক আর দ্বিতীয়টি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক হাদীস। তাছাড়া কেবল ধনীরাই যাকাত দিবে আর দরিদ্ররা তা পাবে এটাই শরীয়তের বিধান। নিসাব হচ্ছে ধনীদের ধনে নূন্যতম মাত্রা এবং যাকাতের সকল ক্ষেত্রেই নিসাব রয়েছে। ফসলেও নিসাব থাকাই যুক্তি। না হলে গরীবদেরকেও ফসলের যাকাত দিতে হবে। যা ইসলামের ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[৭১]

যা হোক, পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। তবে পাঁচ ওয়াসাক বলতে কত পরিমাণ বুঝাবে এ নিয়ে সর্বত্রই কিছুটা মতভেদ রয়েছে এক ওয়াসাকে ৬০ সা' হয়ে থাকে। ফতোয়া দেওবন্দের হিসেব মতে, ১ সা'র পরিমাণ ৩ সের। কিন্তু ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মতে, পাঁচ ওয়াসাকে আমাদের দেশী ওজনে প্রায় ১৭ মণ।[৭২] মাওলানা সায়্যিদ আহমদ উরূজের মতে ১৮ মণ ৩০ সের।[৭৩] আল্লামা ইউসুফ কারজাভীর মতে ৬৫৩ কেজি।[৭৪] পাকিস্তানের যাকাত ও উশর আইন প্রণয়নের সময় এ পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সর্বশেষ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পাঁচ ওয়াসাকে হবে ৯৪৮ কেজি বা সাড়ে ২৬ মণ। পাকিস্তানের যাকাত ও উশর আইন প্রণয়নে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা আলিমদের মতামত নেয়া হয়। কাজেই এ মতকে এ যুগের আলিমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও এ মতের উপর আমল করা উচিত হবে।[৭৫]

---

৬৯. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, ২১৪
৭০. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী, (১ম খন্ড), কিতাবুল হুজ্জাত আলা আহলিল মাদানী, ১৩৮৫ হি. হায়দ্রাবাদ, ভারত, পৃ. ৪৯৭
৭১. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৭২. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৭৩. সায়্যিদ আহমদ উরূজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৭৪. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭
৭৫. শাহ্ আব্দুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১ইং, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, সাহেবাইনের[৭৬] মতে, বিভিন্ন প্রকার ফসলের নিসাবের হিসেব আলাদভাবে করতে হবে। সব রকম ফসলকে যোগ করে নিসাব নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন-ধান, ছোলা, গম প্রভৃতি ফসল মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হয়েছে কিনা তা হিসেব করলে চলবে না। আলাদাভাবে মাপার পর ধান যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাতে উশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে ছোলা বা গম প্রভৃতি শ্রেণীর ফসল আলাদাভাবে মাপার পর নিসাব পরিমাণ হলে তাতে উশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে ছোলা বা গম প্রভৃতি শ্রেণীর ফসল আলাদাভাবে মাপার পর নিসাব পরিমাণ হলে তাতে উশর দিতে হবে। না হলে দিতে হবে না। তবে ভিন্ন জাতের ধান একসাথে সাদা ও লাল গম একসাথে এবং বিভিন্ন রকম ডাল একসাথে হিসেব করলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে উশর দিতে হবে। না হলে নয়।[৭৭]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অপর বর্ণনায় বলেছেন, "যদি কোন উশরী জমিতে আড়াই ওয়াসাক গম ও আড়াই ওয়াসাক যব উৎপন্ন হয়, তবুও তাতে উশর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি এক ওয়াসাক গম, এক ওয়াসাক যব, এক ওয়াসাক ধান, এক ওয়াসাক খেজুর ও এক ওয়াসাক কিসমিস উৎপন্ন হয় এবং সব মিলে পাঁচ ওয়াসাকে পূর্ণ হয়ে যায়, ততে তাতেও উশর দিতে হবে।"[৭৮]

আবার কোন ভূমির পানি সেচন যদি কিছু বৃষ্টির পানি এবং কিছু কূপের পানি দ্বারা করা হয়, তখন এক্ষেত্রে অধিক পানি যা থেকে লাভ হবে তদানুযায়ী বিধান হবে। অর্থাৎ বৃষ্টি-বাদল দ্বারা অধিক পানি সেচন হলে তখন উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ আদায় করা ফরয হয়। আর কূপ, খাল, বিল,পুকুর ইত্যাদি থেকে অধিক পানি সেচন হলে তখন উৎপন্ন ফসলের এক বিশমাংশ আদায় করা ফরয হয়। আর যে ভূমিতে বৃষ্টির পানি, কূপ বা খাল-বিলের পানি উভয় পদ্ধতিতে সমানভাবে সেচন করা হয়, সেক্ষেত্রে অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের প্রতি উশর (এক দশমাংশ) এবং দ্বিতীয় অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের প্রতি এক বিশমাংশ (নেসফে উশর) প্রযোজ্য হয়।[৭৯]

ফল শুকানোর পর এবং কৃষি ফসলের খোসা পরিষ্কার করার পর নিসাব হিসেব করতে হবে। তবে যা খোসাসহ পেষা ও গুড়ি করা হয় তা খোসাসহই হিসেব করতে হবে। যেমন-ধান মাড়িয়ে খড় ও আবর্জনা মুক্ত করে মাপতে হবে, চাল করতে হবে না। গম খড় মুক্ত করে মাপতে হবে।

যাকাত ব্যয়ের যে আটটি খাত উশর ব্যয়ের খাতও আটটিই। খাতগুলো হচ্ছে (১) ফকির বা দরিদ্রগণ (২) মিসকিনগণ (৩) যাকাতের তসিলদারগণ (৪) যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট (৫) দাসত্ব মুক্তিতে (৬) ঋণীগণ (৭) আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং (৮) মুসাফিরগণ।[৮০]

---

৭৬. ইমাম আবূ হানীফার (র.) বিখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানকে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়।

৭৭. আল্লামা কাসানী, বাদায়েউস সানীয়ে, ২য় খন্ড, মিসর, পৃ. ৬০ এর বরাতে অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৭৮. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৭৯. মুফতী মোহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৮০. আল-কুরআন, ৯:৬০

Dhaka University Institutional Repository

মীরাস বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদঃ

পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদেরই পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে একটা বিশেষ নিয়ম বা বিধান মাফিক বন্টিত হয়ে থাকে। এতে প্রত্যেক প্রতিপাল্য ব্যক্তি তার অভিভাবককে বা পৃষ্ঠপোষক পূর্বপুরুষদের তিরোধানের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পায়। ইসলামের মীরাসী আইন সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। তা কম হোক অথবা বেশী। এক নির্ধারিত অংশ।"[৮১]

মীরাস নারী-পুরুষ ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের হক। প্রাক্-ইসলাম আরব যুগে শিশু, নারী ও কন্যা সন্তানদেরকে মীরাসের অংশ দেয়া হত না। বর্তমান যুগেও কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা সন্তানের উত্তরাধীকার স্বীকৃতি নয়। কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রপিতার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হয় এবং অন্যদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ইসলাম এসব কুসংস্কারের বিলোপ সাধন করে পুত্র-কন্যা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ওয়ারিসকেই মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে।[৮২]

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিসের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ওয়ারিস যা লাভ করে সে তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে জীবন-যাপন করতে সে বাধ্য নয়। এর ফলে প্রত্যেকে তার অর্থ-সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা চালাতে পারে। ফলত সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। এর বিধি-বিধান কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ বিধি-বিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো, যদ্দারা বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

(ক) মৃতের রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তিই মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তি সাধারণত দু'ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়ঃ (১) তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। যেমন : পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারাদি ইত্যাদি। (২) বিষয় সম্পত্তি যেমনঃ জমি, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের মালামাল।

প্রাক্-ইসলামী যুগে এই উভয় প্রকার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো না। বরং প্রথম প্রকারের সম্পত্তি কোন কোন জাতি মৃতের সংগে কবরে রেখে দিত। কোন কোন সম্প্রদায় এগুলো একত্র করে আগুনে জ্বালিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ এগুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ মৃতের সংগে দাফন করত। এক ভাগ স্মৃতি হিসেবে ওয়ারিসগণ রেখে দিত আর একভাগ সৎকার কার্যে ব্যয় করা হতো।

ইসলামে এ ধরনের অপচয় স্বীকৃত নয়। বরং মৃতের দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত আদায়ের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তা তৈজসপত্রই হোক আর জমি-জমাই হোক সবই উত্তরাধিকার সম্পত্তিস্বরূপে গণ্য এবং কোন রকমের ব্যক্তিক্রম ছাড়া সবই ওয়ারিসদের মধ্যে নিয়মানুসারে অবশ্য বন্টনীয়।[৮৩]

---

৮১. আল-কুরআন, ৪:৭

৮২. আল-কুরআন, ৪:১১–১২

৮৩. সম্পাদনা পরিষদ, ফারাইজ বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা, সামায়েল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মীরাস কেবল নিকটাত্মীয়ের হক। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতের কোন নিকটাত্মীয় জীবিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ তার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। প্রাক্-ইসলামী যুগে এমন কি প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবকে পর্যন্ত আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। মৃতের পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করে তার সমুদয় সম্পত্তি দখল করা হতো। ইসলাম এ জুলুমের মূলোৎপাটন করে কেবল নিকটাত্মীয়কে মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে। একারণেই পিতার বর্তমানে দাদা ও পুত্রের বর্তমানে পৌত্র এবং এমনিভাবে পোষ্যপুত্র মীরাসের অধিকারী হয় না। বরং দত্তকের বিষয়টাই ইসলামসম্মত নয়। ইসলামে সন্তান বলতে ঔরসজাত সন্তানকেই বুঝায়।

(গ) মীরাস নারী-পুরুষ ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের হক। প্রাক্-ইসলামী আরবে শিশু, নারী ও কন্যা সন্তানদেরকে মীরাসের অংশ দেওয়া হতো না। এই আধুনিককালেও কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ম হচ্ছে, কেবল পিতার বড় পুত্রই সমুদয় সম্পদের মালিক হয় এবং অন্যদেরকে এর থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন এসব কুসংস্কারের বিলোপ সাধন করে পুত্র-কন্যা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ওয়ারিসকেই মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে।

(ঘ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিসের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন বহু সম্প্রদায় আছে যারা একান্নবর্তী পরিবারে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বরং তাদের আইনে এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সকলেই বাধ্য। পরিবারের সদস্যবর্গ তাদের সম্পত্তিতে যৌথভাবে মালিকানা লাভ করে। জমি, ইমারত ইত্যাদিতে সবাই অংশীদার থাকে। তাতে কারও স্বতন্ত্র স্বত্বাধিকার থাকে না। কেউ তার অংশ পৃথক করে ফেলার কিংবা ইচ্ছামত বিক্রি করার অধিকার রাখে না।[৮৪]

এরূপ যৌথ মালিকানার আবশ্যিক ব্যবস্থা ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের স্বাধীনতা ব্যাহত করে এবং তাকে নানারকম সংকটের নিগড়ে আবদ্ধ করে, যা হতে মুক্তি লাভের কোন উপায় তার থাকে না। ইসলাম এ ধরনের অহেতুক বাধ্যবাধকবতা পছন্দ করে না। কাজেই ইসলাম আবশ্যিক যৌথ মালিকানার কুপ্রথাকে বিলুপ্ত করে প্রত্যেককে তার অংশের মালিকানায় স্বাধীন করে দিয়েছে। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ওয়ারিস যা লাভ করে সে তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে জীবন-যাপন করতে সে বাধ্য নয়। এর ফলে প্রত্যেকে তার অর্থ-সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা চালাতে সুযোগ পায়। ফলত সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় ত্বরান্বিত।

উত্তরাধিকর লাভের শর্তাবলী: (উত্তরাধিকার লাভের শর্ত তিনটি)-

(ক) মুরিসের (ওয়ারিসগণ যার উত্তরাধিকার লাভ করে তার) মৃত্যু।

(খ) মূরিসের মৃত্যুকালে ওয়ারিসের জীবিত থাকা।

(গ) ওয়ারিস কোন সূত্রে উত্তরাধিকার পাবে তা জ্ঞাত হওয়া (প্রকৃতপক্ষে এটা উত্তরাধিকার প্রদানের শর্ত)।

---

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

মূরিসের মৃত্যুঃ

মূরিস যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত তার সম্পত্তিতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার এ স্বত্ব ও এখতিয়ার নিঃশেষ হয় মৃত্যু দ্বারা। তাই উত্তরাধিকার বন্টনের আগে মূরিসের মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত অবগতি লাভ করা অপরিহার্য। মূরিস যদি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার জীবিত বা মৃত্যুর বিষয়ে কিছু জানা না যায় তখন বিচারক তার ব্যাপারে ফয়সালা নেবে। লক্ষণাদির ভিত্তিতে বিচারক তার মৃত্যুর পক্ষে সিদ্ধান্ত দান করলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং তখন তার সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যাবে।

ওয়ারিসের জীবিত থাকাঃ

ওয়ারিস উত্তরাধিকার সূত্রে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। আর মালিকানা লাভের প্রধানত যোগ্যতা হচ্ছে জীবিত থাকা। মূরিসের কাছ থেকে ওয়ারিসের কাছে মালিকানা হস্তান্তর হয় মূরিসের মৃত্যুকালে। উত্তরাধিকার লাভের জন্য মূরিসের মৃত্যুকালে ওয়ারিসের জীবিত থাকা অপরিহার্য। এ মূলনীতির সংগে বহু মাসআলা সংশ্লিষ্ট। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার দেওয়া হবে কিনা, গর্ভস্থ সন্তান উত্তরাধিকার পাবে কি না। মৃত পুত্রের ঘরের নাতি-দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কি না (যদি ঐ দাদার পুত্র জীবিত থাকে) এবং বিবিধ আরও অনেক মাসআলা, যা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াঃ

উত্তরাধিকার লাভের সূত্রের বিভিন্নতার কারণে উত্তরাধিকারের অংশও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং হুকুমের মধ্যেও তারতম্য ঘটে। যেমন ভাই তিন রকমের হতে পারে। আপন, বৈমাত্রের ও বৈপিত্রেয়। এখন কেউ যদি দাবি করে যে, সে মৃত ব্যক্তির ভাই, তবে তার মীরাসপ্রাপ্তির জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং বন্টনকারীকে জেনে নিতে হবে যে, কী রকমের ভাই। কেননা এদের কেউ মীরাস পায় আসহাবুল ফুরূয হিসেবে, কেউ আসাবা হিসেবে আবার কেউ হয় বঞ্চিত। অতএব মীরাস বন্টনের আগে জানতে হবে মীরাসের দাবিদার মৃত ব্যক্তির কেমন এবং কোন স্তরের আত্মীয়।[৮৫]

ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদিঃ

মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় মোট চারটি। যথা-

(ক) **মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থাকরণঃ** মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ দ্বারা সর্বপ্রথম ন্যায়সংগতভাবে তার গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

এক্ষেত্রে যাতে কোন রকমের অপব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। আবার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে কোনরকম কার্পণ্য করা না হয় সেটাও লক্ষণীয়।

(খ) **মৃতের ঋণ পরিশোধঃ** দাফন-কাফনের পর অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে দেখতে হবে মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ আছে কিনা। যদি ঋণ থাকে, তবে প্রথমে তা পরিশোধ করে নিতে হবে। ঋণ পরিশোধের আগে ত্যাজ্য সম্পত্তির কিছুতেই ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

---

৮৫. আল-মাওয়ারিছ, শামী, ৪র্থ খন্ড এর উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারিসদের বণ্টন করা হবে সে যা অসিয়ত করে গিয়েছে তা পূরণ করা এবং তার ঋণ পরিশোধের পর।[৮৬]

"মুমিনের আত্মা তার ঋণের সংগে ঝুলে থাকে যে পর্যন্ত না তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করা হয়।"[৮৭]

ঋণ দুই প্রকার: (ক) বান্দার হক (খ) আল্লাহর হক। বান্দার হক আবার দুই প্রকার-(১) প্রত্যক্ষভাবে ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পর্কিত ঋণ (২) এমন ঋণ যা প্রত্যক্ষভাবে ত্যাজ্য সম্পদের সম্পৃক্ত নয়। আলোচ্য বান্দার হক বলতে এই দ্বিতীয় প্রকারের ঋণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যে ঋণ সরাসরি ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত তা দাফন-কাফনের উপর অগ্রাধিকার রাখে। এ ধরনের ঋণের মধ্যে পড়ে বন্ধকের মাল, বাকি মূল্যে খরিদ করা মাল ইত্যাদি। যেমন কেউ কারও কাছে কোন বস্তু বন্ধন রেখে টাকা আনল। অতঃপর সে ঋণ পরিশোধের আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এ অবস্থায় সে বন্ধকী মালে পাওনাদারের হক সারাসরিভাবে সম্পৃক্ত। মৃত ব্যক্তির আর কোন মাল না থাকলে দাফন-কাফনেরও আগে এই বন্ধকী মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে নিতে হবে। এমনিভাবে কারও কাছ থেকে বাকি মূল্যে কোন দ্রব্য খরিদ করার পর কেউ মারা গেলে এবং সে আর কোন সম্পদ না রেখে গেলে ঐ দ্রব্য বিক্রি করে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যাবে না এবং দ্রব্যটির বিক্রেতা তা ফেরত নিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখে।[৮৮]

পক্ষান্তরে ঋণ যদি সরাসরি কোন মালের সংগে সম্পৃক্ত না হয় তবে তা দাফন-কাফনের পর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। আর সম্পদ অবশিষ্ট না থাকলে তা রহিত হয়ে যাবে।

এ জাতীয় ঋণও আবার দুই প্রকার। (ক) সুস্থতাকালীন ঋণ (খ) অন্তিম রোগের সময়কার ঋণ। সুস্থতাকলীন ঋণ বলতে এমন ঋণকে বোঝায় যা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিংবা যে ঋণের কথা মৃতব্যক্তি সুস্থ থাকা অবস্থায় স্বীকার করে গেছে। আর সে ঋণের কথা অন্তি ম রোগের সময় সে স্বীকার করেছে অথবা যুদ্ধে শত্রু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে যখন দণ্ড কার্যকর করার সময় নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময়ে সে স্বীকার করেছে এ ধরনের ঋণকে অন্তিম রোগাবস্থার ঋণ বলে।

অন্তিমকালে স্বীকার করা ঋণও আবার দু'রকমের হতে পারে। (ক) যে কারণে ঋণ রয়েছে তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত। (খ) যে কারণে ঋণ তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত নয়; কেবলই মৃতব্যক্তির স্বীকারোক্তি নির্ভর। সুস্থতাকালীন ঋণ এবং অন্তিমকালীন যে ঋণের কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুই জাতীয় ঋণ অন্তিমকালীন স্বীকারোক্তি নির্ভর ঋণের উপর অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ সে ঋণ পরিশোধের পর ত্যাজ্য সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দিয়ে অন্তিমকালের স্বীকারকৃত (চাক্ষুস প্রমাণাধীন) ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে তবে তা রহিত করা যাবে না।[৮৯]

দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার হক। যেমন: যাকাত, কাফ্ফারা, মানত ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি এগুলো আদায়ের জন্য অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে উপরোক্ত হকসমূহ আদায়ের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তা আদায় করা যাবে। যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে তা রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে মৃত

৮৬. আল-কুরআন, ৪:১১
৮৭. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত
৮৮. আল মাওয়ারিছ, প্রাগুক্ত
৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি যদি অসিয়ত না করে যায় যায় তখনও এরূপ ঋণ রহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় ওয়ারিসদের জন্য তা আদায় করা জরুরি হবে না। অবশ্য তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে যদি আদায় করে দিতে চায় তবে সে ইখতিয়ার তাদের আছে এবং এতে মৃতব্যক্তি উপকৃত হবে।[৯০]

(গ) মৃতের অসিয়ত পূরণঃ দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট না থাকলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে তার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা দ্বারা মৃতব্যক্তির কৃত অসিয়ত পূরণ করতে হবে। অসিয়ত পূরণ করার আগে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ 'ওয়ারিসরদের মধ্যে মৃতের সম্পত্তি বন্টন করা হবে সে যা অসিয়ত করে তা পূরণ এবং তার ঋণ পরিশোধের পর।'[৯১]

সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভিতর অসিয়ত পূরণের জন্য ওয়ারিসদের অনুমতি আবশ্যক নয়। তবে অসিয়ত পূরণের জন্য যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রয়োজন হয় তখন সকল ওয়ারিসের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অপরিহার্য হবে।[৯২]

(ঘ) উপরোক্ত হকসমূহ আদায়ের পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে চতুর্থ পর্যায়ে তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে।

অসিয়্যতের পরিচিতি ও গুরুত্বঃ

'অসিয়ত' এর আভিধানিক অর্থ আদেশ দান, ভার অর্পণ। এটা অসিয়্যতকারীর জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পরে পালনের জন্যও হতে পারে।[৯৩]

শরী'আতের পরিভাষায় অসিয়্যত বলতে, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য কাউকে কোন কিছুর মালিকানা প্রদানার্থে যে নির্দেশ দান বুঝায়।"[৯৪]

যে বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকেও অসিয়্যত বলে।[৯৫]

কোন সম্পত্তিও হতে পারে কিংবা সম্পত্তির উপকার-উপাযোগ, যার প্রতি অসিয়্য কার্যে পরিণত করার ভার অর্পিত হয় তাকে অসী (ট্রাস্ট) বলা হয়।[৯৬]

জীবনের ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করার আখেরী সুযোগ এ অসিয়্যাতের বিধান এবং সেই সঙ্গে এটা উত্তম কাজ করে বিদায় নেওয়ার এক সুন্দরতম ব্যবস্থা বটে। প্রিয় নবী (স.) ইরশাদ করন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের শেষ কালে বিগত পুণ্যের উপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় করো।[৯৭]

যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসে কোন অংশ নেই, তাদের জন্য অসিয়্যতের অনুমতি রয়েছে। অনাত্মীয় সম্পর্কেও অসিয়্যত জায়িয। যেসব অনাত্মীয় 'স্বজনের মীরাসে অংশীদারীত্ব রয়েছে তাদের জন্য অসিয়্যত নিষিদ্ধ। কিন্তু অপরাপর ওয়ারিস যদি অনুমতি দেয় তবে বিশেষ বিশেষ কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়্যত করা জায়িয। এ সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, কোন ওয়ারিসের অসিয়্যত বৈধ নয়। তবে অপরাপর ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলে তা জায়িয।[৯৮]

---

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৯১. আল-কুরআন, ৪:১১
৯২. আল মাওয়ারিছ, প্রাগুক্ত
৯৩. ইমাম কুরতুবী, আল জামী লি আহকামিল কুরআন, ২য় খন্ড, মিশর, পৃ. ১৭৪
৯৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩
৯৫. শামী ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৩৮
৯৬. তাফসীরে রুহুল মাআনী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩
৯৭. ইমাম কাসানী, বাদাঈ উস সানাঈ, ৭ম খন্ড, কায়রো, পৃ. ৩৩৩
৯৮. ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মিরাসের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অসিয়্যত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, "ইহা যা অসিয়্যত করা হয় তা দেওয়ার এবংঋণ পরিশোধের পর।"[৯৯]

হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়্যত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।[১০০]

অসিয়্যত বৈধ হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওসাক্কাস (রা.)-এর অসিয়্যাতের ঘটনা। তিনি অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়্যত করতে চাই। নবী করীম (স.) বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ? নবী করীম (স.) বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? নবী করীম (স.) বললেন, এক-তৃতীয়াংশ। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম।[১০১]

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ 'আদ্ দুররুল মুখ্তার' এ অসিয়্যতকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) ওয়াজিব (খ) মুবাহ্ (গ) মাকরূহ (ঘ) মুস্তাহাব।[১০২]

সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জসহ আল্লাহ্ ও বান্দার যে সমস্ত হক আদায় থেকে যায় সে সম্পর্কে অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। ধনী ব্যক্তি সম্পর্কে অসিয়্যত করা মুবাহ। আল্লামা ইব্ন আবিদীন (র.) বলেন, ধনী ব্যক্তি যদি ইল্ম অনুরাগী ও সৎকর্মপরায়ণ হয় অথবা এমন আত্মীয় হয় যে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা এমনিতে ধনী হলেও তার পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হয় তবে তার জন্য অসিয়্যত করা উত্তম হবে। ফাসিক পাপাচারীর জন্য অসিয়্যত করা মাকরূহ। তবে অসিয়্যতের ফলে যদি ফাসিক ব্যক্তির সংশোধনের আশা করা যায়, যেমন-চোর হয়ত চুরি কাজ ছেড়ে দিবে, তবে তার জন্য অসিয়্যত করা উত্তম হবে।

এছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। প্রিয় নবী (স.) অসিয়্যত করার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত হাদীস, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন। যাতে তোমরা তেমাদের জীবনের ক্রান্তিকালে বিগত পুণ্যের উপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পার। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় কর।"[১০৩]

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন, অসিয়্যত করতে পারে এমন কোন সম্পদ যদি কোন মুসলিমের থাকে তবে সে সম্পর্কে অসিয়্যত লিখে নিজের কাছে রেখে তার পক্ষে দুই কি তিন রাত কাটানো উচিত নয়।[১০৪]

অসিয়্যতের নিয়ম-নীতি:

অসিয়্যত সংঘটিত হয় প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে। মূসী (অসিয়্যতকারী) প্রস্তাব করবে এবং মূসা-লাহু (যার জন্য অসিয়্যত করা হয়) কবুল বা গ্রহণ করবে। যেমন মূসী বলবে, আমি অমুকের জন্য এক হাজার টাকা বা আমার অমুক বাড়িটি কিংবা অমুক গরু বা গাছটি অসিয়্যত করলাম। অতঃপর মূসা-লাহু বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। অসিয়্যতের প্রস্তাব গ্রহণের প্রকৃত সময়

---

৯৯. আল-কুরআন, ৪:১১
১০০. আল-কুরআন, ৫:১০৬
১০১. ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
১০২. শামী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৬৮
১০৩. ইমাম কাসানী, প্রাগুক, পৃ. ৩৩১
১০৪. ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে মূসীর মৃত্যুর পর। তার মৃত্যুর আগে মূসা-লাহু গ্রহণ প্রত্যাখ্যান যাই করুক তা ধর্তব্য নয়। কাজেই মূসীর মৃত্যুর আগে সে যদি প্রত্যাখ্যানও করে তবুও মৃত্যুর পর তার গ্রহণ বৈধ হবে। অনুরূপ মূসীর মৃত্যুর পূর্বে সে গ্রহণ করলে মৃত্যুর পর তা প্রত্যাখান করতে পারবে।[১০৫]

মূসা-লাহু কর্তৃক গ্রহণ করে নেওয়ার পর অসিয়্যত চূড়ান্ত ও অনিবার্য হয়ে যায় এবং মূসা-বিহী (অসিয়্যতের বস্তু) তে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর আর মূসীর ওয়াসিদের সম্পত্তি ছাড়া তার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না। মূসা-লাহু প্রত্যাখ্যান করলে অসিয়্যত বলবৎ থাকে না। কাজেই একবার প্রত্যাখ্যান করে ফেললে তারপর আর তা গ্রহণ করার অধিকার থাকে না।[১০৬]

অসিয়্যতের শর্তাবলী:

(ক) ঐচ্ছিক দান-খয়রাত করার অধিকারী হওয়া তথা প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

(খ) স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে অসিয়্যত করা। কাজেই পরিহাস স্বরূপ চাপের মুখে কিংবা ভুলবশতঃ অসিয়্যত করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা এগুলো ইচ্ছার পরিপন্থী।

(গ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ বা তার বেশি ঋণ না থাকা। এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অসিয়্যত সহীহ্ নয়। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব আর অসিয়্যত হচ্ছে নফল। নফলের উপর ওয়াজিব অগ্রাধিকার রাখে। এ কারণেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হয় এবং তারপর অবশিষ্ট থাকলে অসিয়্যত পূরণ করতে হয়।[১০৭]

যার জন্য অসিয়্যত করা হয় (মূসা-লাহু) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী:

(ক) অসিয়্যতকালে তার জীবিত থাকা। মৃত কিংবা অনাগত ব্যক্তির জন্য অসিয়্যত বৈধ নয়। ছয়মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অসিয়্যত বৈধ।

(খ) ওয়ারিসের জন্য অসিয়্যত বৈধ নয়, তবে অন্য সব ওয়ারিস-এর অনুমতি থাকলে তা বৈধ থাকবে।

(গ) হত্যাকারীর জন্য অসিয়্যত করা জায়িয নেই।[১০৮]

অবশ্য হত্যাকারী শিশু বা উন্মাদ হলে তার জন্য অসিয়্যত বৈধ। উল্লেখ্য, হত্যাকারীর জন্য যে অসিয়্যত করা জায়িয নয় এটা মূসীর ওয়ারিসরদের স্বার্থে। কাজেই ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি দেয় তবে জায়িয হবে।

যে বস্তু সম্পর্কে অসিয়্যত করা হয় (মূসা-বিহী) তা কোন মাল (সম্পদ) বা এ জাতীয় কোন কিছু হতে হবে। মূসা-বিহী কেবল মাল হলেই চলবে না বরং তার মূল্যও থাকতে হবে। সুতরাং কোন মুসলিমের পক্ষে মাদক দ্রব্যের অসিয়্যত বৈধ নয়। বাড়িতে বসবাস, জমিতে চাষাবাদ এবং বাগানের ফসল ভোগ করা ইত্যাদির ব্যাপারে অসিয়্যত করা বৈধ।

---

১০৫. ইমাম কাসানী, প্রাগুক, পৃ. ৩৩১

১০৬. আবু বকর আল মারগিনানী, আল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০

১০৭. ইমাম কাসানী, প্রাগুক, পৃ. ৩৩৯

১০৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যেসব কারণে অসিয়্যত বাতিল হয়:

অসিয়্যতকারী (মূসী) যদি সরাসরি অসিয়্যত বাতিল কর দেয়, তবে অসিয়্যত বাতিল হয়ে যায়। মূসা সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হয়ে গেলেও অসিয়্যত বাতিল হয়ে যায়। বেহুঁশ হওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না, যার জন্য অসিয়্যত করা হয় (মূসা-লাহু) যদি মূসীর আগে ইন্‌তিকাল করে তাতেও অসিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হয়।

মূসা-বিহী (অসিয়্যতের বস্তু) বিনষ্ট হয়ে গেলেও অসিয়্যত বাতিল হয়। যদি সে বস্তুটি ইঙ্গিতকৃত ও সুনির্দিষ্ট হয়। যেমন, আমি ঐ ছাগলটি অমুকের জন্য অসিয়্যত করলাম। এ ক্ষেত্রে ছাগলটি মারা গেলে অসিয়্যত বাতিল হয়ে যাবে। অসিয়্যতের বস্তু (মূসা-বিহী) চুরি বা ছিনতাই হওয়ার পর যদি ফিরে পাওয়া যায় তবে অসিয়্যত বাতিল হবে না।

অসিয়্যত প্রত্যাহার:

অসিয়্যতকারী (মূসী)-এর পক্ষে অসিয়্যত কোন চুক্তি নয়, কাজেই অসিয়্যত করার পর যতদিন সে জীবিত থাকে ততদিন তা প্রত্যাহার করার অধিকার তার থাকে। প্রত্যাহার সরাসরি মৌখিভাবেও হতে পারে, আবার পরোক্ষভাবেও হতে পারে। সরাসরি এভাবে যে, মূসী বলবে, আমি অমুকের জন্য যে অসিয়্যত করেছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিলাম, পরোক্ষভাবে মূসী তার অসিয়্যতের বস্তুতে এমন কোন কাজ করল বা সে সম্পর্কে এমন কোন কথা বলল, যা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রমাণ বহন করে, যেমন সে কারও জন্য একটা কাপড় অসিয়্যত করেছিল, তারপর সে তা কেটে জামা বানাল বা সেটি বিক্রি করে দিল কিংবা কাউকে দান করল এবং দানগ্রহীতা তা হস্তগত করে নিল।[১০৯]

অসিয়্যতের সর্বাধিক মাত্রা:

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সবচেয়ে বেশি অধিকার তার ওয়াসিদের। অগ্রাধিকার বিবেচনায় ওয়ারিসদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ রাখা আবশ্যক। তাই তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রেখে বাকি এক-তৃতীয়াংশের ভেতর অসিয়্যতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটাই হবে অসিয়্যতের সর্বাধিক মাত্রা। হযরত সা'দ (রা.)-এর অসিয়্যত সংক্রান্ত হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। মোটকথা, সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়্যত করা জায়িয নয়, তবে যদি মূসীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের অসিয়্যত অনুমোন করে তাহলে সে অসিয়্যত বৈধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ওয়ারিসগণ প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের অনুমোদন গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে মূসীর জীবদ্দশায় অনুমোদনও গ্রহণযোগ্য নয়।[১১০]

ওয়ারিসগণ যদি দরিদ্র হয় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ বেশি না হয় তবে অসিয়্যত না করাই উত্তম। আর অর্থ সম্পদ যদি বেশি হয় এবং ওয়ারিসগণ দরিদ্র হয় তবে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ নয় বরং তার কম পরিমাণের অসিয়্যত করা উত্তম। এক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ এবং এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ সম্পদের অসিয়্যত করা উত্তম। ওয়ারিসগণ ধনী হলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়্যত করা উত্তম। আর অসিয়্যতের ক্ষেত্রে সে সব আত্মীয়-স্বজনকেই আগে বিবেচনায় রাখা উচিত যারা মীরাসের কোন অংশ পায় না। এক্ষেত্রেও যেসব আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যাতে করে এর মাধ্যমে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ মুছে গিয়ে সম্পর্কচ্ছেদের আশঙ্কা হতে আত্মীয়তা রক্ষা পায়। তবে এ নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দুই আত্মীয় দীনদারী ও অভাব অনটনের দিক থেকে সমপর্যায়ের হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে।

১০৯. প্রাগুক্ত

১১০. আবু বকর আল মারগিনানী, আল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৯

Dhaka University Institutional Repository

যে আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক আছে সে যদি বেশি অভাবগ্রস্ত হয় এবং দীনদারীও তার মধ্যে বেশি থাকে তবে অসিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া শ্রেয়।

অসিয়্যতের হুকুম:

যার জন্য অসিয়্যত করা হয় সে যখন অসিয়্যত কবুল করবে তখন অসিয়্যতের বস্তুতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সে হস্তগত করুক আর নাই করুক। অসিয়্যত যদি বস্তু সম্পর্কে হয়, যেমন জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদিপশু ইত্যাদি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে বা দান খয়রাতও করতে পারবে। অসিয়্যতকারীর মৃত্যুর পার অসিয়্যতের বস্তুতে কিছু ঘটলে, যেমন: গাছে ফল ধরল, গাভী বাচ্চা দিল ইত্যাদি তাও অসিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি বস্তুর উপকার-উপযোগ সম্পর্কে অসিয়্যত করা হয় তবে কোন মেয়াদের উল্লেখ না থাকলে জীবনভর এবং মেয়াদের উল্লেখ থাকলে মেয়াদ পর্যন্ত তার ভোগাধিকার লাভ করবে। কিন্তু বস্তুর মালিকানা থাকবে ওয়ারিসদের।[১১১] যেমন অসিয়্যত করা হল, অমুক বাড়িটিতে যেন অমুককে বাস করতে দেওয়া হয়। তবে ঐ ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে উক্ত বাড়ীতে বসবাস করতে পারবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ সেথায় বাস করতে পারবে না বরং বাড়িটি কাউকে দেওয়ার অসিয়্যত থাকলে সে ব্যক্তির হাতে হস্তান্ত র করা হবে অন্যথায় মূসীর ওয়ারিসদের কাছে প্রত্যার্পিত হবে।[১১২]

অসী নিয়োগ:

অসিয়্যত কার্যকর করার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয় পরিভাষায় তাকে 'অসী' বলে। 'অসী' তিন রকমের হতে পারে: (ক) বিশ্বস্ত ও সক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ অসিয়্যত বিশ্বস্ততার সাথে কার্যকর করার ক্ষমতা যার আছে, (খ) বিশ্বস্ত কিন্তু অক্ষম এবং (গ) ফাসিক বা কাফির।[১১৩]

বিশ্বস্ত ও সক্ষম ব্যক্তিকে 'অসী' নিয়োগ করা হলে তাকে তার দায়িত্বে বহাল রাখা হবে। আদালত তাকে অব্যাহতি দিতে পারবে না। যদি বিশ্বস্ত হয়, কিন্ত অসিয়্যত কার্যকর করার ক্ষমতা তার না থাকে তবে আদালত তাকে অব্যহতি না দিয়ে তার সঙ্গে একজন সক্ষম ব্যক্তিকে অসী নিযুক্ত করবে। সে মূসী নিযুক্ত অসীকে তার দায়িত্বপালনে সহযোগিতা করবে। আর অসীর মধ্যে যদি বিশ্বস্ততাই না থাকে তথা সে ফাসিক বা কাফির হয় তবে আদালতের কর্তব্য তাকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করা।

নারী কিংবা অন্ধ ব্যক্তিকেও 'অসী' নিয়োগ করা যেতে পারে। শিশুকে অসী বানানো জায়িয নয়। এরূপ করা হলে আদালতও তদস্থলে অন্য অসী নিযুক্ত করবে। অসী নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব ও গ্রহণ আবশ্যক। যেমন মূসী বলবে, তুমি আমার অসী হও বা তুমি আবার অসিয়্যত কার্যকর করো কিংবা আমার মৃত্যুর পর আমার শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধান করো ইত্যাদি। এরূপ বললে সেটা হবে প্রস্তাব। তারপর যাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো তার ইখতিয়ার বা ইচ্ছা হলে গ্রহণ করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে।

অসিয়্যতকারীর জীবদ্দশায় যদি সে চুপ থাকে তারপর অসিয়্যতকারীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় তার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু জীবদ্দশায় প্রত্যাখ্যান করলে মৃত্যুর পর গ্রহণ করর অধিকার থাকে না।[১১৪]

---

১১১. ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১
১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬
১১৩. আলমগীরি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭–১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মূসীর জীবদ্দশায় যদি কোন ব্যক্তি অসী হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় এবং তারপর মূসীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে বিষয়টি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। ওয়ারিসদের পক্ষ হতে অসী সম্পর্কে কোন অভিযোগ দায়ের হলে আদালত তদন্ত করে দেখবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাকে অব্যাহতি দিবে, অন্যথায় নয়।[১১৫]

একাধিক ব্যক্তিকেও অসী নিয়োগ করা যেতে পারে এবং এটা দুভাবে হতে পারেঃ (ক) সমুদয় বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সম্মিলিতভাবে অসী নিয়োগ এবং (খ) পৃথক পৃথক বিষয়ে পৃথক ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ।

দু'জনকে সম্মিলিতভাবে অসী নিয়োগ করা হলে উভয়কে সম্মিলিতভাবে কার্যকর করতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে কারো কিছু করার ইখ্তিয়ার থাকবে না। তবে কতকগুলো বিষয় এর থেকে ব্যতিক্রম, যথাঃ মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, মৃতের ঋণ পরিশোধ করা, নির্দিষ্ট কোন বস্তু সম্পর্কে অসিয়্যত থাকলে তা কার্যকর করা, আমানত প্রত্যাপর্ণ করা, মৃত ব্যক্তি কারও কিছু আত্মসাৎ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, কারও কাছে মৃত ব্যক্তির কিছু পাওনা থাকলে সে ব্যাপারে দাবী উত্থাপন ও মামলা মুকাদ্দমা করা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসের পক্ষে উপহার উপঢৌকন কবুল করা এবং নির্দিষ্ট কোন ফকীরের জন্য দান খয়রাতের অসিয়্যত থাকলে তা কার্যকর করা। দুই ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ কালে মূসী যদি প্রত্যেককেই পূর্ণাঙ্গ অসীরূপে নিয়োগ দান করে তবে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে অসিয়্যত কার্যকর করার ক্ষমতা থাকবে।

দুই ব্যক্তি অসী নিয়োগের পর যদি একজন মারা যায়, তবে আদালতের রায় ছাড়া অপরজন পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করবে না। আদালত সমীচীন মনে করলে একা তাকেই অসী সাব্যস্ত করে পূর্ণ ক্ষমতা দান করবে। অন্যথায় মৃত ওসীর স্থলে আরেকজনকে নিয়োগ দেবে। দুই ব্যক্তিকে অসী বানানোর পর যদি অসিয়্যতকারীর মৃত্যু হয় এবং তারপর একজন কবুল করে ও অন্যজন বিরত থাকে তবে অপরজন একা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে না।

দুই ব্যক্তিকে যদি পৃথক পৃথক বিষয়ে অসী করা হয়, যেমন একজনকে ঋণ পরিশোধের জন্য এবং অপরজনকে তার ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করার জন্য তবে সে ক্ষেত্রে উভয়েই সম্মিলিতভাবে যাবতীয় বিষয়ের অসীরূপে গণ্য হবে।

কেউ যদি তার দুই পুত্রের জন্য পৃথকভাবে দুই ব্যক্তিকে অসী নিযুক্ত করে কিংবা পৃথক সম্পদ যেমন উপস্থিত সম্পদের জন্য একজনকে এবং অনুপস্থিত সম্পদের জন্য অপর একজনকে অসী নিযুক্ত করে এবং শর্ত করে দেয় যে, একজনের অসীয়্যতের বিষয়ে অপরজন শরীক থাকবে না তাহলে শর্তানুযায়ী উভয়ই পৃথক অসী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এরূপ শর্ত না থাকলে তারা সম্মিলিতভাবে অসী হবে।[১১৬]

অসীগণ সচ্ছল হলে দায়িত্বপালনের জন্য কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না।

অসিয়্যত পূরণের নিয়মঃ

মূসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা প্রথমে ঋণ পরিশোধ করা হবে। অসিয়্যত যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি হয় তবে আনুপাতিক হারে হ্রাস করতে হবে। অবশ্য মূসীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ অসিয়্যত অনুমোদন করলে হ্রাস করার প্রয়োজন নেই।

---

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

অসিয়্যত বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন হাক্কুল্লাহ্ বা হক্কুল-ইবাদ সম্পর্কে, আবার হক্কুল্লাহ্ হলে তা ফরয কার্যের জন্য হবে অথবা নফল কার্যের জন্য। অসিয়্যত যদি এসবগুলো সম্পর্কেই হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দ্বারা কিংবা ওয়ারিসদের অনুমোদনক্রমে তার অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয় তবে সবগুলোই আদায় করা যাবে। নচেৎ গুরুত্বের পর্যায়ক্রমে হিসাবে একের পর এক পূরণ করা হবে। যেমন প্রথমে সালাত, সাওমের ফিত্‌রা, বদলী হজ্জ, যাকাত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদির অসিয়্যত পূরণ করা হবে। অতঃপর নফল অসিয়্যত পূরণ করা হবে, যেমন নফল হজ্জ, গরীবদের জন্য দান খয়রাত, মসজিদে ও জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য ইত্যাদি।

যদি গুরুত্বের দিক থেকে সবগুলো অসিয়্যত সমমর্যাদার হয় তবে অসিয়্যতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তা পূরণ করা হবে।[১১৭]

ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফ পরিচিতি:

আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করার অন্যতম প্রধান উৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। এজন্য ইসলাম এর ব্যাপক প্রচলন ও প্রসারের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। মহানবীর (স.) শিষ্যগণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্‌ফ বলতে বোঝায় নিবৃত্তি বা আটক, বাধা দেওয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ মূলত কোন বস্তুকে রক্ষা করা, ওটাকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাধা দেয়া।

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯২-এর সংজ্ঞার্থনুসারে ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ হলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যেকোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা। এই উদ্দেশ্যে অমুসলিম দান করলেও তা এর অন্তর্ভূক্ত হয়।[১১৮]

ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।[১১৯]

Dictionary of Islam-এ বলা হয়েছে: Wafq lit. Standing, Shopping, healting." A term which in the language of the law signifies the appropriation or dedication of property to charitable uses and the service of God. An endowment. The object of such and endowment or appropriation must be of a perpetual nature, and such property or land cannot be sold or transferred. [১২০]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) খায়বরে প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দামি সম্পত্তিটি যখন ওয়াক্‌ফ করে দেন তখন মহানবী (স.) তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তা এমনভাবে সাদকাহ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা হবে না, বরং এর উপযোগ ব্যয় করা হবে।[১২১] হযরত উমর (রা.) উক্ত শর্তাধীনে

---

১১৭. ইমাম কাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

১১৮. S.A. Hasan, The Waqfs Ordinance, (Bangladesh Law Book Company: Dhaka, 1962, 1999), P 103

১১৯. বুরহানউদ্দীন আলী ইবন আবুবকর (অনুবাদ আবু তাহের মিছবাহ), আল হিদায়া, ২য় খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ ৫৪৩

১২০. Thomas patrick Highes, A Dictionary of Islam (Lahore: Premier Book House, 1964), P. 664

১২১. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড কোয়েটা: আল মাকতাবা আল রাশিদিয়া, ১৯৮৫), পৃ ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

জায়গাটি ফকির, আত্মীয়-স্বজন, দাস-মুক্ত করা, মুসাফির, অতিথি সেবা ও অন্যান্য ভাল কাজের জন্য ওয়াক্ফ করেন। তিনি বলেন যে, মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) এ-থেকে তার প্রয়োজনীয় খরপোষ নিতে পারবেন। তবে তিনি তা সঞ্চয় করতে পারবেন না। সঙ্গতভাবে নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবেন।[১২২] বস্তুত, হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনায় যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই হলো ওয়াকফের যথার্থ সংজ্ঞার্থ। ওয়াক্ফ দ্বারা ওয়াক্ফকারীর অধিকার নিঃশেষ হয়ে মালিকানাটি আল্লাহর নিকট চলে যায়। সুতরাং ইসলামের পরিভাষায়, কোন বস্তু মহান আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে দরিদ্র-অসহায়দের মধ্যে কিংবা যেকোন কল্যাণ খাতে দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।

ইসলামে ওয়াক্ফ নীতিমালা

ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি খলিফা কিংবা প্রশাসকের ওয়াক্ফ স্বার্থবিরোধী সকল প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। এজন্য তাতে ওয়াকফের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে হ্রাস পেতে পারে কিংবা উক্ত সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণও বৈধ হবে না। ওয়াক্ফকারী কর্তৃক বিভিন্ন বৈধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শরীআতের স্পষ্ট বিধি-বিধানের মত অবশ্যই পুরণ করতে হবে। ওয়াকফের ব্যাপারে এটাই সব বেশি লক্ষ করার ব্যাপার। ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া ওয়াকফের স্বার্থবিরোধী অধিক কর ধার্য করা এবং ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোরই এ-ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, ওয়াক্ফ করার পর সে-সম্পত্তি আর কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না। তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[১২৩]

ওয়াকফের শর্তসমূহঃ

কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হয়। আর এ-শর্তসমূহের কতকটা সম্পর্ক ওয়াক্ফকারীর সাথে কতকের সম্পর্ক ওয়াক্ফ কর্মের সাথে আর কতকের সম্পর্ক ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে। ওয়াক্ফকারীর সঙ্গে যেসব শর্ত সম্পৃক্ত তা হলো ওয়াক্ফকারীকে পূর্ণ মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন, পূর্ণবয়স্ক এবং স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। উন্মাদ, প্রকৃতিস্থ, শিশু ও ক্রীতদাসের ওয়াক্ফ সঠিক হবে না। ওয়াক্ফ সঠিক বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াকিফকে মুসলিম হতে হবে। কোন জিম্মি যদি বিধি মোতাবিক ওয়াক্ফ করে তবে তা বৈধ হবে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ হলো-যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হবে তার স্বত্ব-স্বামিত্ব ওয়াক্ফ করার সময়ে ওয়াক্ফকারীর থাকতে হবে। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয়, নিজেকে শুধু মুতাওয়াল্লী মনে করে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তবে ঐ ওয়াক্ফ বৈধ হবে। উক্ত ক্ষেত্রে যা লক্ষ করা হবে তা হলো, ঐ ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তবে ঐ ওয়াক্ফ বৈধ হবে। উক্ত ক্ষেত্রে যা লক্ষ, করা হবে তা হলো, ঐ ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি আদান-প্রদানের ক্ষমতা ছিল কিনা। ওয়াকিফ কর্তৃক কোন সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি হলেও সে ঐ সম্পত্তি ওয়াক্ফ করতে পারবে যদি শেষপর্যন্ত ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ওয়াকিফ যদি ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নাও হয় এবং সে যদি তা ওয়াক্ফ করে এবং মালিক কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়, তাহলেও ঐ ওয়াক্ফ অবৈধ হবে না। কিন্তু ওয়াক্ফ দ্বারা যদি উত্তরাধিকারীদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ঐ ওয়াক্ফ কার্যকরী হবে না।[১২৪]

---

১২২. হিফজুর রহমান (অনুবাদ আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ ঢাকা, ১৯৯৮), পৃ ২৯৬

১২৩. ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৩য় খন্ড, কিতাবুল ওয়াক্ফ আল মাকতাবা আলা মাজিদিয়া, (কোয়েটা, ১৩৯৯ হি.), পৃ ১৭৭

১২৪. গাজী শাছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষা (ঢাকাঃ ল'বুক হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকফের বস্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কেউ যদি বলে যে, 'আমি আমার জমি থেকে ওয়াকফ করলাম' কিন্তু কোথাকার কোন জমি তা নির্দিষ্ট করে বলল না, এরূপ ওয়াকফ বৈধ হবে না।[১২৫] তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি যা সবাই চেনে, তার পরিমাপ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াকফ বিশুদ্ধ হবে।[১২৬]

ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াক্ফ বস্তু স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পদ হবে না, স্থাবর সম্পত্তি হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াকফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র এর ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)- সহ আরো অনেক সাহাবী যুদ্ধসামগ্রী ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং মহানবী (স.) তা অনুমোদনও করেছিলেন।[১২৭]

ওয়াক্ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি হলো- ওয়াক্ফ হতে হবে এমন কোন পুণ্যকর্মের জন্য যা ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ কাজ। ওয়াক্ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভশীল করে রাখা যাবে না। যেমন, অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ-জমি ওয়াক্ফ।[১২৮] ওয়াক্ফকালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছামত ব্যয়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। এরূপ কোন শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[১২৯]

ওয়াক্ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। এরূপ করলে ওয়াক্ফ বৈধ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এভাবে ওয়াক্ফ করে মসজিদ তৈরী করলে বৈধ হবে কিন্তু বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্ফটি স্থায়ী হতে হবে। অতএব, সীমিত সময়ের জন্য কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হবে না। অধিকন্তু ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যও স্থায়ী ধরনের হতে হবে। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। ওয়াক্ফনামায় এমন কোন শর্ত যদি থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে সম্পত্তিটি ওয়াকিফের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে, এরূপ ওয়াক্ফ বৈধ নয়। অথবা ওয়াক্ফ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে একজন উপস্বত্ব ভোগকারী বন্ধক গ্রহীতা হলে এবং ঐ সম্পত্তিতে তার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তার ওয়াক্ফটি স্থায়ী হবে না। কিছুদিনের জন্য লীজ নেয়া জমির উপর বাড়ির ওয়াক্ফ হবে না। কারণ তা স্থায়ী নয়।[১৩০] আবার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা, এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াক্ফের বিষয়বস্তুঃ

যেকোন প্রকার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে। কেবল স্থাবর সম্পত্তিরই নয়, বরং অস্থাবর সম্পত্তিরও বৈধ ওয়াক্ফ করা চলে। যেমনঃ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ার, সরকারি অঙ্গীকারপত্র এবং এমনকি টাকারও ওয়াক্ফ হতে পারে। ফসলের জমি, বাড়ি, গোসলখানা, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। জমি ওয়াক্ফ করলে তাতে অবস্থিত বৃক্ষ ওয়াক্ফের মধ্যে শামিল হবে। কিন্তু ফসল শামিল হবে না। তবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যদি ফসলের কথা উল্লেখ করে তবে তাও ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। জমি ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াকফের অন্তর্ভূক্ত হবে। জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে তবে তা

১২৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ৩৫৫
১২৬. ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ২১৫
১২৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড পৃ ৩৫৭
১২৮. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২য় খন্ড, পৃ ৩৫২
১২৯. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২য় খন্ড, পৃ ৩৫২
১৩০. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন (ঢাকাঃ অবণি প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সহই জমি ওয়াক্‌ফ করতে হবে। বৃক্ষ ছাড়া কেবল জমি ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ হবে না। জমির অংশবিশেষ ওয়াক্‌ফ করলে কতটুকু অংশ তা উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য যদি সবটুকু জমিই ওয়াক্‌ফ করা হয় তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা জরুরী নয়।[১৩১]

কোন অস্থাবর সম্পত্তি যদি স্থাবর সম্পত্তির অধীনে থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তির অধীনে তার ওয়াক্‌ফ বৈধ। যেমনঃ কোন জমিতে চাষাবাদের সামগ্রী আছে, এখন জমির মালিক যদি জমির সঙ্গে সেসব সামগ্রীও ওয়াক্‌ফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াকফের প্রচলন যদি থাকে তার ওয়াকফও বৈধ। যেমনঃ জানাজা ও কবর খননের সামগ্রী।

আল-কুরআন ও দ্বীনে পুস্তকাদি ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী কোন নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য কুরআন মাজীদ ওয়াক্‌ফ করলে তা সে-মসজিদেই সংরক্ষিত রাখা উচিত। অন্যত্র স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। যদি মুসল্লীদের জন্য ওাক্‌ফ করে, নির্দিষ্ট কোন মসজিদের জন্য নয়, তবে তা অন্য মসজিদে নেয়া বৈধ হবে। টাকা-পয়সাও ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। তবে ওয়াক্‌ফ বস্তুর মূলকে অবশিষ্ট রেখে কেবল তার উৎপাদন উপযোগ দ্বারাই উপকার লাভ বৈধ। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আসল টাকা ব্যয় করা যাবেনা; বরং তার লভ্যাংশ ব্যয় করতে হবে।[১৩২]

মাশা অর্থাৎ কোনও সম্পত্তিতে কারও অবিভক্ত অংশ (তা ভাগ করার উপযোগ হউক বা না হউক) দ্বারাও ওয়াক্‌ফ সৃষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অংশ মসজিদ বা গোরস্থানের জন্য সৃষ্টি ওয়াকফে ব্যবহার করা যেতে পারে না। সম্পত্তির প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হোক না কেন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার সময় অবশ্যই ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানাভুক্ত হতে হবে এবং তা হস্তান্তর করার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার তার থাকতে হবে।[১৩৩] যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিক অথচ তার ধারণা যে, সে ঐ সম্পত্তির একজন মুতাওয়াল্লী, সেক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তি বৈধভাবে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে পারে। এক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হলো ঐ সময়ে ওয়াকিফের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল কি না তা দেখা।

বন্ধক কিংবা ইজারা দেয়া সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা চলে। খায়-খালাসী বন্ধক-গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ করতে পারেনা। কারণ, সে তার মালিক নয় এবং বন্ধক হল সুদের বিরুদ্ধে মুসলিম আইনের ব্যবস্থাকে এড়াবার একটি পন্থামাত্র। কুঞ্জবনে বৃক্ষাদির উপর মালিকের স্থায়ী অধিকার ও পূর্ণ স্বত্ব রয়েছে। অতএব কুঞ্জবনের অধিকারের ওয়াক্‌ফ বৈধ।[১৩৪] ওয়াকিফ সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী তাতে দখলপ্রাপ্ত হলে, তিনি ঐ সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে পারবেন। অবশ্য যদি বিক্রয়টি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়।[১৩৫]

ওয়াক্‌ফ করার নিয়মঃ

ওয়াকফের সংজ্ঞার্থ থেকে জানা যায়, ওয়াকফের মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রেখে তার লাভ বা উৎপাদন উপযোগ ওয়াক্‌ফ খাতে ব্যয় করা হয়। কাজেই ওয়াকফের ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর নিয়তে এটা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, যে-বস্তু ওয়াক্‌ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে। এমন কোন শব্দ বা শর্ত যুক্তি করা যাবে না, যার দ্বারা উক্ত শর্তের লংঘন ঘটে এবং ওয়াক্‌ফ মেয়াদি হয়ে পড়ে বা কোন এক সময়ে তার ব্যয়খাত শেষ হয়ে যাবে।

---

১৩১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ ৩৫৫
১৩২. ইবনুল আবেদীন, ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫
১৩৩. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪
১৩৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯০-৯১
১৩৫. উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণকে প্রতারিত করে বিধবা কোন ওয়াকফ নামা সম্পাদন করলে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হবে; এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ বিধবা যে অংশ পাবে তার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফটি কার্যকরী হবে না। আবার কোন বিধবার জন্য প্রাপ্য দেনমোহর ঋণ তাকে দেয়া হবে কিনা তা অবশিষ্টভোগীদের ইচ্ছা, তাই উক্ত ঋণের টাকার ওয়াক্‌ফ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। ওয়াক্‌ফ লিখিতভাবেও করা যেতে পারে, আবার মৌখিকভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণ লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয়। দাতা 'ওয়াক্‌ফতু' 'হাববাসতু' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে তৃতীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে "উহা বিক্রয় করা, দান দকরা অথবা ওয়াসিয়াত করা যাইবে না।" (অন্যথায় তা সাদাকা হবে)। অধিকন্তু ওয়াক্‌ফকারী ওয়াকফের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণনা করবেন এবং ঠিকভাবে উল্লেখ করবেন কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্‌ফ করছেন।[১৩৬]

সুতরাং ওয়াকফের ভাষা হবে নিম্নরূপ: আমার এই জমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ, আমার এই জমি গরিবের জন্য ওয়াক্‌ফ, আমার এ-জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ, আমার এ-জমি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ। এটা বিক্রি করা যাবে না এবং এর মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার এই জমির ফসল স্থায়ীভাবে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমার মৃত্যুর পর এই জমির ফসল অমুক পাবে এবং তারপর তার আত্মীয় এবং তারপর গরিবগণ। মোটকথা, ওয়াকফের শর্তসমূহের পরিপন্থী না হয় এমন যেকোন ভাষাই ব্যবহার করা যেতে পারে।[১৩৭] তবে কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দলিলে বা বর্ণনায় 'ওয়াক্‌ফ' শব্দটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রকৃতি এবং ওয়াক্‌ফ দাতার আচরণ থেকে এটা যে একটি ওয়াক্‌ফ তা সহজেভাবে বোধগম্য হতে হবে। কোন জমি হস্তান্তর করলে তা আসলে ওয়াক্‌ফ কিনা, তা যেখানে সহজে বোধগম্য হয় না, সেখানে ওয়াকফের উক্তি এবং যে উদ্দেশ্যে ও যেভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিচার-বিবেচনা করে সম্পত্তি হস্তান্তরের আসল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে।

ওয়াক্‌ফদাতা তার জীবনকালে অথবা ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে যেতে পারেন। ওয়াসিয়োতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে তিনি যদি তাতে শর্ত জুড়ে দেন যে, তার যদি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে ওয়াক্‌ফ বলবত হবে না এবং পরে যদি সত্য সত্যই তার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে একমাত্র এ-কারণেই ওয়াক্‌ফটি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

কোন মুসলমান তার সমস্ত সম্পত্তিই ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। কিন্তু ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা হলে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা হলে তা তার মোট সম্পত্তির তিনভাগের মাত্র একভাগের উপর বলবত হবে। তবে দাতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ (উত্তরাধিকারীগণ) সম্মত হলে সমুদয় সম্পত্তির উপরই ওয়াক্‌ফ বলবত হতে পারে।[১৩৮]

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ছাড়া ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোই এ-ধরণের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পাদনের পর তা বেচা-কেনা করা বা অন্য কোনভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং যে কাজে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তজ্জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করা হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের জন্য তাতে দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। ওয়াক্‌ফ করার পর সে-সম্পত্তি কারও ব্যক্তি

---

১৩৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ২১১

১৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ ৬৬৫

১৩৮. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না। তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[১৩৯] ওয়াক্ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা না হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে সেভাবে ওয়াক্ফ করা না হলে তা ওয়াক্ফ বলে গণ্য হবে না।

ওয়াক্ফ সম্পূর্ণ হওয়ার উপায়ঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, ওয়াক্ফদাতার জীবদ্দশায় পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত ওয়াক্ফ ঘোষণা দ্বারা কার্যকরী হবে। ইমাম মহাম্মদ (র.) এর মতে, ওয়াক্ফদাতা শুধু ঘোষণা নয়, বরং মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তাঁর নিকট সম্পত্তির দখল দান না-করলে ওয়াক্ফ সম্পূর্ণ হবে না।[১৪০] বৈধ ওয়াক্ফ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ দকরা প্রয়োজন।

১) ওয়াক্ফ করতে হবে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুকূলে স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় তা থেকে অর্জিত আয় তার মৃত্যুর পর দরিদ্রের জন্য বরাদ্দ করে ওয়াক্ফ সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং তা হস্তান্তরযোগ্য নয়।

২) ওয়াক্ফ অবিলম্বে কার্যকরী হবে, তা স্থগিত রাখার অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবে না। তবে ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুপর্যন্ত তা স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা যায়। কিন্তু ওয়াক্ফ যদি ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুপর্যন্ত স্তগিত রাখার শর্ত লাগানো হয় তাহলে তা ওয়াসিয়্যাতের অনুরূপ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

৩) ওয়াক্ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবু হানিফা (র.)-র মতে, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে।[১৪১] সুতরাং হানাফী ওয়াক্ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পণের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথাবিহিত মোকাদ্দমা করতে পারে। বিচারক আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের সিদ্ধান্তের যেকোনটি অবলম্বনে বিচার করতে পারেন। আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্ফ বহাল রেখে আবেদন নাকচ করতে পারেন।[১৪২]

ওয়াক্ফ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আরো প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে, যাদের অনুকূলে ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। জনকল্যাণার্থে ওয়াকফের ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াক্ফকৃত বস্তু কোন একজন লোক ব্যবহার করলেই অর্পণ চূড়ান্ত হয়। অপরপক্ষে মালিকী মাযহাব মতে,ত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য নয়, যথাঃ ওয়াক্ফ সম্পত্তি একমাত্র ওয়াক্ফকারীই নয়, বরং তদীয় উত্তারাধিকারীগণও প্রত্যাহার করতে পারে।[১৪৩]

---

১৩৯. ইবনুল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭

১৪০. বুরহান উদ্দীন আলী, আল হিদায়া, পৃ ৫৪৬

১৪১. সারাখসী, মাবসূত, ১২ খন্ড (কায়রো, ১৩৬৫ হি.), পৃ ২৭

১৪২. আল হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫

১৪৩. Nasir Jamal, The Islamic law and personal law (London, 1986), P. 248

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফকারী স্বয়ং নিজেকেই প্রথম মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারে। ওয়াক্ফকারী এবং মুতাওয়াল্লী একই ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় মতেই দখল প্রদানের প্রয়োজন হয় না এবং মালিক হিসেবে তার নামের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর নামেও বদলি করতে হয় না। ঘোষণা দ্বারা-ওয়াক্ফ সৃষ্টি হবে বটে, তবে ঐ ঘোষণা অকৃত্রিম হতে হবে। যদি ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফনামা শুধু নিজের নিকট রেখে তার উদ্দেশ্যে কোন কাজ না করে, তবে এতে প্রতীয়মান হবে যে, ওয়াক্ফদাতার ঐ ওয়াক্ফ কার্যকরী করার ইচ্ছা ছিল না, হয়ত ওয়াক্ফদাতা তার বিরুদ্ধে কোন দাবিকে পরিহারের জন্য তার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওযাকফের ঘোষণা করা হয়নি, কিংবা দখল প্রদান করা হয়নি, সেক্ষেত্রে ওয়াকফের সম্পত্তি দানের জন্য পৃথক করে রাখলেও কিংবা তার আয় আকাঙ্খিত দানের জন্য ব্যয় করলেও তা ওয়াক্ফ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।[১৪৪] তবে একবার যদি কার্যকরীভাবে ওয়াক্ফ সম্পাদিত হয় তা প্রত্যাহার করা যাবে না। ওয়াক্ফদাতা একবার যদি কার্যকরীভাবে ওয়াক্ফ করার আকাঙ্খা ঘোষণা করে এবং মুতাওয়াল্লী হিসেবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে তা হলে কোনক্রমেই ঐ ওয়াক্ফ আগ্রাহ্য করা যাবে না এবং এ-ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী যদি সেটাকে ওয়াক্ফ নয় বলেও দাবি করে, তাহলেও তা বৈধভাবে সম্পাদিত ওয়াক্ফ বলে ধার্য হবে।[১৪৫] সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যদি কোন ব্যবস্থা ওয়াক্ফ বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে যে তা ওয়াক্ফ নয় বলে দাবি করবে, তাকেই তা প্রমাণ করতে হবে।

ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হলে ওয়াক্ফদাতার প্রকৃত ইচ্ছা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ দলিলক্রমে সম্পাদিত হলে, শুধু এর অর্থ দ্ব্যর্থক হলে ওয়াক্ফকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচারে জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১৪৬]

ওয়াক্ফ প্রত্যাহার ও পরিবর্তন এবং শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ:

ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে যদি ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে ওয়াক্ফকারী যেকোন সময় তা প্রত্যহার করতে পারেন। মৃত্যুশয্যায় সৃষ্ট ওয়াক্ফ সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ ওয়াকফের ক্ষেত্রেতা প্রযোজ্য হবে না। যদি ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে না হয় এবং ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফ করার সময়ে প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেয় তাহলে ঐ ওয়াক্ফ বৈধ হবে না। তবে ওয়াক্ফ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সংরক্ষিত না রাখতে পারলে ওয়ক্ফ হতে যারা উপকৃত হবে তাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখতে পারেন। ওয়াক্ফ সৃষ্টির সময় তা হতে যারা উপকার পাবে তাদের সংখ্যা অথবা তাদের অংশ কম-বেশি করার ক্ষমতা ওয়াক্ফদাতা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারেন।[১৪৭]

উক্তরূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ ব্যতীত ওয়াক্ফকারী তা সৃষ্ট ওয়াক্ফের শর্তাবলি পরিবর্তন করতে পারে না, অথবা মুতাওয়াল্লীদের সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও করতে পারে না। ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও অংশ হ্রাসের ক্ষমতা তিনি এমন ভাবে করতে পারেন না, যার ফলে কোনও সম্পত্তি ওয়াক্ফ হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। অথবা ওয়াকফের কোনও উদ্দেশ্য তিনি এমন ভাবে পরিবর্তন করতে পারেন না, যার ফলে একটি বৈধ উদ্দ্যেশের স্থলে একটি অবৈধ উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে।[১৪৮]

---

১৪৪. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১

১৪৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১

১৪৬. Kulsom Bebee v. Golam Hoosein (1905) 10, CWN, 449, 448

১৪৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬-৩০৭

১৪৮. আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফদাতা ইচ্ছা করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করতে পারেন। সে-পরিবর্তনের ক্ষমতা তার নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারেন, আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত করতে পারেন কিংবা নিজের ও অন্যের উভয়ের উপর তা ন্যাস্ত রাখতে পারেন। যার উপরই ন্যস্ত করা হোক না কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে সে ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অবস্থা দু-রকম হতে পারে : এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং আরেক অবস্থায় তা বৈধ নয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যদি অচল হয়, তা কোন উপকারে আসে না, সে-অবস্থায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন : (ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, কিংবা (খ) ফসল জন্মালেও যার ব্যয় আয়ের চেয়েও বেশি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত সে-সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে থাকলে এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে-অবস্থায় সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না।[১৪৯]

কোন ওয়াক্‌ফের কার্যকারিতা কোন অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হলে ওয়াক্‌ফটি অচল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করে তার সাথে এরূপ শর্ত যোগ করে দেন যে, তিনি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, কেবলমাত্র তাহলেই ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে; তাহলে ওয়াক্‌ফটি অচল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এক্ষত্রে ওয়াকফের কার্যকারিতা ও ওয়াক্‌ফদাতার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার মত একটি অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি এরূপ একটি শর্ত আরোপ করনে যে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হতে তার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে হবে, অথবা তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি তার ব্যক্তিগত কার্যে ব্যয় করবেন, তাহলে ওয়াক্‌ফ অচল বা অবৈধ হবে না। কারণ, এখানে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা অনিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে ওয়াক্‌ফদাতা তার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হতে তার দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[১৫০]

ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যাবলি :

ইসলামি আইন অনুসারে যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হবে তা অবশ্যই ধর্মীয় বা নেকীর কাজ বলে স্বীকৃত হতে হবে। ওয়াকিফ পরিবার, পুত্র-কন্যা অথবা বংশধরদের জন্য তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। ওয়াক্‌ফ যেসব উদ্দেশ্যে করা যায় সেগুলি হলো :

মসজিদ নির্মাণ ও ইমামের বেতন-ভাতা প্রদান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ ও সংক্ষণ এবং তথায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান; পয়ঃপ্রণালী, বাঁধ ও পাঠশালা বা সরাইখানা নির্মাণ বা মেরামত; গরিবদের জন্য দান-খয়রাত এবং মক্কা শরীফে গিয়ে গরিব ব্যক্তিগণ যাতে হজ্জব্রতপালন করতে পারে; সেজন্য তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দান;[১৫১] জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ইয়াতিম, বন্দি এবং দুঃখীদের আল্লাহর ওয়াস্তে দান খয়রাত করা এবং আত্মীয় ও পোষ্যদে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা; ঈদগাহে অনুদান দেওয়া; মহানবী (স.)-এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী তথা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন করা; পবিত্র মহরম মাসে গরিব-দুঃখীদের খাওয়ানো ও দান করা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইয়াতিমখানা, ধর্মীয় ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পরিচালনা, মেরামেত ও সংরক্ষণ করা এবং বেওয়রিশ ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা; পবিত্র কুরআন শরীফ

১৪৯. রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃ ৪২৪; ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ২২৮

১৫০. গাজী শামছুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮

১৫১. আল হিদায়া, ২য় খন্ড, পৃ ৫৪৪-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ্য স্থানে এবং গৃহে তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা; ওয়াকিফ ও তার পরিবারের বাৎসরিক ফাহিতা সম্পন্ন করা;[১৫২] পবিত্র মক্কায় হাজীদের জন্য 'বোরাত' বা বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা; ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করা; দরগাহ/মাযার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা;[১৫৩] ইমাম বাড়া মেরামত;[১৫৪] খানকা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণ; মসজিদে বাতি দান ইত্যাদি।

অবৈধ উদ্দেশ্যাবলি:

ইসলামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী, যেমন-কোন গীর্জা বা মন্দির নির্মাণ কিংবা সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ;[১৫৫] ওয়াক্ফকারীর দাস-দাসীর ভরণ-পোষণ; ওয়াক্ফকারীরর সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ নয়, এমন কোন ব্যক্তির ভরণ-পোষণ;[১৫৬] তাৎক্ষণিক দান হিসেবে প্রদত্ত হলেও একান্ত ভাবে আগন্তুকের পক্ষে সৃষ্ট কোন ওয়াক্ফ অবৈধ; ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে প্রতি বৎসর কাদসি মেমনদেরকে ভোজ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কোন নির্দেশ থাকলে তা অবৈধ হবে।[১৫৭]

উল্লেখযোগ্য যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ না করলে বা না থাকলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চিয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তার সাথে ওয়াকফের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফটি বাতিল হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য সমূহের নামোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; অথবা যেখানে উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যকেটি উদ্দেশ্যে কত টাকা খরচ হবে তা উল্লেখ করার কোন আবশ্যকতা নেই।[১৫৮]

ওয়াকফের উদ্দেশ্য হিসেবে যদি কেবলমাত্র 'দাতব্য ও জনহিতকর কার্য' অথবা 'ধর্মীয় কার্য' অথবা 'মুতাওয়াল্লী যাকে নেকীর কাজ বলে মনে করবেন, সেই কাজ' প্রভৃতি উল্লেখ করা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোন ওয়াকফের উদ্দেশ্য যদি 'সৈয়দগণকে, অর্থাৎ রাসূলের বংশধরগণকে অর্থ দান করা' হয় তা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, কে বা কারা যে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের বংশধর, তা নির্ণয় করা অসম্ভব।[১৫৯]

কোন ওয়াক্ফ একাধিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হলে এবং পৃথক-পৃথক উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক পরিমান সম্পত্তি নির্দিষ্ট থাকলে, কতিপয় উদ্দেশ্য যদি বৈধ এবং কতিপয় উদ্দেশ্য অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অবৈধ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির ওয়াক্ফ বহাল থাকবে না। সেক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তিই বৈধ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে, কোন ওয়াক্ফ অন্যান্য সকল দিক থেকে বৈধ হয়ে থাকলে এবং ওয়াক্ফনামায় দান করার সদিচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকলে যে নির্দিষ্ট অর্থে ওয়াক্ফ করা হয়েছে; তা কোন কারণে ব্যর্থ হলে ওয়াক্ফের সম্পত্তি দরিদ্রদের উপকারের জন্য অথবা তার নিকটতম অপর কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।[১৬০]

---

১৫২. 'ফাতিহা' অর্থ মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা এবং তৎসহ গরিব-দুঃখীকে ভিক্ষা দান করা।

১৫৩. D. F. Mollah, Pinciples of Mohammadan Law (Calcutta: Eastern Law House, 1555), P. 164

১৫৪. কোন বাসগৃহ বা ইমারতের কোনও অংশকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা হলে তাকে ইমাম বাড়া বলা হয়ে থাকে।

১৫৫. আল হিদায়াহ, ২য় খন্ড, পৃ ৫৫৩

১৫৬. গাজী শাছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫

১৫৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫, সূত্র, Abudlkarim v. Rahima (1946) 48 Bom, L. R. 67 ('48) A.B. 342

১৫৮. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬

১৫৯. আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫, সূত্র, Abudlkarim v. Rahima (1946) 48 Bom, L. R. 67 ('48) A.B. 342

১৬০. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফের শ্রেণী বিভাগঃ

ওয়াক্ফ প্রধানত দু-প্রকার (ক) ওয়াক্ফ আলাল খায়ের বা কল্যাণকর ওয়াক্ফ এবং (খ) ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্ফ। প্রথমোক্ত ওয়াক্ফ অনুযায়ী কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণের জন্য দান করা হয়। ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ অনুসারে ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা হয়। এ-ধরণের ওয়াক্ফে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের নামের সাথে কল্যাণকর কাজের কথাও থাকে।

ওয়াক্ফ আলাল খায়েরকে ওয়াক্ফ লিল্লাহ্‌ও বলা হয়। মসজিদ, ঈদগাহ্, মাদ্রাসা, কবরস্তান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যেকোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা যায়। এরূপ ওয়াক্ফ দ্বারা নী-গরিব সকলেই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্যই এরূপ মসজিদে সালাত আদায় করা, কবরস্তানে দাফন করা, মুসাফিরখানায় অবস্থান করা এবং কূপের পানি ব্যবহার করা বৈধ।

ওয়াক্ফ করার সময় কবরস্তানে গাছপালা থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্তান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছপালা ওয়াক্ফকৃত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়। ওয়াক্ফ করার পর কবরস্তানে যদি বৃক্ষাদি জন্মায়, তবে তা হবে রোপণকারীর। রোপনকারী অজ্ঞাত থাকলে সে-বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবরস্তানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[১৬১] মহানবী (স.) মুসাফিরদের জন্য একখন্ড জমি ওয়াক্ফ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার জন্য 'রুমা' নামক কূপ ক্রয় করে তা ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।[১৬২]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা খুবই পূণ্যের কাজ। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ দু-ভাবে হতে পারে : মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান এবং মসজিদের উন্নয়ন কার্য ও আসবাবপত্রসহ খরচাধির জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করলে তা সমর্পণ না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পণ কথা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্ফদাতা যদি এ-কথা বলেন যে, 'আমি এ জমিতে মসজিদ বানালাম', তবে তা-ই যথেষ্ট। এর দ্বারাই তা মসজিদরূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, মসজিদের ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং জামাতের সাথে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আজান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরি। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না এবং আ মসজিদরূপে গণ্য হয় না।[১৬৩]

মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার পর ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না এবং তা বিক্রি করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাতে আরো মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকে না। মসজিদের উন্নয়নকার্য ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরিব-দুঃখীদের সাহায্যের কথা যে করাও বৈধ এবং তা না করলেও ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। গরীবদের সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হলে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে। এমনিভাবে গাছ-পালা ও টাকা-পয়সা ওয়াক্ফ করা যায়। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ-উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়, সাজ-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্ধৃত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রের মাঝে বন্টন করা যাবে না।[১৬৪]

---

১৬১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ ৪৭৪

১৬২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড (দেওবন্দ: মাকতাবা মুস্তফা, ১৩৯৯ হি.) , পৃ ৩৮৯

১৬৩. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩

১৬৪. দ্র. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ ৪৬০-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ আলাল আউলাদ সম্পর্কে বলা হয়, কোন মুসলিম তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তার আয় হতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি বা বংশধরদের আর্থিক সাহায্য বা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া তিনি নিজের সারা জীবনের ভরণ-পোষণ এবং নিজের দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[১৬৫] এরূপ ওয়াক্ফকে ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বলা হয়। এরূপ ওয়াকফের একটিমাত্র শর্ত হলো-এর উপকার ও সুবিধা ভোগের অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেষপর্যন্ত দরিদ্রের জন্য, অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। ওয়াক্ফদাতার পরিবার, সন্তান-সন্ততি দরিদ্রের জন্য বা ধর্মীয় কার্যে ব্যবহার করা যাবে না বলে এই প্রকারের ওয়াক্ফ অচল বা অবৈধ হবে না। এরূপ কোন ওয়াক্ফ নামায় যদি সম্পত্তি ফারায়েজ করার কোন নিয়ম বর্ণিত না থাকলে পুরুষ ও মহিলাগণ সমান অংশে ভাগ পাবেন এবং ভাই-বোনের ও তাদের সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতা হিসেবে ভাগ না পেয়ে একসঙ্গে ভাগ পাবেন।

আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলে মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ওয়াকফের আয় থেকে তাদেরকে মাথা পিছু সমানহারে বন্টন করা হবে। শুধু আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফদাতার মা, বাবা, দাদা ও ঔরসজাত সন্তান তা অন্তর্ভূক্ত হয় না। পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে।[১৬৬]

সাদাকাতুল ফিতরঃ

রমযান মাস শেষ হওয়ার পর ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়ালের ১লা তারিখে প্রতিটি মুসলমান স্বেচ্ছাকৃতভাবে গরীবদের মধ্যে যে খাদ্য বন্টন করে থাকে ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসরা তাকে যাকাত নামে অভিহিত করেছেন।

হাদীস এবং অন্যান্য প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (স.) দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেই যাকাতুল ফিতরের আদেশ জারি করেছিলেন।[১৬৭] তিনি (স.) ফিতরার পরিমাণও নির্ধারিত করে দিয়েছিলে। আবদুল্লাহ বিন উমর হতে বর্ণিত আছে, "রসূলুল্লাহ (স.) সদকায়ে ফিতরা হিসাবে এক সা'খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন এবং পরাধীন (গোলাম) মুসলমানের উপর ফরয করে দিয়েছেন।[১৬৮] খেজুর এবং যব ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যও সদকাতুল ফিতর হিসাবে দেয়অ চলে। "আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, আমরা সদকাতুল ফিত্র হিসাবে এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনীর অথবা এক সা' যাবীব (শুষ্ক আংগুর) দিতাম।[১৬৯]

ইদুল ফিতরের দিন ইদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সদকাতুল ফিত্র দিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ (স.) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তাঁর সদকাতুল ফিত্র দিয়ে দিতেন। এর ফলে ফকীর মিসকীনরা ঘুরে সওয়াল করতে গিয়ে নামায থেকে গাফেল (অন্যমনস্ক) হয়ে পড়ে না বরং আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলমান ভাইর সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।[১৭০]

১৬৫. আল হিদায়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫৫১
১৬৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৯–৮০
১৬৭. ইবনে জরীর তাবারী, তারিখে তাবারী, মিশর, পৃ. ১২৭১
১৬৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত যাকাত।
১৬৯. প্রাগুক্ত
১৭০. আল হিদায়া, ১ম খন্ড, কিতাবুত যাকাত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে সাহাবা কেরাম যাকাতুল ফিতরকেও একটি সুশৃঙ্খল খয়রাতে (দান) রূপ দান করেন। অধিকাংশ সাহাবা দু'একদিন পূর্বেই তাঁদের সদকাতুল ফিত্‌র বায়তুলমালে পাঠিয়ে দিতেন। "আবদুল্লাহ বিন উমর ঈদুল ফিতরের দু'তিন দিন পূর্বেই যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারির কাছে তার নিজের যাকাতটি (যাকাতুল ফিত্‌র) পাঠিয়ে দিতেন।[১৭১] ইমাম বুখারী লিখেছেন, "লোকেরা (তাদের সদকা) সরাসরি ফকীর-মিসকীনকে না দিয়ে ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিকে দিয়ে দিত, যাতে সব মাল একত্রিত হয়ে পরবর্তী সময়ে ইমাম কর্তৃক (গরীবদের মধ্যে) সুচারুরূপে বণ্টিত হয়।[১৭২] "খোদ রাসূলুল্লাহ (স.) সদকায়ে ফিতর একত্র করার জন্য আবূ হুরায়রাকে কর্মচারি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।"[১৭৩]

"এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত যে, যাকাতুল ফিত্‌র মুসলমান অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কেননা রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এদেরকে (গরীব-মিসকীনদেরকে) ঐদিন (ঈদের দিন) সওয়ালের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

যিম্মী ফকীরদেরকে ফিতরা দেয়া জায়েয কিনা-এ সম্পর্কে ফকীহরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। জমহুর ফুকাহার মতে জায়েয নয়; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে জায়েয। জমহুর ফুকাহার মতে, গুরবত (দারিদ্র) এবং ইসলাম-এই দুই শর্তেই গরীবদেরকে সদকাতুল ফিতর দেয়া হয়। অতএব যিম্মীরা এটা পেতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে, গুরবতের কারণেই অন্যকে সদকা দেয়া হয়। অতএব যিম্মী গরীবরাও সদকা পাওয়ার যোগ্য।"[১৭৪]

যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে গরীবরা উৎকৃষ্ট ধরনের খাবার পায়। এছাড়া উশরের নামে মুসলমানদের কাছ থেকে শস্যের আকারে যে কর আদায় করা হয় তারও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীবদেরকে উৎকৃষ্ট জাতের শস্যের মধ্যে অংশীদার করা যাতে এগুলো খেয়ে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেছেন, "হে মুসলমানগণ, তোমরা যা কামাই-রোজগার করেছ আর আমরা জমি থেকে যা উৎপন্ন করে দিয়েছি তার মধ্যে যা 'হালাল ও উৎকৃষ্ট' তা হতে (সৎকাজে) ব্যয় কর।"[১৭৫]

মোহর ও নাফাকাত:

বিবাহের জন্য স্বামী যে অর্থ স্ত্রীকে দান করে তাকে মোহর বলে। মোহর এমন সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। এটা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সম্মাননা। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক স্ত্রীকে এই সম্পদ পরিশোধ করা আবশ্য কর্তব্য (ফরয)। সাধারণভাবে দেনমোহরকে দান কিংবা প্রীতি উপহার হিসেবে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর কোন দান কিংবা উপহার নয়। বরং অপরিশোধিত দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায় বা ঋণ। পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর দেনমোহর যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে স্বামীকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। স্বামীর সামর্থ এবং স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদা এবং সদগুণাবলীর ওপর ভিত্তি করে দেনমোহর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মোহর স্ত্রীদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। একজন বিবাহিতা নারী তার স্বামীর কাছ থেকে প্রথম ও প্রধান অধিকার হচ্ছে মোহর প্রাপ্তি। আল্লাহপাক সন্তোষসহকারে (ফরয মনে করে) মোহরানা আদায়ের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমরা যদি তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে দিও না।'[১৭৬]

---

১৭১. ইমাম মালিক, মহাত্মা, মিশর, কিতাবুত যাকাত।
১৭২. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত
১৭৩. ইবনে জরির তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
১৭৪. হিদায়াতুল মুস্তাহিদ, ১ম খন্ড, যাকাতুল ফিতর, পৃ. ২৫৬
১৭৫. আল-কুরআন, ২:২৬৭
১৭৬. আল-কুরআন, ৪:২০

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা নারীদের তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; তবে তারা মোহরের কিয়দংশ সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।[১৭৭] হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের, যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ।[১৭৮] ইসলামে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীর মোহরানা তাকেই পরিশোধ কর। তার (স্ত্রীর) অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে। স্ত্রীর দেনমোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটি ঋণ। অন্যান্য ঋণ পরিশোধ যেরূপ জরুরী, দেনমোহরও তেমনি সন্তুষ্টিচিত্তে পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য। অনেক স্বামীর মধ্যে এরূপ প্রবণতা বিদ্যমান, স্ত্রীকে অসহায় মনে করে, চাপ প্রয়োগ কিংবা জোর-জবরদস্তি করে দেনমোহর মাফ করিয়ে নেয়া; যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই সমর্থনযাগ্য নয়।

মোহরের অর্থ দরিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলাম নারীদের মোহরানার অধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করেছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, 'হযরত আবদু রহমান ইবনে আওফ (রা.) খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী যদি নারীদের মোহরানা বিয়ের দিন অথবা বিয়ের কিছুদিন পর পূর্ণ মোহরানা বা আংশিকও পরিশোধ করা হয় তবে সে মোহরানাই হতে পারে নারীদের জন্য সদ্যমুক্ত পুঁজি (intrerest free capital) যা বিনিয়োগ করে নারী তার পছন্দমত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে।[১৭৯]

মোহরানার অর্থ বিনিয়োগ নারীকে ঋণের ঝুঁকি, সুদের অক্টোপাস, বেসরকারী সংস্থার নানা শর্ত থেকে মুক্ত রেখে লাভজনক সহায়তা করবে। বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা সে পরিবারসহ যে কোন কাঙ্খিত সামাজিক কাজে ব্যয় করে প্রশান্তি অনুভব করতে পারে। বস্তুতঃ মোহরানাই হতে পারে দরিদ্র নারীদের জন্য প্রথম সুদমুক্ত পুঁজি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করার প্রথম আর্থিক উৎস।[১৮০]

স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস, সন্তান লালন-পালন, পরির্যা ইত্যাদির নিমিত্ত যে অর্থ ইসলামের বিধান মোতাবেক বর্তায় তাকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'নাফাক' বলে।[১৮১] একজন নারীর ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার হচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার। স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। সূরা আন নিসার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুরুষরা হচ্ছে নরীদের কাজকর্মের উপর প্রহরী (তত্ত্বাবধায়ক), কারণ আল্লাহ এদের একজনকে আরেকজনের উপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, (পুরুষের এই মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হচ্ছে পুরুষ তার জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[১৮২]

যে কোন অবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের। পুরুষদের কাছ থেকে ভরণ- পোষণ পাওয়া নারীদের জন্য করুণা নয় বরং ন্যায্য অধিকার। স্বামীর বাড়িতে যাবার পূর্বে কণ্যার জন্য তার পিতা যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। কোন নারী বিধবা হলে, তার নিজের সঙ্গতি না থাকলে তার বাবা এবং বাবার অবর্তমানে ভাই তার বোনের ব্যয়ভারের দায়িত্ব বহন করবে। অন্যকথায় নারীর যাবতীয় ব্যয়ভার এক বা অন্যভাবে স্বামী, বাবা ও ভাই অর্থাৎ পুরুষের

---

১৭৭. আল-কুরআন, ৪:৪
১৭৮. আল-কুরআন, ৬:৫০
১৭৯. মোঃ নুরুল ইসলাম, ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বণ্টন, আহসান পাবলিকেশন্স ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৮৭
১৮০. আল ওয়াসিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪২
১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২
১৮২. আল-কুরআন, ৪:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কাঁধে দেয়া হয়েছে। নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়ে ইসলাম নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে। যেকোন অবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের। পুরুষদের কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া নারীদের জন্য করুণা নয় বরং ন্যায্য অধিকার। ন্যায্য ও উত্তমভাবে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা যাবে না। কুরআনে নাফাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে (তালাক প্রদত্ত নারী প্রসঙ্গে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর তাদেরও সেখানে বাস করতে দেবে, সংকটে ফেলার জন্য তাদের উত্যক্ত করবে না, তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারীর তার পক্ষ স্তন্য দান করবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চাইতে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।[১৮৩]

শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করা। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ- পোষন করা,স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ দিতে আইনত বাধ্য নন। আত্মীয়-স্বজন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ প্রতিবেশীকেও এ আওতায় আনা হয়েছে। এমন কেউ কি আছে যার কোন গরীব আত্মীয় নেই। দারিদ্র্য দূরকীরণে নাফাকাত বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর পূর্তি করে খায় আর পার্শ্বে তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।[১৮৪]

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে নবী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দাহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক। আমি আপনাকে কি করে খাবারদিতাম আপনি যে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক? তিনি জবাবে বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে তখন খাবার দিতে তাহলে (আজ) আমার কাছে তা পেয়ে যেতে।'[১৮৫]

স্বয়ং আল্লাহ যেখানে বুভুক্ষ মানুষের পক্ষে কথা বলবেন সেখানে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জান্নাতে যাওয়ার জন্য যা করণীয় তার অন্যতম হচ্ছে বুভুক্ষকে খাদ্য দান। হাদীসে আছে, 'তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, (দরিদ্রকে) অন্ন দান করবে এবং সালামের প্রচলন করবে তাহলে স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮৬]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, জাহান্নামের কঠোর শাস্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে অভাবীদের খাদ্য দান না করা। ইরশাদ হয়েছে, "ধর, একে, গলায় বেড়ী লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে। (কারণ) নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবীদের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।

---

১৮৩. আল-কুরআন, সূরা-তাআলাক্ব, ৬:৭

১৮৪. মুসলিম শরীফ।

১৮৫. মুসলিম শরীফ।

১৮৬. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

Dhaka University Institutional Repository

কাফ্ফারাহ ও ফিদিয়াঃ

ইসলামী সমাজে শরীআতের কোন কোন নির্দেশ যথাযথভাবে মানতে না পারলে অর্থাৎ কোন অবাঞ্ছিত কাজ বা পাপ কর্ম হয়ে গেলে সে পাপ স্খলনের জন্য যে দন্ড দিতে হয় তাকে কাফফারাহ বলে। যেমন- রোজা ভঙ্গ করার কাফ্ফারাহ, কসম ভঙ্গ করার কাফফারাহ, জিহার (নিজ স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মায়ের বা বোনের অঙ্গের সাথে তুলনা) করার কাফ্ফারা ইত্যাদি। এসবের কাফফারাহ হলে রোজা রাখা, মিসকিন-অসহায়দের নির্দিষ্ট দিনের খাদ্য দেয়া, দাসমুক্ত করা ইত্যাদি। ইসলামী সমাজে কাফফারাহ ব্যবস্থা নির্দেশে গরীব-অসহায়দের সাময়িক বাঁচার পথ উন্মুক্ত পথ উন্মুক্ত হয় বা জীবন চলার পথ সুগম হয়।

আবার যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অপারাগ হলে কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে সেসব লোকের বেলায় রেজা না রেখে রোজার বদলা 'ফিদিয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে।[১৮৯]

একটি রোজার ফিদিয়া অর্ধ সা'গম বা তার মূল্য। অর্ধ সা' প্রায় দুই কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার মূল্য কোন মিসকিনকে দান করলে ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনরাই উপকৃত হয়।[১৯০]

উদহিয়্যা বা কুরবাণীঃ

উদহিয়্যা হচ্ছে কুরবাণী। এর আভিধানিক অর্থ আত্মত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা। ইসলামের পরিভাষায়, আল্লাহকে নিজের জীবন ও ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে সে মহান মালিকের ইচ্ছানুযায়ী তারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এগুলোকে তারই পথে ত্যাগ করার নির্দেনস্বরূপ নির্দিষ্ট পন্থায় পশু যবেহ করার নামই হচ্ছে করবাণী। কুরবাণীর গোশ্ত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয় স্বজন ও গরীব দুঃখীদের মধ্যেও বণ্টন করা যায়। কুরবাণী পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ গরীব দুঃখী, অভাব প্রস্তদের মধ্যেই বণ্টিন হয়। ইয়াতিম, অসহায়দের দান করা করা যায় কিংবা দরিদ্রদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য কেউ কোন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকলে তাতেও দান করা যায়।[১৯১]

আকীকাহ ও নযরঃ

সন্তান জন্মের পর সন্তানদের মঙ্গল কামনায় হালাল গৃহপালিত পশু যবেহ করাকে আকীকাহ্ বলে। আকীকাহ্র গোশ্ত সন্তানদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন খেতে পারে। এ গোশত অভাবগ্রস্তদের মধ্যেও বণ্টন করা যায়। আকীকাহ্র পশুর চামড়া দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতে হয়। এতে দরিদ্র লোকজন উপকৃত হয়।

আবার 'নযর' অর্থ নজরানা, মানত ইত্যাদি। কোন মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করতে হয়। এতে মনোবাসনা পূর্ণ হলে ঐ মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানত আদায় করলে এর মাধ্যমে গরীব দুঃখীরাই উপকৃত হয়।

---

১৮৭. আল-কুরআন, ৬৯: ৩০-৩৪

১৮৮. আল-কুরআন, ৫:৮৯

১৮৯. আল-কুরআন, ২:২৮৪

১৯০. আল ওয়াসিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮৯

১৯১. নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত), দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

হিবা ও সাদাকাহঃ

যদি কোন সম্পত্তি কোন প্রতিদান গ্রহণ ব্যতিরেকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে হিবা বলে। হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। হিবা জনল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি ভাল উপায়। মহানবী (স.) হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।[১৯২]

সাদাকাহ বা দানশীলতা হচ্ছে একটি বিশেষ মানবিক গুণ। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সকল কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা থেকে আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে দানশীলতা অন্যতম প্রধান। অপরের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে এবং বিনা শর্তে ও স্বার্থ ত্যাগ করে দানের প্রবণতাকে দানশীলতা বলা হয়। দানশীলতার বিশেষ রূপই হচ্ছে সাদাকাহ। ইসলামের অন্যতম সমাজসেবা পদ্ধতি হচ্ছে এই সাদাকাহ বা দানশীলতা। সাদাকাহ বা দানের মূল লক্ষ্য হল, সমাজের আর্ত-পীড়িত, দুঃস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাহায্য করা। মানব সমাজে দানশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রেরণা মানব মনে হঠাৎ করে আসেনি কিংবা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা নির্ভর সমাজকল্যাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেও গড়ে উঠেনি, বরং ধর্মীয় প্রেরণা ও মানবতাবাদী আদর্শই মূখ্যত মানুষকে দানশীল হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করেছে।[১৯৩] দানশীলতার লক্ষ্য আর্ত-পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাতে তাদের সমস্যা লাঘব হয়। এরূপ সাহায্য প্রধানত ধনবান ব্যক্তিরাই পারলৌকিক মুক্তি, ইহলৌকিক পাপমোচন, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি লাভের আশায় প্রদান করে থাকে। তাছাড়া দানশীলতা বা সাদাকার মাধ্যমে মানবপ্রেমিকগণ মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভের বাসনাও চরিতার্থ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হয়। শুধু যাকাত প্রদান করলেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পর সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করারও দায়িত্ব রয়েছে। তাই সাদাকাহ বা দান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। আল-কুরআনে সাদাকাহ বা দান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের (বিত্তশালীদের) ধন সম্পদে অভাবগ্রস্ত প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[১৯৪] "যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" "যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে।" "যদি এমন বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।" "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন।" "যারা আল্লাহর পথে নিজ সম্পদ ব্যয় করে; তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।"[১৯৫] "হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিজক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যদি না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব।"[১৯৬]

---

১৯২. আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯

১৯৩. সৈয়দ শওকতউজ্জামান, সমাজ কল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রুহেল পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৮০

১৯৪. আল-কুরআন, ৫১:১৯

১৯৫. আল-কুরআন, ২:২৬২ ; ৭১:৬১

১৯৬. আল-কুরআন, ২:২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সাদাকা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এটা দানশীলতার ব্যাপক পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তবে সাদাকার সাথে যাকাতের যথেষ্ট মিল আছে। মালের যেমন যাকাত প্রদান করতে হয়, তেমনি জানের সাদাকাও করতে হয়। নিজস্ব জান-মালকে পরিচ্ছন্ন ও হালাল করার সাথে সাদকা এবং যাকাত প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে যাকাত যেমনি বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ করতে হয় সাদাকার ক্ষেত্রে তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। স্বেচ্ছাধীনভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সাদাকা প্রদান করে থাকেন। বিপদ-আপদে কিছু মানত করা, মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত কিংবা অসুস্থ্য ব্যক্তির আরোগ্য উপলক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় দান করাও সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।[১৯৭]

জারাইর ও মিনাহ:

দরকার মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই জারাইর। মহানবী (স.) এক্ষেত্রেও নিজি অগ্রণী ভূমিকা পালক করেছেন এবং সকলকে উৎসাহিত করেছেন।[১৯৮]

দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ম্যাকানিজম হচ্ছে মিনাহ। এ ম্যাকানিজম উৎপাদনমুখী কোন সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী (সা.) স্বয়ং এই ম্যাকানিজমের শুভ সূচনা করেন। মদীনার সামর্থ্যবান সাহাবারা মক্কা থেকে হিজরতকৃত মুহাজিরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। মহানবী (স.) এর হাদীস থেকে অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধেল পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ী এই ছয় ধরনের মিনাহ এর কথা জানা যায়।[১৯৯]

উপরোক্ত ম্যাকানিজমগুলো কার্যকরী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। যার ফলে দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়ে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে 'সাহেবে নেসাব' হতে পারে। ইসলাম এভাবে বাধ্যতামূলক, ওয়াজিব ও ঐচ্ছিক হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাজে অর্থ ও সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। বলা বাহুল্য, সমকালীন অর্থনীতিতে এরূপ সম্পদ বণ্টনের কোন ব্যবস্থা নেই। এটি ইসলামী অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

---

১৯৭. আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২৩৬

১৯৮. ড. হাসান জামান, ইসলামে অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশ, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ৪৬

১৯৯. Dr. Ziauddin Ahmed, Islam, Proverty and income distribution, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1991, P. 44

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন

* বাংলাদেশে সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র ও ইসলামী নীতিমালা
* যাকাত আদায় ও বণ্টন
* ওশর আদায় ও বণ্টন
* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় ও ব্যয়
* কর্জে হাসানা, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানী ও সাদাকার আয় ও ব্যয়
* বাংলাদেশে মীরাসী সম্পত্তির আয় ও ব্যয়
* কর্মসংস্থান ও ব্যাংকিং ব্যবসা
* কৃষি ও শিল্প সম্পদের আয় ও ব্যয়
* জুয়া প্রতিরোধে ইসলামী বিধান
* বাংলাদেশে সুদ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান
* বাংলাদেশে ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান
* চুরি, ডাকাতী, ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র ও ইসলামী নীতিমালা:

ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী সমাজে আয় ও ধনবন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আকিদা মুতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই ব্র স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। তাকে নিরংকুশ মালিকানা দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা অনেকটা বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যের সম্পর্কের মতো। বাড়ীর মালিকই হলো প্রকৃত মালিক, ভাড়াটিয়া বা ইজারা গ্রহীতা কতকগুলো শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সেই বাড়ী বসবাস বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন। শর্তের মধ্যে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করা ছাড়াও থাকতে পারে দেয়াল ভাংগা বা জানালা বদলানো যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, ছাদে বাগান করা যাবে না ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কতকগুলো শর্ত পালন সাপেক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিনিধি মানুষ বা ইনসানকে তাঁর সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন।

ইসলামে স্বেচ্ছাধীনভাবে আয়ের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ভোগ ও ব্যয়েরও কোন সুযোগ নেই। এই মূল দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসে সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"হে ঈমানদারগণ! একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।"[১]

"অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"[২]

"ইহা জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীনদের জন্যে যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।"[৩]

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"[৪]

"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"[৫]

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[৬]

"তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত হয়েছে।"[৭]

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও প্রচুর নির্দেশ রয়েছে। যেমন:

"যারা দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চল্লিশ দিনের বেশী মজুদ রাখে তাদের সাথে আমার (অর্থাৎ রাসূলের) কোন সম্পর্ক নেই।"[৮]

---

১. আল-কুরআন, ৪:২৯
২. আল-কুরআন, ৯:৩৪
৩. আল-কুরআন, ২:২–৩
৪. আল-কুরআন, ৫৯:৭
৫. আল-কুরআন, ৫৯:৭
৬. আল-কুরআন, ১৭:২৭
৭. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৮. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, হাদীস নং-৪৬৪৮

Dhaka University Institutional Repository

"যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে প্রকৃত মুমিন নয়।"[৯]

"যারা অন্যকে ঠকায় ও অন্যের সাথে প্রতারণা করে তারা আমাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) মধ্যে নেই।"[১০]

"বর্গাদারী প্রথায় যদি কোন পক্ষের তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে তবে তা নিষিদ্ধ হবে।"[১১]

উপরোক্ত নির্দেশসমূহের আলোকে রাসূলে করীম (স.) তাঁর জীবদ্দশাতেই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহান খুলাফায়ে রাশিদূনও (রা.) সেই একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। সে সময়ে ইসলামী দুনিয়ার বিস্তৃতি ঘটেছিল অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে।

যাকাত আদায় ও বন্টনে ইসলামী নীতিমালাঃ

যাকাত আদায় এবং তার যথোচিত ব্যবহার সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত বা Have-notes বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটা দপ্তর বা Directorate ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুন ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্ত উপায়ে বণ্টনের জন্য। সেজন্যে গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না সে সময়ে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হলো সেদিনের আরবে দরিদ্র শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করছেন, পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন, শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এভাবে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে যাকাতকে ধনীদের জন্য অবশ্য দেয় এবং দরিদ্রদের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। আর এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। আল্লাহ্ দরিদ্রদের অধিকারকে তার নিজের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে নবী, তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত আদায় করে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন।" "তারা হচ্ছে সেসব লোক যাদের আমি রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, আর মানুষকে সৎ কর্মের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ।

১০. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, আসাহহুল মাতাবি, ১৯৩০, হাদীস নং-৩০১৩

১১. মিশকাতুল সাবাবিহ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"আর তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে বঞ্চিত ও প্রার্থনাকারীদের অধিকার রয়েছে।" "তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি এবং ব্যয় কর সেই ধন সম্পদ থেকে যাতে তিনি তোমাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।"[১২]

আল্লাহ্ তা'আলার সরাসরি নির্দেশে মহানবী (স.) যাকাত আদায়ের বিধান জারি করেছেন এবং যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তাঁর বাস্তবায়িত যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ও বন্টনরীতি প্রত্যেকেরই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)- কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় নবী করীম (স.) তাঁকে বললেন, "তুমি আহ্লে কিতাবদের এমন এক জাতির নিকট যাচ্ছ তুমি তাদেরকে প্রথমে কালিমার দাওয়াত দেবে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে, আল্লাহ্ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এ কথাও মেনে নিলে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ধন-মালের উত্তম অংশ তুমি নিয়ে নেবে না। আর মজলুমদের ফরিয়াদ অবশ্যই ভয় করবে। কেননা, তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন আড়ায় নেই।"[১৩]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও হাদীসের আলোকে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি স্পষ্ট হয়েছে যে, যাকাত একাকী নয় বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও সামষ্টিকভাবে বণ্টন করতে হবে। এজন্যই নবী করীম (সা.) রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত আদায় করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। তারা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের নিকট হতে যাকাত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা রীতিমত বণ্টন করতেন। খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের বিশেষত্ব হচ্ছে তা আদায় করে নিতে হয়, সংগ্রহ করতে হয়, যাকাত দেয়া দাতাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি।

এ দায়িত্বপালন করতে গিয়েই ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, "সম্ভবত ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম দরিদ্র, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেরই শোষণ করে আসছিল। কিন্তু তারা কোন শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায়নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে এ পর্যন্ত কেউ রাজি হয়নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথী সাহাবী (রা.)-গণ যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সৃষ্ট সংশয়ে বিভ্রান্ত হতে রাজি হননি। তাঁরা অকুণ্ঠিত চিত্তে যুদ্ধ করে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[১৪]

---

১২. আল-কুরআন, ২২:৪১, ৫১১৯, ৫৭ ৭

১৩. সহীহুল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৪০১

১৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২–২২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা না থাকলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজও আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ব্যক্তিগতভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ যাকাত হিসেবে দরিদ্র ও অভাবীদের দান করে থাকেন। এতে বিত্তশালী মুসলমানগণ ঈমানের দাবীকে কোন প্রকারে পূরণ করে যাচ্ছেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকারও পাচ্ছেন, কিন্তু যাকাত তার প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারছে না।

বর্তমানে যে নিয়মে যাকাত দেয়া হয়, তাতে দাতা অনুগ্রহ করে দেন এবং গ্রহীতা অসম্মানজনকভাবে দয়া হিসেবে তা গ্রহণ করে। অথচ এটা যাকাতদাতার অবশ্য কর্তব্য মনে করে দেয়া উচিত এবং গ্রহীতা তার হক পাচ্ছে বলে জ্ঞান করা উচিত। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাকাত গ্রহীতাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমে গ্রহীতার পর্যায় থেকে দাতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাত দানের ফলে দরিদ্র্য বিমোচন তথা ভাগ্যের কোন পরিবর্তন তো হচ্ছেই না: বরং এটা দরিদ্র শ্রেণীকে লালন করা হচ্ছে। তা ছাড়া যাকাত যে সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি, তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে যতদিন তা না হবে, ততদিন মুসলমানগণকে সম্মিলিতভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবুও অন্তত ইসলামের এ বিধানটি নামে মাত্র হলেও কার্যকরী থাকবে। নতুবা এ বিধানের কার্যকারিতা অবশ্যই একদিন হারিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ:

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে যাকাতের মাধ্যমে কত টাকাই বা আদায় হতে পারে? এ প্রসঙ্গে সঠিক ধারণার জন্যে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

(ক) বেসরকারী এক হিসাব মতে এদেশে এখন রাজধানী শহর হতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ/বাণিজ্যিক এলাকাতে যেসব কোটিপতি বাস করে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশী অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুত অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসেব করলে এবং প্রতিজন গড়ে ন্যূনতম টাকা ২.৫০ লক্ষ হিসেবে যাকাত আদায় করলে বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।[১৫]

(খ) এদেশের ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে আদায় হতে পারে তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণত: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৩ সালে যাকাত আদায় করেছে টা. ৪.৯৬ কোটিও বেশী। দেশে চালু অর্থ হতে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় যে নগদ টাকা জমা হয় এবং ব্যাংকগুলো তো অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অংশ মাত্র ০.৪% (অর্থাৎ প্রতি টা. ১,০০০ তে টাকা ৪/- মাত্র)। এই ০.৪% অর্থ কাজে লাগিয়েই যদি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড টাকা ৪.৯৬ কোটি যাকাত দিতে পারে তাহলে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর হতে হিসেব মতো ১,২৪০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, বীমা কোম্পানীগুলোকে এই হিসেবের আওতায় ধরা হয়নি।[১৬]

---

১৫. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৬৯

১৬. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

(গ) যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়াহ মুতাবিক তাদের সকলেরও যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। এরা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে এর পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঘ) যারা আয়কর দিয়ে থাকে তারা সকলেই সাহেবে নিসাব। এদের একটা অংশ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলেই সঠিক হিসাব মুতাবিক যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণও শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঙ) যেসব কোম্পানী (ঔষধ রসায়ন জ্বালানি প্রকৌশল খাদ্য বস্ত্র গার্মেন্টস সিরামিক সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি) সরকারকে আয়কর দেয় তাদেরও যাকাত দেওয়া উচিত। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবধকতা নেই। এরা যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস।

(চ) যেসব মহিলা ব্যাংকের লকারে স্বর্ণ অলংকার রাখেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া এদের অধিকাংশই যাকাত আদায় করেন না।

(ছ) শহরতলী ও মফঃস্বল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী আড়ৎদার হোটেল মালিক ঠিকাদারদের অনেকের মধ্যে যাকাত দেবার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ এসব ব্যক্তির অধিকাংশই সাহেবে নিসাব। এছাড়া পরিবহন ব্যবসা ইটের ভাটা হিমাগার কনসালটিং ফার্ম ক্লিনিক বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভুক্ত। এদের যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক শত কোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

(জ) যারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন, যারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা রেখেছেন ও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন, যারা পোষ্টাল সেভিংস একাউন্টে মেয়াদী আমানত রেখেছেন অথবা যারা আইসিবির ইউনিট ফান্ড ও মিউচুয়্যাল ফান্ডের সার্টিফিকেট কিনেছেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। এ খাত হতে বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।[১৭]

এক্ষেত্রে একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশের ব্যাংকসমূহে ২০০২–২০০৩ সালে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭,২৫১ কোট টাকা।[১৮] মেয়াদী আমানত যেহেতু এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে হয়ে থাকে এবং আমানতকারী স্বেচ্ছায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই জমা রাখে সেহেতু এর যাকাত উসুল করা ফরয। এই অর্থের ২.৫% হারে যাকাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ২,১৮১ কোটি টাকার বেশী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের ব্যয় ও ব্যবহার:

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে এ যাবত বেসরকারী ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নানা ধরনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দারিদ্র্য দূর হয়নি বরং চরম দারিদ্র্যের দিকেই গতি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। "১৯৮৫ সালে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী

---

১৭. প্রাগুক্ত
১৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

লোকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৯% । এক দশকের মাথায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯.২% । অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি লোক বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। সেই সঙ্গে চরম দারিদ্র্যের পরিমাণ ২১.৫% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০% এ উন্নীত হয়েছে। সুতরাং সরকারকে অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণমুখী এবং দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।"[১৯]

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয়, যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির এবং ক্ষেত্র বিশেষে নও-মুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে আজও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয়নি এবং তা বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অথচ খোলাফায়ে রাশেদা (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্য ৮টি দফতর ছিল।[২০] রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বণ্টনের জন্য।

যাকাতের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। কেননা যাকাত স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি; কোন সাময়িক পদ্ধতি নয়। যাকাতের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করে ফেলার জন্য ফিক্‌হবিদগণ দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি যাতে দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রয়োগের জন্যও ফকীহ্‌গণ তাকীদ দিয়েছেন। ইমাম নববী (র.) বলেছেন, "ফকীর ও মিসকীনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা তাদের অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।" "ইমাম শাফেয়ী (রা.) এ মত সমর্থন করেন।"[২১] তাঁর সমর্থক ফকীহ্‌গণ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রার্থীগণকে তাদের স্ব-স্ব কাজে (কুটির শিল্প, কৃষিকাজ, দোকান, দরজীর কাজ, কঠোর কাজ প্রভৃতি) স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন। ইমাম মালিক (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং অন্যান্য ফকীহ্‌র মত হল যে, প্রার্থী ফকির-মিসকীনকে নিজেসহ পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে।

---

১৯. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

২০. মহানবী (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদা (র.)-এর সময়ে যাকাতের অর্থসামগ্রী ও গাবাদীপশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিলেন। এরা হলেন:
* সায়ী-গবাদিপশুর যাকাত সংগ্রাহক
* কাতিব-করণিক
* কাসাম-বণ্টনকারী
* আশির-যাকাত প্রদানকারী ও প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী
* আরিফ-যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী
* হিসাব-হিসাব রক্ষক
* হাফিজ-যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক
* কায়াল-যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী

২১. ড. মুহাম্মদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ঢাকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ফকীর-মিসকীনকে কিছু দেবে, তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।"[২২] মোটের উপর যাকাত অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর এবং দ্বিতীয়বার যাকাত প্রার্থী না হবার অবস্থায় আনয়ন করতে চায়। সর্বনিম্ন এক বছর স্বচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে ধনীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, নিজের পকেট থেকে অর্থ বের করে দিলেই শুধু দায়িত্বপালন সম্পূর্ণ হয় না। অধিকন্তু অভাবগ্রস্তদের খুঁজে বের করে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর দিয়ে সাদাকাহ্ ও যাকাতের অর্থ তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ও ধনীদের পালন করতে হবে।

যাকাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করে না, বরং তা নির্মূল করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণই হবে না, বরং সমাজে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য হ্রাস পাবে।

যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কারণ সমাজে গরীব, অসহায়, দুঃস্থ ও বেকার লোকদের হাতে অর্থ বা ক্রয় ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যাকাত বণ্টন করে তাদের হাতে পৌঁছালে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং তারা পূর্বের চেয়ে বেশি পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে। ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। যাকাত এভাবেই ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করে। এই উৎপাদনকারীরাই যাকাত দেয়, যা আবার বর্ধিত মুনাফা হয়ে তাদের হাতেই ফিরে আসে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, প্রকৃতপক্ষে সেই যাকাতদাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে।"[২৩]

উৎপাদন বৃদ্ধি ও যাকাত পুঁজি তথ্য নগদ অর্থকে অলসভাবে ধরে পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখলে বছর বছর যাকাত দিতেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে যাবতীয় সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হয় যাতে কমপক্ষে যাকাতের হারের সমহারে আয় বাড়ানো সম্ভব হয়, অন্যথায় আসল থেকে যাকাত দিতে হবে। ফলে অর্থনীতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়, বেকার লোকদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাদের হাতে ক্ষয়ক্ষমতা আসে, চাহিদা বাড়ে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই যাকাত একদিকে ভোগ অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।"[২৪]

---

২২. ড. মাহমুদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৪

২৩. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

২৪. আল-কুরআন, ২:২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ হতে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাকাতের আরেক লক্ষ্য। দারিদ্র্য মানবতার প্রধান শত্রু। যেকোন দেশ ও সমাজের জন্য এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনা অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের সেই সোনালী যুগ হতেই।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সরকারী সাহায্য না হয় বিদেশী অনুদান। বস্তুতপক্ষে এদেশে এখন বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী অনুদান নিয়েই দরিদ্র জনগণ বিশেষত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তারা প্রধানত সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি হতাশা ব্যক্ত করে থাকেন যে, তাদের হাতে নগদ অর্থ নেই বলেই দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদি এদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাতের বিধানের মাধ্যমে আহরণ ও বিতরণ করা যায়; সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে তা ব্যবহার করা যায়, তা হলে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যই সম্ভব।

আমাদের দেশের অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি ২০/২৫ হাজার টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ যাকাত দিয়ে থাকেন। সাধারণত তারা এ টাকা থেকে ১০/২০ টাকা করে নির্দিষ্ট দিনে গরীব নারী-পুরুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন, বাকিটা শাড়ী-লুঙ্গীর মাধ্যমে বিতরণ করেন। কখনও কখনও তারা এলাকায় ইয়াতিম খানা বা মাদ্রাসার লিল্লাহ্ বোর্ডিং এ অর্থের টাকার কিছুটা দান করে থাকেন। এরা মুসাফির, ঋণগ্রস্থ, অসুস্থ লোকদের কথা আদৌ বিবেচনায় আনেন না। অথচ এরা যদি পরিকল্পিতভাবে এলাকার দুঃস্থ, বিধাব, সহায়-সম্বলহীন পরিবারের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রতি বছর অন্তত তিন অথবা চারটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য রিক্সা, নৌকা, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, সেলাই মেশিন, গাভী-ছাগল বা এ জাতীয় কোন উপকরণ কিনে দিতেন, তাহলে দেখা যেত তাদের প্রচেষ্টাই পাঁচ পাঁচ বছরে তাদের এলাকার অন্তত ২০/২৫টি পরিবার স্বাবলম্বী হয়ে যেত; ভিক্ষুক ও অভাবী পরিবারের সংখ্যাও কমত।

জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারার জন্য বহু ক্ষুদে চাষী ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। এদের এই ঋণও যদি পরিকল্পিতভাবে শোধ করে বন্ধক রাখা জমি ফিরিয়ে দেয়া যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে দেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেত।

এ জাতীয় পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাকাত প্রদানের জন্য বিত্তবানদের দৃষ্টি ফিরানো প্রয়োজন। তবেই যাকাতের অন্তর্নিহীত কল্যাণ অর্জন সম্ভব। সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনকল্পে বর্তমানকালে যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন এবং সেই তহবিল থেকেই দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশীয় উৎস হতেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় হতে পারে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দুঃস্থ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে আমাদের দেশের বিদেশী এনজিও নির্ভরশীলতা কমে আসবে।[২৫]

---

২৫. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪–৪৫

Dhaka University Institutional Repository

যেমন এপ্রসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কথা উল্লেখ করা যায়:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯৮২ সালে যাকাত ফান্ড গঠন করে। ১৯৮৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার অন্যতম কর্মসূচী ইসলামিক মিশন এর প্রবর্তন করেন। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হল- দুঃস্থ মানবতার সেবা, দারিদ্র দূরীকরণকল্পে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুশীলন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ইসলামের বানী প্রচার।[২৬] ইসলামিক মিশন যাকাত ফান্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ইসলামিক মিশন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন- গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ ও দরিদ্রপীড়িত জনগণের চিকিৎসার্থে রোগীদের ব্যবস্থাপত্রসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা প্রদান, ফ্রী প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা, সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচীর আওতায় মা ও শিশুদের টীকা প্রদানের ব্যবস্থা, মিশন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মিশন এলাকায় চক্ষু শিবির স্থাপন, বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তাৎক্ষনিক মেডিকেল টিম প্রেরণ এবং চিকিৎসার সুবিধা প্রদান, মিশন এলাকায় ইমারজেন্সী চিকিৎসা প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল-হেলথ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রম ও উদ্বুদ্ধকরণ, মাহফিলের অনুষ্ঠান, আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধানমূলক কর্মসংস্থান, দুঃস্থ ও নওমুসলিম পরিবারকে করজে হাসানা প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছল করে তোলা, গণশিক্ষা-মিশন এলাকায় মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান প্রদান, যকাত ফান্ড প্রদান, যাকাত ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত টঙ্গীর দত্তপাড়া (এরশাদ নগর) শিশু হাতপাতালসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

যাকাত ফান্ডের অর্থে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ:

ক) যাকাত তহবিলের অর্থ দ্বারা দরিদ্র জনগণের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে দত্তপাড়া শিশু হাতপাতাল প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ৩০শে জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ৩৩,৭২২ জন রোগীকে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। হাসপাতালটি দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া হাতপাতালটিতে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধাত্রীরা প্রয়োজন অনুসারে গৃহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। হাতপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩০০শ রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খ) সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ১৯টি সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জুন ৯৮ পর্যন্ত ৫৭১৯ জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

---

২৬. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

গ) ১৯৮৫ সালে যাকাত বোর্ডের আওতায় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার যাদুকুড়া গ্রামে একটি অবৈতনিক আদর্শ মক্তব (যা বর্তমানে আদর্শ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে) চালু করা হয়েছে। এখানে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া মক্তবে নৈশকালীন গণশিক্ষা কার্যক্রম ও চালু রয়েছে।

ঘ) দ্বীনি শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতি জেলায় ১৫জন ইয়াতিম ছাত্র-ছাত্রীকে পোষাক ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য ২০০/- টাকা হারে বৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ) দুঃস্থ, গরীব, দ্বীনদান ও নওমুসলিমদের হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪৬৮টি রিক্সা এবং ১২৮টি ভ্যান গাড়ী বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে প্রতি জেলায় ১টি রিক্সা ও ভ্যান গাড়ী বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

চ) হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে দুঃস্থ, বিধবা মহিলাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ জুন পর্যন্ত জনপ্রতি ১০০০/- টাকা হারে ৬৪টি জেলায় ১৯২০ জনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

ছ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের ১১-১৪ বয়ঃক্রম গ্রুপের কোর্স সমাপনান্তে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে যাকাত ফান্ড থেকে অর্থ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রতি জেলায় ৪ জন করে মোট ২৫৬ জনকে জনপ্রতি ২০০০/- টাকা করে প্রদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

জ) প্রতি জেলায় কমপেক্ষ ১ জন দুঃস্থ বেকার মহিলাকে যাকাত তহবিল থেকে একটি করে মোট ৯২টি সেলাই মেশিন প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।[২৭]

ঝ) ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনঃ

ইলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টর এর সিদ্ধান্তক্রমে ইসলামী ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৪নং ধারা অনুযায়ী 'সাদিকা তহবিল' নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিল আর্ত-মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রমের পরিধি বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই বিস্তৃত কর্ম-পরিধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২০শে মে সাদাকা তহবিলের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' রাখা হয়। এ সময় এর প্রারম্ভিক তহবিল ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত। এটি স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিবে কাজ করে যাচ্ছে।

২৭. যাকাত ফাউন্ডেশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আর্ত-মানবতার সেবা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন, ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহ দান, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মানব-সম্পদ উন্নয়ন।[২৮]

যাকাত বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ

যাকাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্বেও জাতি তা থেকে বঞ্চিত। কারণ যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বিষম বাধা। এসব সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করা অপরিহার্য। নীচে সংক্ষেপে এসব প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলো।

প্রথমতঃ বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক যেসব প্রসঙ্গ নিয়ে জোরদার আলোচনা কম হয়েছে যাকাত সে সবের অন্যতম। যাকাত সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় যদিও কিছু কিছু আলোচনা হয় ওয়াজ মাহফিল বা তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে আলোচনা হয় তার চেয়ে অনেক কম। দেশে যতলোক পত্র-পত্রিকা পড়েন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী লোক ওয়াজ মাহফিলে জমায়েত হয় এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা হতে শিক্ষা লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়। ওলামা মাশায়েখগণ যদি জনগণকে যাকাতের হাকীকত ও ফযীলত এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সম্বন্ধে যথাযথ বক্তব্য রাখতেন তাহলে এতদিনে যাকাতের উপযুক্ত ব্যবহার ও উসুল সম্পর্কে আরও বেশী সচেতনতা লক্ষ্য করা যেতো। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও ব্যবহার হলে যে কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যেতো সে বিষয়েও জনগণের প্রায় কোন ধারনাই নেই।

দ্বিতীয়তঃ সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের জন্যে এদেশে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গৃহীত না হওয়াই এজন্যে প্রধানতঃ দায়ী। যারা যাকাত দিয়ে থাকেন তাদের কেউ কেউ অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতীমখানায় তাদের যাকাত পৌঁছে দেন। কখনও বা এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে লোক নিয়োগ করে যাকাত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক যাকাত প্রদানকারী পুরুষ ও মহিলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মর্জিমাফিক তাদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ বিলি-বন্টন করে থাকেন। এই অবস্থায় আশু পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয়তঃ সরকার যদি যাকাত আদায় ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেও তবু জনগণের পক্ষ হতে কাংখিত সাড়া বা সহযোগিতা লাভ খুব সহজ হবে না। কারণ এদেশের সরকারের আর্থিক লেনদেন ও অর্থব্যয়ের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের আচরণ ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের প্রতি তাদের কমিটমেন্টের প্রতি সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, পর্যবেক্ষণ করবে। বলাই বাহুল্য, সেই মাপকাঠিতে অনেক ঘাটতি, অনেক অপূর্ণতা ধরা পড়বে। দ্বীনদার মুসলমানরা চাইবে তাদের এই আর্থিক ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হোক, প্রকৃত হকদারদের হাতেই এই অর্থ পৌঁছুক। অর্থ আত্মসাৎ বা দুর্নীতি দূরে থাক, এক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বা অপূর্ণতাও তারা মেনে নেবে না। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে সঠিক জনশক্তি নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণের কোন বিকল্প নেই।[২৯]

---

২৮. Welfare Programmas, Islamic Bank Foundation, Dhaka-1992, P. 5

২৯. শরীফ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১–৩২

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ কাজ যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করারও নয়। এজন্যে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজন হবে একটা পাইলট স্কীম তৈরী করে তার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। এই পাইলট স্কীম সফল হলে সেই আলোকেই প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা সাপেক্ষে এর সার্বজনীন রূপ দেওয়া যেতে পারে, আইন তৈরী হতে পারে এবং দেশব্যাপী তার প্রয়োগ শুরু হতে পারে। এজন্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে উপযুক্ত কর্মকৌশল নির্ধারণের কাজ এখনি শুরু হতে পারে।

উপরের আলোচনা হতে এ সত্য দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আল্লাহর দেওয়া বিপুল সম্পদ রয়েছে। এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে কোন আলাউদ্দিনের চেরাগের দরকার নেই। দরকার নেই বিদেশী সাহায্যের। যা দরকার তা হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দাবী সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিবহাল হওয়া, যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টন সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সরকারী নীতি-নির্দেশনা এবং একটি সুদূরপ্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা। তাহলে এনজিওদের কবলমুক্ত এবং সুদের অভিশাপমুক্ত হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত: ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সাহেবে নিবাস ব্যক্তিরা যাকাত উসুল করে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং তা বিলি-বণ্টনও করে থাকে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। বহু ব্যক্তি প্রতিবছর লক্ষাধিক টাকা যাকাত আদায করে থাকেন। কিন্তু তাদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ব্যয়িত এই অর্থ হতে দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ বা দারিদ্র্য দুরীকরণ কোনটাই হয় না। অথচ এসব ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করে এদেরই দেয় যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র আকারে বা স্থানীয়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন বা অসম্ভব কাজ নয়। প্রয়োজন এদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সুফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেওয়া। আশার কথা, ইতিমধ্যেই দেশের কোন কোন অঞ্চলে সাংগঠনিকভাবে এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং তার উপকারও চাক্ষুষ করা যাচ্ছে।

তৃতীয়ত: যাকাত আদায় ও তা বিলিবণ্টনের জন্যে সরকার বা কোন সংস্থার বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। যাকাত আদায়কারীই যেহেতু আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের অর্থ পেতে পারে সেহেতু আদায়কৃত যাকাত হতেই আদায়কারীকে এর একটা অংশ সম্মানী বা বেতন হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান একাজে এগিয়ে এলে তাকেও এ অর্থ দেওয়া সম্ভব। এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যাকাত সংগ্রহ ও অর্থ-সামগ্রী বিতরণ করার কাজটিও সহজ হবে।

চতুর্থত: এ ব্যাপারে দেশের ওলামা-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সর্বোচ্চ কল্যাণমুখী ব্যবহারের জন্যে জনগণকে আহবান জানাতে পারেন। একই সঙ্গে সরকারকেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনের জন্যে বলতে পারেন। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন ও ইসলামপ্রিয় শিক্ষিত জনগণের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা গ্রহণের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। তবে মনে রাখা দরকার, যাকাতই দেশের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সমাজ কল্যাণের একমাত্র হাতিয়ার নয়, অন্যতম হাতিয়ার মাত্র। শরয়ী এই ইবাদাতের পাশাপাশি সচেতন দেশবাসী ও রাষ্ট্রকে এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য উৎস ও পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহারে আন্তরিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখাও অপরিহার্য।[৩০]

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের যথোচিত উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং কার্যকর ভূমিকা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত চৌদ্দ কোটি তৌহিদী জনতা অধ্যুষিত এই দেশে যারা সাহেবে নিসাব তারা সকলেই যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিয়মিত যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আল-কুরআনে উল্লেখিত খাতগুলোতে ব্যয়ের জন্যে উদ্যোগী হন তাহলে দেশে গরীব জনগণের ভাগ্যের চাকা যেমন ঘুরবে তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি হবে আরও বিস্তৃত। এজন্যে প্রয়োজন আজ সদিচ্ছার, সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে প্রকৃতই দৃঢ় অভিলাষের।

বাংলাদেশে ওশর আদায় ও বন্টনে ইসলামী বিধানঃ

ইসলামী হুকুমাত তথা ইসলামী অর্থনীতিতে উশরের মাধ্যমেও সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা চালু ছিল। পদ্ধতি হিসাবে একটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও। যে জমিতে সেচ না দিয়ে ফসল উৎপন্ন করা যায় সেই জমির ফসলের এক-দশমাংশ বা ১০% এবং যে জমিতে সেচ দিয়ে ফসল উৎপন্ন করতে হয় সেই ফসলের এক-বিংশ অংশ বা ৫% উশর হিসাবে প্রদানের শরয়ী বিধান রয়েছে। জমির মালিক হয় তা সরাসরি যারা যাকাতের হকদার তাদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দেবে অথবা বায়তুল মালে জমা করে দেবে। সেই ব্যবস্থার ফলে সম্পদের, বিশেষতঃ কৃষি পণ্যের/আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হতো।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এদেশে বিদ্যমান বর্গাদারী প্রথার কুফল সম্বন্ধে দু একটি কথা উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বর্গাদারী প্রথা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহাজনী ঋণ ও ব্যাংকের সুদ। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় এদেশে ১৯৬০ সালে যেখানে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল ১৭%, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭.৬% এ। ১৯৮৭-৮৮ সালে এই পরিমাণ ছিল ৫০% এরও বেশী। বাংলাদেশে প্রায় ৩৯% পরিবার কোন না কোন শর্তে বর্গাচাষ করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যদিও ফসলের হিসাবে বর্গাদাররা অর্ধেক পায় প্রকৃতপক্ষে টাকার হিসাবে (খরচসহ) তারা এক-চতুর্থাংশের বেশী পায় না। উপরন্তু তাদের নিজস্ব শ্রমের মূল্য যদি ধরা হয় তাহলে তাদের প্রকৃত আয় অনেক ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বর্গাদাররা কোন দিনও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখতে পারে না।

আমাদের এই বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এটি নিম্ন আয়ের দেশসমূহের অন্তর্গত। ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের ৫২% জনগণ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। কৃষিখাত বাংলাদেশের আয়ের প্রধান উৎস। প্রায় ১০ কোটি জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্রসীমা রেখার নীচে। প্রায় ২৫% জনগণ ভূমিহীন। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া দেশের প্রায় ৯০% ভূমি সমতল। ছোট-বড় প্রায় সাত শতাধিক নদ-নদী এদেশের ভূমিকে প্রচুর উর্বরা শক্তি দান করেছেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩,৪৭,৮৬,০০০ একর। এরমধ্যে সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ মোট জমির ২০.৮% তথা ৭২,৩৫,৪৮৮ একর এবং সেচের আওতার বহির্ভূত জমির পরিমাণ মোট জমির ৭৯.২% তথা ২,৭৫,৫০,৫১২ একর। উক্ত ভূমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ৮১,৪০,০০০ একর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ৯৬,৩৪,০০০ একর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৪,২৪,০০০ একর, মোট ২,০১,৯৮,০০০ একর। অবশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

১,৪৫,৮৮,০০০ একর জমিতে ফলমূল ও অন্যান্য চাষ হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু জমি পরিত্যক্তও রয়েছে।[৩১] ১৯৯৬–৯৭ অর্থ বছরে কৃষি জমিতে মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ২০.৩ মিলিয়ন টন, যার $\frac{১}{৩}$ অংশ উৎপাদিত হয় বৃষ্টির পানিতে। আর অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশের ফসল উৎপাদিত হয় নদীর পানি সেচের মাধ্যমে অথবা গভীর নলকূপের পানি সেচের মাধ্যমে।[৩২] উপরোক্ত হিসাবের উপর ভিত্তি করে উশর ও অর্ধ-উশর ধার্য্য করা হলে তার হিসাব হবে নিম্নরূপ; $\frac{১}{৩}$ অংশ ফসলের কোন উশর হবে না, কারণ তার উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হয়ত ৫ ওসক তথা ২৬ মনের নীচে নতুবা তারা অমুসলিম। পরবর্তী $\frac{১}{৩}$ অংশের উপর উশর তথা $\frac{১}{১০}$ অংশ অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশের উপর অর্ধ-উশর তথা অংশ আরোপ করা হবে। সুতরাং মোট উৎপাদিত ফসল তথা ২০.৩ মিলিয়ন টনের $\frac{১}{২০}$ অংশের পরিমাণ হল ৬.৭১ মিলিয়ন টন যার উশর পরিমাণ হল ৬.৭১ মিলিয়ন টন যার উশর হল ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন, পরবর্তী $\frac{১}{৩}$ অংশ এর অর্ধ উশর হল ৩ লক্ষ ৩.৬ হাজার টন, সর্ব সাকুল্যে এর পরিমাণ হল ১০.০৭ লক্ষ টন। যার বাজার মূল্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। উশরের এই পরিমাণ কেবল উৎপাদিত ধান এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য কৃষি পণ্য এর হিসাব ধরা হলে তা ১৫ শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উশর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জমি হতে উৎপাদিত ফসলের সাথে এর সম্পর্ক। বাংলাদেশের ভূমি উশরী ভূমি। শরী'আতে নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে এতে উশর আদায় করা জমির মালিক কিংবা কৃষকের উপর ফরয। এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর প্রকৃত হকদারের নিকট কিংবা বায়তুল মালে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সরকারী উদ্যোগেই তা আদায় করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উশর খুবই বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্রাবস্থার জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি এবং পূর্ণ দারিদ্রাবস্থার জনসংখ্যা প্রায় ২.৫০ কোটি। ৮০% জনগণের মাথা পিছু আয় ৩৮০ ডলার। বেকার প্রান্তিক ক্ষেত মজুর এবং শ্রমজীবিরা বার্ষিক গড়ে ১৮০ দিনের বেশী কাজ পায় না। এমতাবস্থায় শরীআতের নির্দেশিকা অনুসারে উশর আদায় এবং পরিকল্পিতভাবে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে এবং এইসব জনগোষ্ঠিকে ত্রাণ, পূর্ণবাসন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন প্রকল্প ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে উশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

---

৩১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা (বাংলা সংস্করণ), ইফাবা-ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯৯

৩২. মহিউদ্দীন খান, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় তেমনি কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু সামাজিক বণ্টনও নিশ্চিত হয়। বর্তমান প্রচলিত খাজনা পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতি এ জন্যেই উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। আজকের খাজনা ব্যবস্থার বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের প্রদত্ত খাজনা ও উৎপন্নের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। পক্ষান্তরে উশর ব্যবস্থায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, এমনকি বর্গাচাষীরা রেহাই পায় সঙ্গতঃ কারণেই। এর ফলে ধনবণ্টনের বৈষম্য হ্রাস পেতে বাধ্য।[৩৩]

এদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সুষ্ঠু বিলিবণ্টন করা খুবই সম্ভব। এজন্যে চাই আইনী সহায়তা ও যথাযথ উদ্যোগ। পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত ও উশর আদায় করে তা যাকাতের হকদারদের ত্রাণ ও পুর্নবাসন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কাজে ব্যবহার করে সমাজের হতদরিদ্র লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। তাদের পরিসর ক্ষুদ্র, কিন্তু সুফল পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই।

ওয়াকফ সম্পত্তি আয় ও ব্যয়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ সম্পত্তিঃ

মহানবীর (স.) প্রাক নবুওয়াত যুগে ওয়াক্ফ প্রচলিত ছিল না। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ওয়াক্ফ করা হত না। পবিত্র কুরআনে ওয়াক্ফের কোন উল্লেখ নেই। হাদীসে এর প্রবর্তন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রথমে খলিফাগণ এবং পরে সাহাবাগণ ওয়াক্ফ করেন। সুতরাং ওয়াক্ফ প্রথা মহানবী (স.) এর আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়। আনাস বিন মালিক (রা.)-এর এক হাদীসে আছে, মসজিদ নির্মাণ করার জন্য বানু নাজ্জার-এর নিকট হতে মহানবী (স.) বাগান খরিদ করতে চাইলে তার মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় তা দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৩৪]

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসের উপর আইন প্রণয়নকারীগণ বেশি জোর দেন। হযরত উমর (রা.) খায়বারের সম্পত্তি বিভাগের সময় একখন্ড পছন্দসই মূল্যবান জমি নিজ ভাগে পেয়ে উক্ত জমি সাদাকারূপে দান করে দেওয়া সম্পর্কে নবীর (স.) পরামর্শ চান। এতে নবী (স.) বলেন, "জমিটুকু নিজের অধিকারে রেখে তার উৎপন্ন আয়, ফল-শস্যাদি সৎকাজে ব্যয় কর।" হযরত উমর (রা.) তা-ই করেন এবং শর্ত আরোপ করেন যে, জমি বিক্রি বা ওয়াসিয়াত করা চলবে না, তার আয় দরিদ্র (অভাবগ্রস্ত), আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, মুসাফির, মেহমান এবং ধর্ম প্রচারার্থে সদকাস্বরূপ দান করা হবে; মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে পারিশ্রমিক পাবেন এবং নিজের জন্য তা থেকে সঞ্চয় না করে বন্ধুকে খাওয়ালে পাপ হবে না।[৩৫]

---

৩৩. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৩৪. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ-বুখারী, কিতাব আল ওয়াসিয়া, বাব-২৮, ২৯

৩৫. সহীত আল বুখারী, কিতাব আস শুরূত, বাব-১৮

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে যতক্ষণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ প্রকৃত পূণ্য লাভ করতে পারবে না।" (৩:৯২)-এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আবু তালহা আনসারী (রা.) বললেন, যে আল্লাহর রাসূল! 'বীরহা' আমার ভূ-সম্পত্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমি সেটাকে আল্লাহর পথে দান করে দিচ্ছি। এর প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছে থেকেই কামনা করি। আপনি ইচ্ছামত এটাকে ব্যয় করতে পারেন। রাসূল (স.) বললেন, না, না, এটা উৎপাদনশীল সম্পত্তি। মূল বাগানটা নিজের মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে রাখ এবং উৎপন্ন ফসল দান কর।" সেই মতে, আবু তালহা বাগানটি উবাই এবং হাস্‌সানকে দান করে দেন।[৩৬] এটা ছিল ইসলামে প্রথম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। হযরত আবু তালহার একটা বাগানে 'বীরহা' নামক একটা স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির কূপ ছিল। পরে এই কূপের নামে পুরো বাগান খ্যাত হয়। এরপর থেকে ওয়াকফের রীতি চালু হয়। পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফ ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের এক প্রধান উৎসে পরিণত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসের সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ও সকল সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা চালু হয়। এতে দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। এরপর হযরত উমর (রা.) তাঁর খায়বরের জমি ওয়াক্‌ফ করেন। হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবীও নিজ-নিজ জমি ও বাগান ওয়াক্‌ফ করেন। এভাবে ওয়াক্‌ফ করা থেকে কোন সাহাবীই বাদ থাকেননি। তারপর হযরত উমরের (রা.) শাসনামলে একাজ নতুন করে শুরু হয়। নিজের একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই এ-কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদেরকে ডাকেন ও সাক্ষী রাখেন। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ আনসারী বলেনঃ রাসূল (স.)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে আমি যাদের চিনি, তারা সকলে নিজ নিজ জমি-জমা থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই আল্লাহর পথে দান করেছেন। এ-দান এমন ছিল যে, তা কেনাও যায় না, দান কাও যায় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও হস্তান্তরিত হয় না। একেই ওয়াক্‌ফ বলে। এরপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমানগণ ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। তারা ফসলি জমি, বাগান, ঘর-বাড়ি ও ফসলাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্‌ফ করত এবং তাতে মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতো। এ-ধরণের ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল অগণিত।

প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয় তা হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে লোকেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করত এবং এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতিযোগিতা করত। এমনকি খলিফা, রাজা ও সম্রাটগণও মসজিদ নির্মাণে, বিদ্যমান মসজিদের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করতেন। এরপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান হলো শিক্ষা ও চিকিৎসালয়।

কাফিলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বল হারা, পথহারা মুসাফিরদের জন্য মুসাফির খানা ও খাবার ঘর এবং এসব জায়গায় স্থান সংকুলান সাপেক্ষে লোকেরা যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারত। খানকাহ ও ইবাদতখানা অবসরপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ লোকদের লোকালয় থেকে দূরে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার জন্য, ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরনের খানকা ও ইবাদতখানা এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকেরা যারা নিজের ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না, তাদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণ করে দেওয়া

---

৩৬. ইমাম মুহিউদ্দীন আন নববী, রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০১), পৃ ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

হতো। জনসাধারণের চলাচলের পথে খাবার পানির কূপ খনন করা হয়েছিল যা কৃষিকাজে, পশুদের ও পথিকদের পিপাসা মেটাতে কাজে লাগে। এসব কূপ বেশির ভাগ মক্কা ও বাগদাদের মাঝপথে ছিল। এছাড়া দামেস্ক ও মদীনার মধ্যবর্তী রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ছিল। বিভিন্ন ইসলামি সম্রাজ্যের রাজধানী ও অন্যান্য শহর স্থানগুলির মধ্যবর্তী সড়কে এগুলি এত বেশি ছিল যে, তৎকালে পথিকের পিপাসায় কষ্ট পেতে হতো না। মক্কায় হাজীদের থাকার জন্য প্রচুর ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হতো। বেকার লোকদের জন্য বিনামুল্যে খাদ্য বিতরণের ঘর নির্মাণ করা হত।[৩৭]

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের প্রহরার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হত, যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত আইন লংঘন করে ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে। এসব সীমান্ত রক্ষীদের জন্য বরাদ্দকৃত এ-ধরনের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি ছিল। এসব ঘরে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমনঃ খাদ্য, পোশাক, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সহজেই পেত। ঘোড়া, তরবারি, বর্শা, তীর, ধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও ওয়াক্ফ করা হত। ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ কখনো অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব বোধ করত না। তাই মুসলিম দেশগুলিতে সামরিক শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শহরগুলিতে বড়-বড় কল-কারখানা নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিমা দেশের ক্রুসেডারগণও শান্তির সময় মুসলিম দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত এবং অস্ত্র কিনত। এজন্য ইমামগণ ফতোয়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, শত্রুদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়। এমন কিছু কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল যার আয় আল্লাহর পথে জিহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সেইসব সামরিক ব্যক্তির জন্য বরাদ্ধ ছিল যাদের ব্যয়ভার বহন করা সরকারের সাধ্যে ছিল না।

এমন ওয়াক্ফ সম্পত্তি থাকত যার আয় দিয়ে রাস্তা, সেতুর সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হত। কিছু সম্পত্তি কবর, গরিব ও অনাথদের দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াক্ফ করা হত। সাধারণভাবে দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য যেমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিল তেমনি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন, খাতনা দেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু স্বতন্ত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তি বরাদ্দ থাকত। পঙ্গু, অন্ধ, অক্ষম লোকদের খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তি থাকত। কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন, তাদের জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের খাদ্য ও চিকিৎসার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত লোকদের জন্য ব্যয়ের এবং যে-সকল অভিভাবক ছেলে মেয়েদের বিয়ের খরচ ও মোহরানার দায়ভার বহন করতে পারত না, তাদের সার্বিক সাহায্যে কিছু ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[৩৮]

সর্বশেষ প্রকারের ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস ও খাদ্য সরবরাহ এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে যেত তখন এ দিয়ে তাদের বিচরণের জন্য মাঠ তৈরি করা হত। এ ধরনের ময়দানকে 'মাজয়াতুল আখদার' বলা হতো।

মহানবী (স.)-এর আমলে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটলেও ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান গৃহীত হয় হিজরি দ্বিতীয় শতকে। দানশীলতার প্রতি প্রবল আবেগ ও অনুরাগ ইসলামের একটি বৈশিষ্ট এবং তাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কারণ। সাবেক তুর্কি সাম্রাজ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমগ্র আবাদি

---

৩৭. মোস্তফা আস-সিবায়ী, ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০২, দৈনিক সংগ্রাম), পৃ ৭
৩৮. মোস্তফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমির প্রায় ৩/৪ ছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে আলজিরিয়ায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল আবাদী জমির অর্ধেক। তিউনিসে ১৮৮৩ সন ছিল ১/৩, ১৯৩৫ সনে মিসরে ১/৭ এবং ১৯৩০ সনে ইরানে প্রায় শতকরা পনের ভাগ। ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশনামার ধারা মতে শরীআত এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করবে।[৩৯]

ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কোন আইন প্রচলিত না থাকায় তা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হত। সুতরাং এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক ১৯১৩ সালে 'ওয়াক্‌ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্ট' আইন জারি করা হয়। তখন হতে এ-উপমহাদেশে ওয়াকফের স্বীকৃতি লাভ করে। এ-আইনের কার্যকারিতার জন্য ১৯৩৪ সালে 'বঙ্গীয় ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট' আইন জারি করে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্তে ১৯৬২ সালে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় ও ব্যয়:

বাংলাদেশেও বহু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রয়েছে। এগুলি মসজিদ, মাযার, মাদ্রাসা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। এগুলি তদারকের জন্য একজন ওয়াক্‌ফ কমিশনারের অধীনে একটি স্থায়ী দফতর রয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট-এর বলে এই সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

বাংলাদেশে এতিম, দুঃস্থ, অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এগুলি সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮৭ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩। এর মধ্যে ৯৭,০৬৬টি রেজিস্ট্রিকৃত, ৪৫,৬০৭টি মৌখিক ও ৭,৯৪০টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে। ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীনে থাকা জমির পরিমাণ ১,১৯,৬৯৫.৪০ একর। তন্মধ্যে ৭০৬৭০.১৮ একর কৃষিভূমি আর বাকি অকৃষিভূমি। এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিভুক্ত মসজিদের সংখ্যা ১২,০০৬টি, মাদ্রাসা ৪,৩১৭টি, মাযার/দরগাহ ১,৪০০টি, ঈদগাহ ২১,১৬৩টি, গোরস্তান ৪,৩১৭টি এবং এতিমখানা/সরাইখানা/মুসাফিরখানা ৩,৪৫৯টি। এসব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত।[৪০]

বর্তমানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে ১৫,০০০টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত আছে। এগুলির মধ্যে ২১০টি দরগাহ/মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেট। তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ২,৬৬১টি ওয়াক্‌ফ আলাল আউলাদ এবং ১২,৩৩৯টি ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ। বাকি বিপুল সংখ্যক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থেকে যাচ্ছে তালিকার বাইরে। প্রয়োজনীয় জনবল না থাকাতে সেগুলি তালিকাভুক্ত করা যাচ্ছে না।

৩৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ২১৫
৪০. Md. Azharul Islam. Awqaf Experience of Bangladesh is South Asia Country Paper (New Delhi, 1999) P. 3

Dhaka University Institutional Repository

তালিকাভুক্ত সম্পত্তির বিভাগীয় ও সাবেক জেলা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

ঢাকা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার
ক. ঢাকা জেলা (বৃহত্তর)	১৫১০	২১৯	৪৯
খ. ময়মনসিংহ জেলা (বৃহত্তর)	৭৩৬	১০১	০৭
গ. টাংগাইল জেলা (বৃহত্তর)	৩০৫	৩১	০৭
ঘ. ফরিদপুর জেলা (বৃহত্তর)	১৮৫	৫৮	০১
মোট	২৮০৬+	৪০৯ = ৩২৪৫	৬৪ = ৬৪

চট্টগ্রাম বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার
ক. চট্টগ্রাম জেলা (বৃহত্তর)	১৯৬৬	২২২	৩৯
খ. নোয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	১০০২	২৯৬	০৮
গ. কুমিল্লা জেলা (বৃহত্তর)	১০০৯	৮১	১৮
ঘ. সিলেট জেলা (বৃহত্তর)	৪৪৮	১৪১	১৪
মোট	৪৭২৫+	৭৪০ = ৫৪৬৫	৭৯ = ৭৯

রাজশাহী বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার
ক. রাজশাহী জেলা (বৃহত্তর)	৮৫৮	১৩২	২১
খ. রংপুর জেলা (বৃহত্তর)	৬৪৫	৬৫	১১
গ. দিনাজপুর জেলা (বৃহত্তর)	৭৫০	১৫৭	০৫
ঘ. পাবনা জেলা (বৃহত্তর)	১৩৬	৩৮	০২
মোট	৩১৭০+	৫৫০ = ৩৭২০	৪৯ = ৪৯

খুলনা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার
ক. খুলনা জেলা (বৃহত্তর)	১৬৫	৪১	০৪
খ. যশোর জেলা (বৃহত্তর)	৯২	১৯	০২
গ. কুষ্টিয়া জেলা (বৃহত্তর)	৯৮	৩৭	০১
ঘ. বরিশাল জেলা (বৃহত্তর)	৭০৫	৩৪৩	০১
ঙ. পটুয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	৫৪৮	৫২২	০১
মোট	১৬০৮ +	৯৬২ = ২৫৭০	০৯ = ০৯
সর্বমোট	১২,৩৩৯ +	২৬৬১ = ১৫০০০	২০১

[সূত্র: মো: নিজাম উদ্দীন, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, (বিপিএটিসি: সাভার, ১৯৯৪), পৃ: ১০-১১]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এ-দেশে চালু আছে এবং তারই বিধান বলে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং তদসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভুক্ত করা, ওয়াক্ফ প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা, ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য ও প্রদান করা, হিসাব বিধিমত প্রণয়ন করা, ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে দাখিল করা, দায়েরকৃত মুকাদ্দমা নিস্পত্তি বা জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এছাড়া মুতাওয়াল্লী চাঁদা পরিশোধ ও হিসেব প্রদানে ব্যর্থ হলে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠাদি; বৃত্তিভোগীদের ভাতা প্রদানসহ ওয়াক্ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাঁর কর্তব্য পালন না করলে তাঁকে ফৌজদারিতে সোর্পদ করার বিধান আছে। কোন মুতাওয়াল্লী ব্যক্তিগত কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করে টাকা আত্মসাৎ করলে পি. ডি. আর এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসককে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৪১]

ওয়াক্ফ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন দেশব্যাপী বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা অনুমোদিত নগণ্য জনবল, ওয়াক্ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা মুনানির সনাতন প্রক্রিয়া, ওয়াক্ফ আদালতে অমীমাংসীত বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে তথ্যসংগ্রহ গ্রহণ এবং সেগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বর্তমানে কর্মরত ওয়াক্ফ প্রশাসনে স্বল্পসংখ্যক জনবল দ্বারা সম্ভবপর নয়।

ওয়াক্ফের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

সীমাবদ্ধবা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা বিধায় জনহিতকর কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এতিমখানা, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪২] আজহারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, A huge contribution is made or scientific progress in Bangladesh by setting up herbal medicines (unaniayurvedic) factories, Jute mills, glass factories etc. within the Waqf Estates. Besides, Significant role is played in preaching Islam by observing various religious festivals and functions in the important days at different institutions under different Waqf Estates. In this connection, the name of a Waqf Estate "Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh" can be cited; this waqf Estate has been serving the poor and needy poeple in the Society with free medical treatment and other charitable activities. Hamdard has taken a scheme for setting up a science town over 100 acres of land within a short time in Bangladesh.[৪৩]

৪১. দ্র. ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (ঢাকা: বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ১৯৯৯)
৪২. Mohammad Azharul Islam, op.cit, P. 7
৪৩. Ibid, P. 7-8

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ওয়াকফের সম্ভাবনা:

ধর্মীয় অনুভূতি, অনুশাসন ও মানবিকতা বোধের প্রেরণায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে বাংলাদেশের মুসলমানগণ সমাজ সেবা তথা তাদের সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান ওযাক্ফ করে থাকেন। বর্তমানে অনেক ওয়াক্ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী/বৃত্তিভোগীদের মাঝে ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ওযাক্ফ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকরি পর্যযে তেমন কোন গুরুত্ব না পাওয়ার এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে অনেক ওয়াক্ফ এস্টেটের অস্তিত্ব দিন-দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলত ওয়াক্ফদাতা যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সৃজন করেছেন সেই সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহের ধর্মীয় ও লিল্লাহ্ খাতে ব্যয় করার বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই ওয়াক্ফ এস্টেট নিয়মিত তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে ওয়াকফের স্বার্থ সংহত করে কোটি কোটি টাকা আয় করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দুঃস্থ মানবতার সেবায়, দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ার এতিমদের প্রতিপালনে, ছিন্নমূল অসহায় নিঃস্ব মানুষের চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রশাসনিক, আইনগত, অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের সুপারিশ করেছেন।[৪৪] এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের আয় বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে:

(ক) তালিকাভুক্ত এস্টেটের দাবি পুনঃ নির্ধারণসহ নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(খ) অতালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহকে জরুরী ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হলে যথেষ্ট পরিমাণ আয় বেড়ে যাবে।

(গ) রাজধানী ঢাকাসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং প্রতিটি জেলা ও অনেক থানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহুসংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটের খালি জায়গা রয়েছে। এ-সমস্ত এস্টেটে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও শিল্প কারখানা স্থাপন করলে এস্টেটের আয় বর্তমানের তুলনায় প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) ঢাকা মহানগরীসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগীয় সদর দফতরে অবস্থিত অধিকাংশ ওয়াক্ফ এস্টেটের মসজিদ/দরগাহ/মাযার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খালি জায়গায় দোকানপাট, মার্কেট, বাণিজ্যিক ভবন, ফ্লাট এবং বহুতল ভবন নির্মাণ করে ওয়াক্ফের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ঙ) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় জেলাতেই ওয়াক্ফ এস্টটের অধীন প্রচুর অনাবাদি ও পতিত জমি রয়েছে যা সেচের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে শাক-সবজি, ফল-মূলের চাষ এবং গাভী, ছাগল ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়াক্ফের আয় বাড়ানো সম্ভব।

---

৪৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য ১৯ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনে ১ নম্বর কমিটি কক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ। ৪, নিউ ইস্কাটন রোডে অবস্থিত ওয়াক্ফ ভবন অফিসে প্রবন্ধটি সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল এলাকায় বহু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেট আছে যেখানে চিংড়ি চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

(ছ) চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায় পাহাড়ি এলাকায় ওযাক্ফ এস্টেটের জমিতে উন্নত জাতের বৃক্ষ রোপণ করলে এস্টেটের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এছাড়া যে সকল এস্টেটের অধীনে চা বাগান আছে তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা যায়।

(জ) বাংলাদেশের জেলা শহর এবং গ্রাম গঞ্জে অবস্থিত ওয়াক্ফ এস্টেটের বহু পুকুর ও জলাশয় আছে। এ-সমস্ত পুকুর ও জলাশয়ে উন্নতজাতের মাছের চাষ করলে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঝ) বাংলাদেশের শহর, গ্রামে-গঞ্জে বহু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটে হাট-বাজার রয়েছে। এ-সকল হাট-বাজারে দোকান-পাট নির্মাণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(ঞ) দেশের বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটের অনেক সম্পত্তি অনেক স্বার্থপর এবং লোভী লোক অবৈধভাবে দখল করে আছে। অর্থাভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। আইন-আদালত করে এসব মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে বহন করা যায়।

বাংলাদেশের সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দুই একর জমির উপর 'ইসলামি এডুকেশন ওয়াক্ফ' নামে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করেছে। ওয়াক্ফ ভবনটি বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের তিনজন করে মোট ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটি পরিচালনা করছে। কিন্তু ওয়াক্ফ প্রশাসন এতে সহযোগিতা করেনি।[৪৫] এ প্রকল্প সম্পন্ন করা হলে এর আয় বৃদ্ধি পাবে। তখন ওয়াক্ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ লিল্লাহ্ খাতে মসজিদ মাদ্রাসা, এতিমখানা, শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সংস্কার ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এছাড়া গরিব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ বিনামূল্যে লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ-আয় দ্বারা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে কম সুবিধাভোগী অসংখ্য মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

ওয়াক্ফের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, কুটিরশিল্প, তাঁত ও যন্ত্রচালিত ছোট-ছোট শিল্প-কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ এবং হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের কার্যক্রমগ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে গরিব, ভাগ্যাহত, বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিশেষভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক লিল্লাহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুঃস্থ মানবতার সেবায়, দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়া, এতিমদের প্রতিপালনে, ছিন্নমূল অসহায় মানুষের চিকিৎসায়, ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে।

---

৪৫. Mohammad Azharul Islam, Opcit, P. 10

Dhaka University Institutional Repository

করযে হাসানা, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবাণী ও সাদাকার আয় ও ব্যয়ঃ

করযে হাসানা

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময় হতে মুসলিম সমাজে করযে হাসানার বিধান চলে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিত্তশালী ব্যক্তিরা সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে করযে হাসানা দিতেন। করযে হাসানা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আল্লাহ্কে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত; তাহলে আল্লাহ্ তাকে কয়েকগুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহ্র হাতে নিহিত। আর তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"[৪৬] করযে হাসানার এই বিধান সমাজে প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ লেনদেনের এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। করযে হাসানা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। যথাঃ

(ক) বেসরকারী খাতে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা;

(খ) বিত্তশালীদের ব্যয় প্রবণতার সাময়িক হ্রাস;

(গ) সুদভিত্তিক ঋণের উচ্ছেদসহ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন।

এরফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব করযে হাসানার অর্থ পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন/বিধান তৈরি এবং একই সঙ্গে বিত্তশালীদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে করযে হাসানা হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আয়কর রেয়াতের সুবিধা পাবে সরকারের এমন উদোগ ফলপ্রসূ হবে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে বিত্তহীন বর্গাচাষী ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরণ সংগ্রহ এবং যোগ্য ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের (ফেরিওয়ালাসহ) উদোগ গ্রহণের সুবিধার্থে করযে হাসানা প্রদান কৃষিখাতসহ পল্লী কর্মসংস্থানে শুভ প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

বর্তমান যুগে ধনীদের ব্যয় প্রবণতা হ্রাসের মাধ্যমে ধনবন্টনে বৈষম্য দূর করার প্রয়াস চলছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপের মধ্যে সরকারী ঋণ অন্যতম। যদিও সরকার বাজেট ঘাটতি পূরণ, উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই জাতীয় ঋণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই থাকে বিত্তশালীদের হাতে যে অব্যয়িত সম্পদ রয়েছে তার একটা অংশ বিনিয়োগমূলক কাজে লাগানো এবং একই সঙ্গে তাদের ব্যয় হ্রাস করা। ফলে সমাজে ধনবৈষম্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়, নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষত সরকারী উন্নয়নমূলক ব্যয় ও পূর্ত কর্মসূচির সিংহভাগ অর্থই সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে যায়।

সুদী ব্যাংকগুলির প্রদত্ত বিপুল ঋণের কারণে সমাজে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপায় সরকারী ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ, ব্যবহার ও মেয়াদের উপর অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও সামাজিক কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। বিভিন্ন বৃহৎ ও লাভজনক উন্নয়নমুখী প্রকল্পের জন্যে সরকার সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে মুদারাবা সার্টিফিকেট বা বন্ড চালু করলে

---

৪৬. আল-কুরআন, ২:২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

উভয় পক্ষেরই মঙ্গল বিত্তশালীর এতে অংশগ্রহণ করে যেমন মেয়াদান্তে লাভের অংশ পেতে পারেন, তেমনি সরকারও সমাজের অব্যয়িত অর্থ শিল্প উন্নয়নসহ বিবিধ উৎপাদনমূলক কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি বেকার ও অর্ধবেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন।

নিরাপদ বিনিয়োগের জন্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বা বন্ড সব সময়েই সকল মহলে সমাদৃত। তাই মুনাফার হার কম হলেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে সমান আগ্রহী থাকবে। এই বন্ড বা সার্টিফিকেট বিনিয়োগের ক্ষেত্র কর রেয়াতের সুবিধা প্রগতিশীল হারে বৃদ্ধি করলে সম্পদশালীরা আরও উৎসাহিত হবে। মুখ্যত দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনের জন্যে যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ জরুরী সেজন্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় বন্ড ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ আরও ত্বরান্বিত হবে।

সাদাকাতুল ফিতর ও কুরবাণীর তাৎপর্যঃ

সমাজের দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কেবল যাকাতই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সাদাকাহও এ তহবিলকে শক্তিশালী করতে পারে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ফিতরা প্রদান এবং ঈদুল আযহার সময়ে কুরবাণীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, অসহায় পথিক কিংবা হঠাৎ বিপদগ্রস্ত লোকের যথাসম্ভব সাহায্য করাও কর্তব্য। ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে ঈদুল ফিতরের দিন যে মুসলমানের ঘরে যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকবে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করে দিতে হয়। ফিতরার এ অর্থ পুরোপুরি দরিদ্রদের হক। ফিতরার পরিমাণ সাধারণতঃ ১.৭০ কেজি গম বা তার বাজার মূল্য ধরা হয়। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যানুপাতে ঐ পরিমাণ গম বা তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার বিধান রয়েছে। এভাবে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে যে বিপুল পরিমাণ ফিতরা দেয়া হয় তা দরিদ্র জনগণ পেলেও পরিকল্পিতভাবে এ অর্থ ব্যবহারের অভাবে এতে দরিদ্রদের যে কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জিত হতে পারত, তা আদৌ হয় না।[৪৭]

অনুরূপভাবে ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবাণীকৃত পশুর চামড়া বা তার মূল্য গরীব দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণত কুরবাণীদাতা নিজ উদ্যোগেই এ অর্থ নিজস্ব পছন্দ মত দরিদ্রদের মাঝে বিলি বণ্টন করে দেয়। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু সমাজসেবী সংগঠন ও মাদ্রাসাসমূহের লিল্লাহ বোডিং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য কুরবাণী দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুরবাণীর পুরো চামড়া অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশবিশেষ সংগ্রহ করছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এককালীন বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজনের কিছুটা হলেও পূরণ হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ চামড়ার বিক্রয় লব্ধ অর্থ কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া অভাবী জনগণের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। এতে সাময়িকভাবে তাদের চাহিদার কিছুটা পূরণ হলেও তাদের অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব রয়ে যায় স্থায়ীভাবে। অথচ এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেই অনুসারে এ অর্থ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যবহার করলে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র দূর হয়ে যেতে পারত।

---

৪৭. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কুরবাণীর চামড়া বিক্রি থেকে কত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা অতি অল্প। এক্ষেত্রে বছরওয়ারী হিসেব দেয়া সম্ভব না হলেও একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, এদেশে গড়ে প্রতি বছর উৎপাদিত গরু, মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পিস। এর মধ্যে বিদেশ থেকে আনা গরুর চামড়াও রয়েছে। যারা চামড়া ব্যবসার সাথে জড়িত, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও আধা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ট্যানারী ও ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করে থাকে, তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, তাদের বার্ষিক সংগৃহীত চামড়ার মধ্যে কমপক্ষে ২০% চামড়া সংগৃহীত হয় শুধুমাত্র ঈদুল আযহার দিনে। তাদের মতে, এদিনে সংগৃহীত গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় সাধারণতঃ ৩:২। এ হিসেব অনুসারে এদিনে প্রাপ্ত ৩০ লাখ পিস চামড়ার মধ্যে গরুর চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ পিস এবং ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ লক্ষ পিস।[৪৮] ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এদেশের পরিবারের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। এর মধ্যে যদি অন্ততঃপক্ষে ১৫% পরিবার ঈদুল আযহার দিনে কুরবাণী করে তাহলেও ৩০ লাখ পশু কুরবাণী হওয়ার কথা। গরুর কাঁচা চামড়ার আকার নির্বিশেষে প্রতিটি গড়ে টাকা ৬০০/- এবং ছাগলের চামড়ার দাম প্রতিটি গড়ে ৭৫/- টাকা ধরলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০ কোটি টাকা। বাস্তবে এর পরিমাণ আরও বেশী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং দরিদ্রের হক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারেই তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি দক্ষ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আল্লাহ নির্দেশিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনা আয়াসে প্রাপ্ত এই বিপুল অর্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ব্যয়িত হওয়ার মধ্যেই কোনই কল্যাণ নেই। সর্বোপরি, ইসলামের এই প্রথাদ্বয়ের উদ্দেশ্য হল গরীব আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঈদের আনন্দ দান এবং তাদের প্রতি দায়িত্বপালন। এর ফলে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। বর্তমানকালেও এর মাধ্যমে দরিদ্র মুসলিম জনগণের কল্যাণ সাধন ও ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করতে দেখা যায়। তাই সমাজকল্যাণে ক্ষেত্রে এর অবদান একেবারে কম নয়।

সাদাকাহর বা দানশীলতার গুরুত্বঃ

ইসলাম ধর্মে সাদাকাহর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সম্পদশালীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের সুযোগ দান করে সাদাকাহ। ইসলামের বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মুসলমানকে দু'টি কর্তব্য পালন করতে হয়। প্রথমতঃ স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য (হককুল্লাহ), দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য (হক্কুল ইবাদ)। সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন সাদাকাহ বা দানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সাদাকার মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতাবোধ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়, তেমনি সাদকাহকারী ত্যাগ, নিরহংকার, অন্তরের প্রশস্ততা, ঔদার্য ইত্যাদি সৎগুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয়। এজন্য যাকাত ফরজ করে দেয়া সত্ত্বেও সাদাকাহ বা দান করতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করে মুসলমানদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।[৪৯]

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৪৯. আল-কুরআন, ২:২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

যাদের ধন-সম্পদ বলতে কিছু নেই তারা এই অজুহাতে দান সাদাকাহ্ থেকে বিরত থাকেন। বস্তুত দান-সাদাকার বিশেষ তাৎপর্য এবং সামাজিক মূল্য রয়েছে। একবার সাহাবীগণ রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হুজুর, যদি কারও নিকট দান সাদাকাহ্ করার মত কিছু না থাকে? নবী (স.) জবাব দিয়েছিলেন সে যেন নিজের হাতে উপার্জন করে; এর পর নিজেকেও লাভবান করে এবং অন্যকেও দান করে।"[৫০]

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ যাতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকে, নির্লিপ্ত জীবনে অভ্যস্ত না হয়। তাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যে নিঃস্ব, অসহায় তাকে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কঠোর শ্রম এবং অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তখন স্বাভাবিক কারণেই তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে এবং দান সাদাকাহ্ করতে সক্ষম হবে। তাই দান সাদাকাহ্ প্রদানের মনোবৃত্তি গড়ে উঠলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থেই ব্যক্তি তার অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সচেষ্ট হবে।

বাধ্যতামূলক নয়, বরং মনের তাগিদে সহানুভূতি ও সমানুভূতিশীল হয়েই মানুষ সাদকাহর মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ, অসহায়দের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালনে উৎসাহিত হয়। এ জাতীয় অনুপম মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের লক্ষ্যেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সাদাকাহর কথা বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

আধুনিক সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে সাদাকা বা দান ব্যবস্থার কিছুটা ত্রুটি এবং দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও সমাজকল্যাণের বিকাশে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। ইসলামে এমন অনেক সাদাকাহ্ রয়েছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ ও বিতরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, সমাজের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। যেমন-"সাদাকাতুল ফিতর" খোলাফা-এ-রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে থাকেন। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে এসব দান সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ করা হলে, আর্তমানবতার কল্যাণে সাদাকার অর্থ বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তদুপরি আমাদের ন্যায় অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অত্যন্ত সীমিত বিধায় সাদাকাহ্ দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণীর নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশে মীরাসী সম্পদের আয় ও ব্যয়ঃ

ধনবন্টনে সাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী মীরাস বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বাঁটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ইসলাম-পূর্ব যুগে বিশ্বে সম্পদ বন্টনের কোন বৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক পন্থা বিদ্যমান ছিল না। ইসলামেই সর্বপ্রথম মৃতের সম্পদ তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একদিকে যেমন তাদের তাৎক্ষণিক অসহায় অবস্থা দূর করতে সমর্থ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের হাতে সকল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার বিপদও দূর করেছে। উপরন্তু সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কিভাবে ও কাদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাঁটোয়ারা হবে সে বিষয়ে

৫০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আন-নিসায় ব্যাপক ও বিস্তৃত নির্দেশনা রয়েছে। এত ব্যাপক ও বিস্তৃত নির্দেশ আর কোন ধর্ম বা ইজমে নেই।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে সম্পদের অধিকতর সুষ্ঠু বন্টনের জন্যে মৃতের সম্পত্তি সর্বহারাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেত অথবা নির্দেশ দেওয়া যেত রাষ্ট্রয়াত্ত্ব করে নেওয়ার। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনায় স্বীয় জীবদ্দশাতেই সব সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করতো। তার ফলে সমাজে দেখা দিত আরও বেশী বিশৃঙ্খলা। পক্ষান্তরে মৃতের সম্পত্তি তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও নিকট আত্মীয়েরা লাভ করায় সম্পদের বন্টন যেমন সার্থক ও অর্থবহ হয় তেমনি তারাও রাতারাতি সর্বহারাদের কাতারে গিয়ে শামিল হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

এখানে উল্লেখ করা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে বেআইনী বা জবরদস্তিমূলক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা বর্তমানে একটা রেওয়াজ বা দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের জমি, ইয়াতীম ও নাবালকদের সম্পত্তি, এমনকি প্রতিবেশীর জমি-বাগান-দালান ছাড়াও শত্রু সম্পত্তি কিংবা সরকারী সম্পত্তি (খাস জমিসহ), বাড়ীঘর, প্রতিষ্ঠান জবর-দখল করে, কিংবা জাল/ভূয়া দলিল করে এক শ্রেণীর মানুষ রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ নিচ্ছে। এদের যেন কেউ রুখবার নেই। আইন এদের কাছে বড়ই অসহায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে ইসলামের দোহাই পেড়ে বা রাষ্ট্রধর্মের বরাত দিয়ে দেশে শ্রেণী বৈষম্য দূর করা কখনই সম্ভব হবে না। বরং বৈষম্যই শুধু বাড়বে না, সেই সঙ্গে বাড়বে নির্যাতন, নিপীড়ন, যার পরিণাম কোটি বনি আদমের বেদনাক্লিষ্ট ও হতাশাপূর্ণ জীবন।

ফারায়েজ অনুসারে মৃতের সম্পত্তি বাঁটোয়ারার বিধান আইনতঃ স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ সন্তোষজনক নয়। বরং বেআইনী বা জবরদস্তিমূলক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা বর্তমানে একটা স্বীকৃত রেওয়াজ বা দস্তরে পরিণত হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের জমি, ইয়াতীম ও নাবালকদের সম্পত্তি এমনকি প্রতিবেশীর জমি বাগান দালান ছাড়াও শত্রু সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি (খাস জমি), বাড়িঘর প্রতিষ্ঠান জবর দখল করে, কিংবা জাল বা ভূয়া দলিল করে এক শ্রেণীর মানুষ রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ নিচ্ছে। আইন এদের কাছে বড়ই অসহায়। ছলে-বলে কৌশলে ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধূদের, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের, ভাইপো-ভাইঝিদের, বোনদের, খালা-ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এই অবস্থার কারণেই একদিকে যেমন ধনবৈষম্য বৃদ্ধ পাচ্ছে অন্যদিকে নির্যাতন নিপীড়ন, বঞ্চনা ও হতাশা বেড়েই চলেছে। তাই আজ প্রয়োজন দেশে বিদ্যমান দেওয়ানী আইনের মীরাসী অংশের পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন।[৫১]

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিংঃ

যেকোন সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কি সে বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরেও কথা থেকে যায়। ইসলামের গৌরবোজ্জল দিনগুলোতে মুসলিম সমাজে কর্মসংস্থানের যে স্বাভাবিক উপায়গুলো সকলের জন্যে সহজলভ্য ছিল আজকের সমাজে

---

৫১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মুদারাবা মুশারাকা মুরাবাহা বায়-ই-মুয়াজ্জল বায়-ই-সালাম শিরকাত আল-মিলক ইজারা বিল-বায়ই ইত্যাদি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে বিত্তশালী ও বিত্তহীন কিন্তু কর্মদক্ষ মানুষ, অল্পবিত্ত ও অধিক বিত্তের মানুষ যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, যে কোন নতুন কর্মদ্যোগে অংশ নিতে পারে। দুঃখের বিষয়, সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হতে মুনাফাভিত্তিক এবং লাভ-লোকসানের অংশীদারীভিত্তিক কর্মসংস্থানের ও বিনিয়োগের পথ মুসলিম দেশগুলোতে ক্রমাবলুপত হয়েছে। অথচ নবী মুস্তাফার (স.) যামানা হতেই মুদারাবা মুশারাকা মুরাবাহা বায়-ই-মুয়াজ্জল বায়-ই-সালাম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সমাজের বিত্তশালী বা ধনবান ব্যক্তিরা যারা কম বিত্তশালী বা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক যোগ্যতা রাখে তাদের সাথে একত্রে উৎপাদনমুখী ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অংশীদার হতেন। এছাড়াও বহুক্ষেত্রে করযে হাসানার মাধ্যমেও ব্যক্তিবিশেষের জরুরী প্রয়োজন পূরণের সুযোগ ইসলামী সমাজে বিদ্যমান ছিল। সেই করযে হাসানার নামই এখন অনেক মুসলমানের অজানা।

এই অবস্থা নিরসনের জন্যে তথা সুদভিত্তিক ঋণের বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে সমাজে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের সুচারু বণ্টন-নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অনেকগুলো মুসলিম দেশে সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম। এদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম। এদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু হয় এবং জনগণের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পায়। বিগত বছরগুলোতে এই ব্যাংকিং পদ্ধতি বাংলাদেশের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। পৃথিবীর যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব দেশে এই পদ্ধতিতে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিনিয়োগ যে জনসাধারনের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে তা বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিককালের বার্ষিক রির্পোটসমূহ হতে জানা যায়। উদাহরণসরূপ মিশরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রের ধজাধারী এই মুসলিম দেশটির ইসলামী ব্যাংকগুলো একত্রে সেদেশের মোট বিনিয়োগ ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের এক-চতুর্থাংশ বা ২৫% নিয়ন্ত্রণ করছে। সুদের অভিশাপ মুক্ত হয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র সাধ্য ও সামর্থ্যকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগাবার জন্যে অধুনা ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি যে সুযোগ করে দিয়েছে তার ফলে সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের একটি লক্ষ্যণীয় সুপ্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে এদেশের মানুষের ইসলামী আদর্শের প্রতি জোরালো মনোভাব রয়েছে। ইসলামী আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাবান মানুষ তাদের নিত্য জীবন ধারায় ইসলামের প্রতিফলন খোজার চেষ্টা করে। সুদ যেহেতু সুস্পষ্ট হারাম সেহেতু এদেশের মুসলমানরা সুদ থেকে বাঁচার জন্য ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী কিংবা ইসলামকে এড়িয়ে চলতে চায় এমন কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসতে পারে না। তাই সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের আগে নিজেদের ধর্মানুরাগী হিসেবে প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সনদে স্বাক্ষর করে এবং ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী দেশের আর্থিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি পুর্নগঠনের জন্য ওয়াদা করে। দেশে ইসরামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে দুটি পেশাজীবী সংস্থা ইসলামিক ইকোনোমিক রিসার্চ ব্যুরো (আই.ই.আর.বি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসোসিয়েশন (বিআইবিএ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এরপর বিভিন্ন পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা, আই,ডি,বি ও সৌদিআরবের দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তির সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দেশের প্রথম সুদ মুক্ত ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আবির্ভাব ঘটে।[৫২] এর ১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক বর্তমানে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক (২০০৩ সালে ১৩ই এপ্রিল থেকে নতুন নামে চলমান ব্যাংক হিসেবে) ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করে।[৫৩] ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালের ১৮ই জুন আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং একই বছর ওআইসি এর সহযোগিতায় সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৪] ১৯৯৭ সালের ১১ই আগস্ট বিদেশী ব্যাংক হিসেবে সামিল ব্যাংক অব বাহরাইন (বর্তমানে ব্যাংক আল ফালাহ্) বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৫৫] ২০০১ সালের ১০ মে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল ব্যাংক লিঃ। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং জগতে সর্বশেষ সংস্করণ Export Import (EXIM) Bank Ltd. [৫৬]

এছাড়া কিছু সুদী ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা চালু করেছে, যেগুলো হলো, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক। সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে অথনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এখানে ব্যাংকে অর্থ জমকারী, ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সকলেরই সম্পর্ক হবে সহযোগিতামূলক, লাভ হলে সকলেই লাভবান হবে এবং ক্ষতি হলে সকলেই তার অংশীদারী হবে। ফলে কেউ কারও প্রতি জুলুম করবে না। আর বিনিয়োগ যাতে অধিক পুঁজিপতিদের হাতে চলে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকবে এবং সমাজের বেকার এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন এর জন্য সহজ শর্তে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ প্রদানের সুযোগ থাকতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পুঁজি সংগ্রহ নীতিমালা:

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের দুইটি নীতিমালা অনুসারে পুঁজি সংগ্রহ করে।

(ক) আল-ওয়াদা নীতি (খ) আল-মুদারাবা নীতি

ক. আল-ওয়াদীয়া নীতি: আল ওয়াদীয়া আল-আমানা নীতিমালার একটি রূপ। আল-আমানা নীতিতে কেউ কারোও সম্পদ এই শর্তে গচ্ছিত রাখে যে, চাহিবা মাত্র সেই সম্পদ তাকে ফেরত দিবে। কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারবে না।

---

৫২. ইসলামিক ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২০০৪, পৃ. ১৬

৫৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড, পৃ. ১৫

৫৪. Mannual for General Banking Operations, Islami Bank Bangladesh Ltd, P. 3

৫৫. Ibid, P.4

৫৬. Ibid, P. 4

Dhaka University Institutional Repository

আর আল-ওযাদীয়া নীতি হলো সেই নীতিমালা যেখানে কেউ কারও কাছে অর্থ গচ্ছিত রাখবে এবং চাহিদা মাত্র তা ফেরত পাবে। কিন্তু আমানতদার তা ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ বিনিয়োগ করতে পারবে আবার চাহিদা মাত্র তার সম পরিমাণ অর্থ ফেরত দিবে, হুবহু সেই অর্থ ফেরত শর্ত নয়। এখানে বিনিয়োগে লাভ-লোকসান যাই হোক, আমানতকারী তার কিছুই বহন করবে না।"[৫৭]

খ. আল মুদারাবা নীতি: এই নীতিমালায় আমানতকারী সম্পদের মালিক বা সাহেব আল-মাল এবং ব্যাংক অর্থ গ্রহণকারী বা মুদারিব এখানে মুদারিব সংগ্রহকৃত অর্থ ইসলামের স্বীকৃত হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ ভাগাভাগি করবে। কিন্তু ব্যবসায় যদি লোকসান হয় তা সাহেব আর-মাল বা আমানতকারী বহন করবে।[৫৮]

ইসলামী ব্যাংক এর বিনিয়োগ নীতিমালা:

ইসলামী শরীয়াতে হালাল বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। (In Practice) ইসলামী ব্যাংক সমূহ বিনিয়োগে যে সকল মুড বা নীতিমালা বর্তমানে বেশী অনুসরণ করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বাই মুরাবাহা: বাই মুরাবাহকে এমন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এটা হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যার আওতায় বিক্রেতা কোন নির্দিষ্ট পণ্য (ইসলামী শরীয়াহ ও দেশের আইনে যা অনুমোদিত) ক্রেতার কাছে একটি নির্ধারিত দামে (পূর্বস্বীকৃত মুনাফায়) ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হতে পারে কিংবা পণ্যের মূল্যের উপর শতকরা হারে প্রযোজ্য হতে পারে। এক কথায় বলতে পারি, বাই-মুরাবাহা হচ্ছে কোন পণ্য লাভে বিক্রি করা।[৫৯]

বাই-মুয়াজ্জল: বাই মুয়াজ্জলকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এটা হচ্ছে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যার আওতায় বিক্রেতা কিছু পণ্য (ইসলামী শরীয়াহ ও দেশের আইনে অনুমোদন যোগ্য) একটি নির্দিষ্ট দামে ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে এককালীন কিংবা নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের বিনিময়ে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা ও নির্দিষ্ট করে দেয়া নমুনা অনুযায়ী পণ্য ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারে। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা ও নির্দিষ্ট করে দেয়া নমুনা অনুযায়ী পণ্য ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারে। এই পদ্ধতির আওতায় ব্যাংক ভাড়ার ভিত্তিতেও উপকরণ/সরঞ্জাম/পণ্য সরবরাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে উপকরণ/সরঞ্জাম/পণ্যের মালিকানা যৌথভাবে ব্যাংক এবং গ্রাহকের থাকবে এবং গ্রাহকের অংশ বিনিয়োগ হিসাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকে বন্ধক হিসেবে জমা থাকবে। তবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উপকরণের বৈধ মালিক থাকবে গ্রাহক। গ্রাহক সব কিস্তি পরিশোধ করার পর উপকরণ/সরঞ্জাম/পণ্যের মালিক হবে।[৬০]

---

৫৭. ওয়াদী'আ ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯/১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৫–২৩৭

৫৮. 'মুদারাবা', ঐ, ১৪১৬ / ১৯৯৬, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৮৯–৯০

৫৯. Mannual for Investment under Bai-Murabaha Mode, Islamic Bank Bangladesh Ltd, P. 1

৬০. Mannual for Investment under Bai-Murabaha Mode, Islamic Bank Bangladesh Ltd, P. 1

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা: মুশারাকা হল একটি অংশীদারী কারবার। এই পদ্ধতিতেও লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। অংশীদাররা (উদ্যোক্তা, ব্যাংক প্রমুখ) একটি প্রকল্পের পুঁজি ও ব্যবস্থাপনায় অংশীদার হবে এবং কারবারের লাভ আনুপাতিক হারে ভাগাভাগি করে নেবে। আবার কারবারে লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে সকল পক্ষই লোকসান বহন করবে।[৬১]

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM): এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রাহককে সরবরাহ করবে। গ্রাহক তার অংশের মূল্য ক্রয়ের আগেই এককালীন ব্যাংকে জমা দেবে এবং ব্যাংক সম্পূর্ণ মূল্য একসাথে পরিশোধ করে সম্পদ ক্রয় করে গ্রাহককে সরবরাহ করবে। গ্রাহক ব্যাংকের অংশ পর্যায়ক্রমে কিনে নিতে থাকবে। এক্ষেত্রে ভাড়াই ব্যাংকের আয়ের উৎস।[৬২] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল এবং অন্যান্য বাই পদ্ধতিতে ৬৫% বিনিয়োগ করে। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM) এ বিনিয়োগ করে ৩০%। মুদারাবা পদ্ধতি ০.০৩% এবং মুশরাকা পদ্ধতিতে ১.৩৫% বিনিয়োগ করে।[৬৩] তবে মুদারাবা এবং মুশরাকা পদ্ধতিতে ১০% এ বেশি উন্নতি করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।[৬৪]

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা অনেকটা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই যাত্রা শুরু করে। দুইশত বছরের সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার আদলে গঠিত আইন এবং সুদযুক্ত সমাজ কাঠামোর আওতায় থেকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। তারপরেও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে সকল সীমাবদ্ধতাকে পদপিষ্ট করে বর্তমান সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং একটি জনপ্রিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন সুদী ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসা এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ বহন করে।

কৃষি ও শিল্প সম্পদের আয় ও ব্যয়:

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে।[৬৫] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য-কৃষি নির্ভর এই দেশের শতকরা ৬০ জন কৃষকই ভূমিহীন।[৬৬] ফলে এই ৬০% কৃষকই দরিদ্র। আর সর্বমোট দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা আরো বেশি বলতে গেলে বাংলাদেশের যে ৫ কোটি লোক দরিদ্র, তাদের অধিকাংশই কৃষক। সুতরাং এদেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে হলে কৃষির উন্নয়ন তথা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। সেই লক্ষে কৃষকদের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের প্রশিক্ষণ দান, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ শুরু, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষকদের শিক্ষিতকরণ, সুদমুক্ত সহজলভ্য কৃষিঋণ বিতরণ, সুলভ মূল্যে উন্নত বীজ ও সারের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

---

৬১. Mannual for Investment under Bai-Murabaha Mode, Islamic Bank Bangladesh Ltd, P.1–9

৬২. Training Materials for the Bankers, Al-Arafah Islami Bank Ltd., 3rd Edition 1999, Book-3, Chapter-3, P. 26

৬৩. Abdul Awwal Sarkar, Islamic Banking in Bangladesh: Achievements and Challenges, Jornal of Islamic Economics and Finance, Vol-1, No.1. July-December 2005, IBTRA, Dhaka, P. 49

৬৪. Janab Syed Abdullah Mohammad Saleh, "IBBL Investment Policy & Five years Perspective Plan," IBBL Investment wing, H.O., Dhaka, PP. 1–7

৬৫. প্রফেসর মু. মনজুর আলী খান, আ.স.ম. সালাহ উদ্দীন, মু. কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা: হাসান বুক হাসান-২০০১ইং), পৃ. ২০৮

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কৃষি শিল্পঃ

স্বাধীনতার পর হতে আজও বাংলাদেশ কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। অথচ কৃষি বিশেষজ্ঞ যারাই এদেশে এসেছেন সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁদের সকলেরই অভিমত বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। মূলতঃ যে প্রধান কারণটির জন্যে আজও এদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি সেটি হচ্ছে কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া। এক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হচ্ছে বিদ্যমান ক্রটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা।

এদেশে বিদ্যমান বর্গাপ্রথা জমির উন্নয়ন ও এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মস্ত বড় বাধা। যারা বেশি জমির মালিক তারা জমির যত্ন নেয় না, বর্গাদাররা স্বেচ্ছায় যা করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ বর্গাচাষী দরিদ্র হওয়ার কারণে জমির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ। এক্ষেত্রে তাদের আশু প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে গ্রাম্য মহাজন যাদের সুদের হার আকাশচুম্বী। গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারী যেসব প্রতিষ্ঠান কম হার সুদে কৃষকদের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে ঋণের যোগনদার হওয়ার দাবী করে তারা প্রকৃত দরকারের সময়ে ঋণ যোগাতে ব্যর্থ। সে সময়ে গ্রাম্য মহাজনই দ্রুত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। ফলে উৎপাদন যেটুকু হয় ফসল ওঠার পরে সুদের দায়ে তার প্রায় সবটুকুই মহাজনের গোলায় ওঠে। বাকীটুকু পায় জমির মালিক। পরিণামে বর্গাচাষীর ঋণের বোঝা আরও স্ফীত হয়। যথাসময়ে সার সেচ উন্নত বীজ ও কীটনাশক সংগ্রহ অনেক চাষীর নাগালের বইরে। ফলে কৃষি উৎপাদনে এদেশ পশ্চাৎপদ রয়েই গেছে।[৬৭]

এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্গাচাষ ব্যবস্থাকে আরও যৌক্তিক করতে হবে এবং সরকারকে অবশ্যই করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে কৃষকদের ন্যূনতম পক্ষে ঐ পরিমাণ অর্থ প্রারম্ভিকভাবে করযে হাসানা দেওয়া খুবই সম্ভব। এর চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা দেওয়াও সম্ভব হতে পারে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে। ফলে যারা ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করতে বাধ্য হয় তারা শুধু উপকৃতই হবে না, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উপদ্রব হতেও তারা রেহাই পাবে। উপরন্তু বর্গার যে অংশ ভাগ পদ্ধতি রয়েছে তারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। প্রকৃত চাষীর অনুকূলে এই অনুপাত নির্ধারিত হলে চাষীরা উৎসাহিত হবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। এ দুটো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে জনমত সৃষ্টি ও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এজন্যে ব্যাপক যোগাযোগ করতে হবে চাষীদের সাথে, জনগণের সাথে। করযে হাসানা প্রদান ও বর্গার অনুপাত চাষীর অনুকূলে বাস্তবায়ন করতে হলে জমির মালিক, চাষী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নিদারুণভাবে পশ্চাৎপদ। এজন্যে নানা কারণ দায়ী। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব ও বিদ্যুৎ সংকটের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি (Approviate Technology) উদ্ভাবন ও ব্যবহারের প্রতি আমাদের সীমাহীন অনীহার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অথচ টেকসই উন্নয়নের (Sustainable development) জন্যে

৬৭. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

লাগসই প্রযুক্তি অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী শ্রমনীতির মূল দাবীগুলি এ দেশে উপেক্ষিত। উপরন্তু সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধভাবে বিপুল সংখ্যক শিশু ও কিশোর শ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতারিত ও নিগৃহীত হচ্ছে নারী শ্রমিকেরা।

এর প্রতিবিধানের জন্যে শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের সময়ে ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতিগুলো যেমন পালনীয়, তেমনি শ্রমিকদেরও মালিকের হক আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিকের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। দুই পক্ষের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

এদেশে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মালিকরা যেমন শুরু থেকেই শ্রমিক শোষণের কথা ভাবে শ্রমিকরাও তেমনি ন্যায্য-অন্যায্য দাবী নিয়ে ঘেরাও-ধর্মঘট, কর্মবিরতি, হরতাল-পিকেটিং-লকআপ ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে মিল-কারখানা অচল করে দেয়। এ ছাড়া রয়েছে কাজে ফাঁকি দেয়া, অন্যায়ভাবে ওভারটাইমের দাবী, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকা, মানসম্মত উৎপাদনের চেষ্টা না করা ইত্যাদি। ফলে কল-কারখানা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লোকসানের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় তেমনি মিল বন্ধ বা লে-অফ ঘোষিত হলে শ্রমজীবি মানুষেরও দুর্গতির সীমা থাকে না।[৬৮]

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প স্থাপনা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন দুরাশা মাত্র। এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের নতুন অর্থনৈতিক শক্তি-মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর ও হংকং-এই সেভেন টাইগারস মূলতঃ শিল্প উৎপাদনের সোপান বেয়েই সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছে। সেসব দেশে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, কারখানায় অপ্রীতিকর ঘটনা, শ্রমিকদের স্বার্থহানিকর কাজ ঘটে কদাচিৎ। ইসলামের অনুসারী বাংলাদেশের এই বিপুল সংখ্যক লোকেরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব যদি শিল্প-কারখানা স্থাপনে এবং পরিচালনায় শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষই দরদী ও দেশপ্রেমিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, এদেশে অসংখ্য মাঝারি ও বড় আকারের শিল্প স্থাপিত হওয়ার পরেও তা আর চলেনি বা চালানো হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবেই। ব্যাংক হতে যে ঋণ নিয়ে এসব শিল্প স্থাপন করা হয়েছে সে ঋণ আদৌ শোধ করা হয়নি, হবেও না। এই ঋণ আদায়ের জন্যে এযাবৎ সকল সরকারই উপযুক্ত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকের সূত্র মতে সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত খেলাপী ঋণের পরিমাণ ২১ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১১ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। এই ঋণ আর আদায় হওয়ার নয়।

এই বিপুল ঋণ দেওয়া হয়েছিল জনগণের সঞ্চিত আমানত এবং জনগণেরই নামে বিদেশ হতে গৃহীত মূল্যবান বৈদেশিক ঋণ থেকে। অনাদায়ী এই বিপুল ঋণের পুরো দায়ভাবে এখন চেপে বসেছে হতভাগ্য জনগণেরই উপর। গ্রামের বিশ হাজার কৃষক যদি গড়ে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেয় তা হলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে একজন বড় শিল্পপতি একাই তার চেয়ে অনেক বেশী

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ নিয়ে থাকে। অথচ ঐ শিল্পপতি সমুদয় ঋণই অনাদায়ী রেখে আনায়াসে সমাজে বসবাস করতে পারে, করছেও। অপরদিকে ঐ বিশ হাজার কৃষকের অর্ধেকেরও বেশী লোক যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করে থাকে, বাকীদের অর্ধেক বিলম্বে হলেও শোধ করে।

আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা ধ্বংস হওয়া বা সে সবের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন না হওয়ার পশ্চাতে যেসব কারণ প্রধানতঃ দায়ী সেসবের মধ্যে রয়েছেঃ

(ক) শিল্প মালিকদের অতিলোভ ও অবিমৃষ্যকারিতা;

(খ) চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা;

(গ) সরকারের ভ্রান্ত শিল্পনীতি;

(ঘ) শ্রমিকদের অযৌক্তিক ও অন্যায্য দাবী এবং;

(ঙ) সরকারী আমলাদের শিল্পস্বার্থবিরোধী অপতৎপরতা।[৬৯]

কৃষি ও শিল্পভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্যে অনুসৃত ও ব্যবহৃত পন্থা ও কৌশল হুবহু প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কারণ এদেশে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বোধ ও আচরণ ঐসব দেশের বিপরীত। এজন্যেই এদেশের সুদী ব্যাংকগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ পাশ্চাত্যে অনুসৃত কর্মকৌশল অনুসরণ করার পরেও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। এজন্যে দায়ী প্রধান কারণগুলো হলোঃ

(১) প্রয়োজনীয় জামানত দেবার সামর্থ্য না থাকায় বিত্তহীন সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এসব ব্যাংক হতে কোন আর্থিক সহায়তা পায় না;

(২) সামাজিকভাবে কাম্য কিন্তু কম লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে এসব ব্যাংক আদৌ আগ্রহী নয়;

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক বিনিয়োগের পরিবর্তে বৃহৎ আকারের স্বল্পসংখ্যক বিনিয়োগে অধিক আগ্রহ;

(৪) উদ্যোক্তার/ঋণগ্রহীতার প্রকল্পের সাফল্য/ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকগুলির যথার্থ কোন উদ্বেগ থাকে না; এবং

(৫) প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তার উপযুক্ততা বা আর্থিক সাফল্য বিচার অপেক্ষা রাজনৈতিক সুপারিশ ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের চাপই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।[৭০]

এরই রন্ধ্র পথে হাজার হাজার কোটি টাকা, যা দরিদ্র জনসাধারণের প্রদত্ত কর ও বিদেশ হতে কঠিন শর্তে গৃহীত ঋণ, হাত বদল হয়ে চলে যায় শিল্পপতি তথা অসাধু ব্যক্তিদের হাতে। এই ঋণ, হাত বদল হয়ে চয়ে যায় শিল্পপতি তথা অসাধু ব্যক্তিদের হাতে। এই ঋণ আর কখনও আদায় হবে না। বরং জাতির ঘাড়ে এর বোঝা চেপে বসবে জগদ্দল পাথরের মতো।

৬৯. প্রাগুক্ত পৃ. ২০১
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৮৬% জন মুসলিম অধিবাসীর দেশ বাংলাদেশ এসব সমস্যার সমাধান ইসলামের আলোকে হওয়াই সমীচীন। বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে বিশ্বসভায়। সে জন্যে নিজস্ব তাহজীব-তমুদ্দুনের উপর নির্ভর করেই, আমাদের মানসিক ও সামাজিক পটভূমিকে সামনে রেখেই কর্মকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে যেমন দেশকে স্বয়ম্ভর হতে হবে তেমনি শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, আমদানীও হ্রাস করতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্প গড়ে তুললেও আমদানীর লাগাম টেনে ধরতে না পারলে বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা বাড়তেই থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে চাই সৎ ও যোগ্য লোকের উদ্যোগ। অসৎ লোকের হাতে দেশের শিল্পোদ্যোগ নস্যাৎ হতে বাধ্য। কার্যতঃ হচ্ছেও তাই।

জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ইসলামী বিধান ও বাংলাদেশঃ

জুয়া একটি বিশেষ ধরনের খেলা, যতে অর্থ-সম্পদ বাজি রেখে খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করেন। কুর'আন মাজীদে একে মায়সির বলা হয়েছে।[৭১] মায়সির অর্থ বন্টন করা। জাহিলিয়া যুগে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিলো। তন্মধ্যে একপ্রকার জুয়া ছিলো এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে যেয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিদের উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো। তবে উটের গোশত কেউ ব্যবহার করতো না; গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হতো। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিলো এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেতো, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এ ধরনের জুয়া মায়সির নামে খ্যাত হয়।[৭২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা.) এবং কাতাদাহ, মুআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা.) বলেছেনঃ "সব রকমের জুয়াই মায়সির, এমনকি কাঠের গুটি ও আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।[৭৩] এ আলোকে দাবা, লুডু, তাস খেলাও মায়সিরের মধ্যে গনি যদি তাতে টাকা পয়সার বাজি ধরা হয় এবং তখন এ খেলাগুলো হারাম বলে বিবেচিত হয়।[৭৪] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, লটারিও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৭৫] যে কাজে লটারির ব্যবস্থা রয়েছে তাও মায়সিরের অন্তর্ভুক্ত।[৭৬] যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানায় এমন শর্ত আরোপিত হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। এর ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয়ই বজায় থাকবে।[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আর্বিভাব পূর্ব সময়ে আরবে জুয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর মুমিনগণ এ বিষয়ে ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে চান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৭১. আল-কুরআন, ৫:৯০, ৯১, ২:২১৯
৭২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭
৭৩. ইবনে কাছীর, তাফসীর ইবনে কাছীর, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭
৭৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭
৭৫. আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭
৭৬. রুহুল বয়ান, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭
৭৭. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

"লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মদ ও জুয়ার মধ্যে ভয়ানক পাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে মদ ও জুয়ার উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ অধিকতর ভয়ানক।[৭৮] জুয়ায় একক্ষ লাভবান হয়। বাকি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জুয়ার আয়োজকরা জয়ী জুয়াড়ির অর্থ ছিনিয়ে নিতে শক্তি প্রয়োগ করে। ভাড়া করা সন্ত্রাসী দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। জুয়াড়িদের কেউই যেনো জিততে না পরে সে জন্যে নানারকম প্রতারণামূলক নীতি গ্রহণ করে। ফলে জুয়ার আয়োজক ও জুয়াড়িদের মধ্যে এবং জুয়াড়িদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, "শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়।"[৭৯]

জুয়া খেলা জুয়াড়িকে দায়িত্বহীন করে তোলে। তার মধ্যে সবসময় জুয়ার নেশা সক্রিয় থাকে। নিজ পরিবার এবং পরিবারের লোকজন সম্পর্কে সে উদাসীন থাকে। জুয়ার বিপুল অর্থ পাওয়ার লোভ ও লাভের অন্যায় বাসনা ব্যক্তিকে সকল বিষয় বিস্মৃত করে রাখে। ফলে সে ব্যক্তি ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব তার উপর দেয়া যায় না।[৮০] জুয়া জুয়াড়িদের মধ্যে তীব্র হতাশা সৃষ্টি করে। জুয়াড়িরা বিশাল অংকের অর্থ লাভের জন্য জুয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগের এ লক্ষ্য পূর্ণ হয় না। বারবার হেরে যায় তারা আর্থিক দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি হয়। তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে, অনেকে তীব্র হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেকে নেশাগ্রস্থ হয়ে পরিবার ও সমাজের বোঝায় পরিণত হয়।[৮১] জুয়ায় লিপ্ত ব্যক্তিরা ইবাদতে অবহেলা প্রদর্শন করে। তারা নেশাগ্রস্থ মানুষের মতো জুয়া খেলে। কখন সালাতের ওয়াক্ত হয় তাদের খেয়াল থাকে না। জুয়ায় বিপুল ব্যয় করলেও হজের জন্য অর্থ ব্যয়ে তারা ভীষণ উদাসীন থাকে। দান-সদকাহ তারা করে না বললেই চলে। বরং যতো অর্থ-সম্পদ লাভ করে তার অধিকাংশই জুয়ার বিনিয়োগ করে। জুয়ার জন্য তারা আল্লাহর যিকর থেকে জুয়াড়িরা সম্পূর্ণ গাফিল থাকে। আল্লাহ বলেন, "শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা বিরত হবে?"[৮২]

দায়িত্বহীনতা ও নৈতিক স্খলনের জন্য জুয়াড়িদের কেউ পছন্দ করে না, ভালোবাসে না। পরিবারে ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। অলসতা, অপব্যয় ও হতাশ মানসিকতার জন্য মানুষের চোখে তারা হেয় ও নিচ হয়ে পড়ে। সচেতন মানুষ জুয়াড়িদের সাথে কোনো রকমের আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক করতে চায় না।

সমাজে সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় সৃষ্টির নেপথ্যে জুয়া ভূমিকা পালন করে। আয়োজকরা তাদের পরিকল্পনামতো অর্থ আত্মসাত করার জন্য সন্ত্রাসী লালন করে। আবার পরাজিত জুয়াড়ি মরিয়া হয়ে নানা রকমের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে।

---

৭৮. আল-কুরআন, ২:২১৯
৭৯. আল-কুরআন, ৫:৯১
৮০. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, জুয়া ও নৈতিকতা, বিআইইসি, ঢাকা-২০০১, পৃ. ১৫
৮১. মওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া, জুয়া ও সুদ প্রসঙ্গে আল-কুরআনঃ বিধান ও বাস্তবতা, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ২৩
৮২. আল-কুরআন, ৫:৯১

Dhaka University Institutional Repository

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হলো, এতে জুয়াড়ি প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। আধুনিক জুয়া অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ। এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।[৮৩] যা ইসলামে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশে জুয়া এবং তা প্রতিরোধে ইসলামের বিধান:

বাংলাদেশে সামাজিকভাবে এবং নৈতিক দিক থেকে জুয়াকে এখন পর্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও এখানে জুয়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বিষয়টি অনেকটাই 'ওপেন সিক্রেট'। বাংলাদেশে পেশাদার জুয়াড়ির সংখ্যা কম হলেও আয়োজক পেশাদারের সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন অভিজাত হোটেল ও বারে অনুমোদিত ও অননুমোদিত জুয়ার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের প্রায় সর্বত্র জুয়া আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত অসংখ্য খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৮৪] রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঘাটের কুলি এবং এ জাতীয় নিম্নবিত্তের লোকদের মধ্যেও জুয়ার প্রচলন দেখা যায়। এদের পাশাপাশি রয়েছে সৌখিন শ্রেণীর জুয়াড়ি। তারা বাজি ধরে তাস বা অন্যান্য খেলার মাধ্যমে জুয়া খেলে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেন। জুয়া প্রতিরোধে এ হারাম ঘোষণাই ইসলামের প্রধান ব্যবস্থা। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্যনির্ধারক তীর শয়তাদের অপবিত্র কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো।[৮৫] জুয়াকে হারাম ঘোষণার পর কোনো মুসলিমের আর এ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। কারণ এ নিয়ম মেনেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিধান দিয়ে নৈতিক নীতিমালার আওতায় ইসলাম জুয়ার মতো একটি সামাজিক সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সমাজে এমন লোকও থাকতে পারে ঈমানের এ দাবি উপেক্ষা করে যারা জুয়ায় লিপ্ত হতে পারে। তাদের জন্য ইসলাম হারাম ঘোষণাকেই এ সমস্যা নিসরনের উপায় হিসেবে যথেষ্ট মনে করেনি। এজন্য ইসলাম জুয়াকে শুধু হারাম ঘোষণা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং জুয়া প্রতিরোধের জন্যে জুয়া সংশ্লিষ্ট সকল অন্যায় কাজও হারাম ঘোষণা করেছে। মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও শত্রুতা পোষণকে নিষিদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে কারো অধিকার হরণ, অন্যায়ভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ, সমাজে অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে হারাম এবং কঠিন শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এরপরও কেউ যদি জুয়ায় লিপ্ত হয় তাহলে ইসলাম তার জন্যে পার্থিব শাস্তি প্রয়োগের বিধান দিয়েছে। এমন ব্যক্তিকে জনসমক্ষে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতে

---

৮৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ. ১১৮

৮৪. প্রথম আলো ১১, ১৪, ১৭, ২৯, নভেম্বর ২০০৯; ৪, ১২, ১৫, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯/সমকাল ১৪, ১৬, ১৯, ২৩ নভেম্বর ২০০৯; ১, ২২, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯/যুগান্তর ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯/সংবাদ ৯ জানুয়ারি ২০১০/নয়া দিগন্ত ২, ৭, ৫, ৯, ১৬, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯, ২১, ২৭, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯/সাপ্তাহিক ২০০০, ১৫ মার্চ ২০০৯, ৩০ মার্চ ২০০৯

৮৫. আল-কুরআন, ৫:৯০

Dhaka University Institutional Repository

হবে। আর ইসলামি রাষ্ট্র কোনোভাবেই জুয়ার আসর চলতে দেবে না। এ আসর উচ্ছেদ করবে এবং আয়োজকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরভাবে জুয়ার শাস্তি প্রয়োগ করবে। কারণ জুয়া শুধু আর্থিক অনাচারই নয়, বরং চরিত্র বিনাশী আচরণও বটে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং এখনো সামাজিকভাবে প্রায় সকলে এবং নৈতিকভাবে অধিকাংশই জুয়াকে সমর্থন করেন না বলে, ইসলামের এই রীতি ও বিধান কার্যকর এবং নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ কোনো সীমাবদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব না হলে পারিবারিক বা সামাজিকভাবেও এ বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব, যাতে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নিশ্চিত হবে।

সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ইসলামের বিধান ও বাংলাদেশ:

সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত আর্থিক অনাচারের মধ্যে সুদ সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ ফেরতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময় মূল্য পরিমাণের জন্য যা-ই গ্রহণ করে, তাই রিবা বা সুদ।[৮৬] আবার সময় বৃদ্ধিকরণে ঋণ পরিমাণ বৃদ্ধিটাই সুদ। তবে সময় বৃদ্ধির ভিত্তিতে যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাই একমাত্র সুদ নয়। বরং এটি সুদের একটি মাত্র রূপ এবং এর এমন আরো অনেক রূপই রয়েছে।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে, তাই রিবা।[৮৮] তিনি আরো বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ সংঘটনকারী সাব্যস্ত হবে। সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ই সমান অপরাধী।[৮৯]

তাই সমজাতীয় দ্রব্য হোক বা টাকা হোক যদি ধার দেয়া হয় এবং ধার পরিশোধের সময় প্রদত্ত বস্তু বা টাকার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো বস্তু বা টাকা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হলো তা সুদ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে কিংবা সরল হার- যে হিসেবেই নেওয়া হোক না কেনো, অতিরিক্ত কিছু নিলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে।

সুদের ক্ষতিকর দিকসমূহ:

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে সুদের হারাম হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে তা থেকে মুমিনদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।[৯০] তিনি অন্যত্র বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো তাহলে সুদের মধ্যে থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো।[৯১] সুদের হারাম হওয়া

---

৮৬. আল্লামা সাবূনি, তাফসীরে আয়াতুল আহকাম, ১ম খণ্ড, দারুল যিকর, বৈরুত, ১৯৯৭, খ্রি. ৩৮৩
৮৭. ইবনে জরীর, তাফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০, পৃ. ৮৪–৮৭
৮৮. জামে সগীর, উদ্ধৃতি: মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.), তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৭৯৩
৮৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ।
৯০. আল-কুরআন, ৩:১৩০
৯১. আল-কুরআন, ২:২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করে বলেছেন, "আর আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায় বা বেচাকেনাকে হালাল করেছেন, হারাম করেছেন সুদ।"[৯২]

সুদের লেনদেনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে এই হারাম কাজ সম্পাদক করা হয়। আল্লাহর আদেশ লংঘন করে যারা সুদের লেনদেন করে তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। বলা হয়েছে, "এরপরও তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো।[৯৩]

সুদ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কঠোর আদেশ থাকার জন্য মহানবী (স.) ও তাঁর উম্মতদের তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা ক্ষতিকর ৭টি বিষয় থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদুবিদ্যা শেখা ও শেখানো, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধ থেকে পালানো এবং চরিত্রবতী নারীকে ব্যভিচারিতা অপবাদ দেওয়া।[৯৪]

আল্লাহ সুদের লেনদেনের জন্য আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি ও দুর্বিসহ পরণতি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। বলা হচ্ছে, "যারা সুদ খায়, কিয়ামতের দিন তারা সে ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে স্পর্শ দিয়ে শয়তান যাকে পাগল করে দিয়েছে। .... যারা আবারো সুদ গ্রহণ করবে তারা হবে আগুণের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।[৯৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো ইরশাদ করেন, "সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৯৬]

সুদ নিজেই একটি মূর্তমান পাপ। এটি কোনো সাধারণ পাপ নয়। বরং সকল বড়ো ধরণের পাপের মধ্যে সুদ লেনদেনের পাপটি হচ্ছে সর্বাধিক জঘন্য, কুৎসতিতম ও বীভৎস। রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন বক্তব্যে এ বীভৎসতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'সুদের গুণাহের তিয়াত্তরটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর স্তরটি হলো ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের মাকে বিয়ে করার সমান।[৯৭]

"সুদের গুণাহের সত্তুরটি পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচেরটি নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমান।[৯৮]

জেনে-শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক পাপ।[৯৯]

---

৯২. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৯৩. আল-কুরআন, ২:২৭৯

৯৪. আবুল হুসাইন ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান।

৯৫. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৯৬. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০, পৃ. ২১১

৯৭. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, দারুল মাআরিফ, বৈরুত-১৪০৯ হিজরি, কিতাবুল বুয়ূ।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) সুদী লেনদেনের সাথে জড়িতদের জন্য অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদ লেনদেনের সাক্ষী দুজনের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী।[১০০]

আল্লাহর কঠোর নির্দেশ লংঘনের পাপ হিসেবে সুদ ব্যক্তির আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। সে অন্য পূণ্য যাই করে থাকুক না কেনো, সুদের কারণে তাকে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

সুদ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিনিময় বৈষম্য রয়েছে। ব্যবসায় পণ্য ও মূল্য বিনিময় শেষ হলেই কারবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সুদ ব্যবস্থায় সুদ গ্রহীতা সুদখোর মহাজনকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। পাশাপাশি ফেরত দেয় মূলধনও। বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কোনো বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না।

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রধান কারণ হলো, সুদ একটি অত্যন্ত বড় ধরণের যুলুমমূলক ব্যবস্থা। সুদখোর মহাজন সুদদাতার সুবিধা-অসুবিধা, সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় না এনে যে কোনো মূল্যে তার মূলধন ও সুদ উসূলের চেষ্টা করে। ফলে প্রায়শঃ অপ্রীতিকর নানান ঘটনা ঘটে।

সুদ সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের শোষণের জন্যে একটা শোষকগোষ্ঠী গড়ে তোলে। তারা অভাবগ্রস্ত লোকদের ব্যক্তিগত ব্যয় নিবার্হের জন্যে সুদে ঋণ দান করে। মহাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ধরনের সুদ ভিত্তিক ঋণ দিয়ে গরীব, মজুর, শ্রমিক, কৃষক ও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে। সুদের কারণে এ ধরণের ঋণ পরিশোধ করা গরীবদের পক্ষে শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা এক ঋণ শোধ করার জন্য দ্বিগুণ-তিনগুণ ঋণে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। মূল টাকার কয়েকগুণ বেশি টাকা শোধ করা সত্ত্বেও মূল ঋণ নিজ স্থানেই অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রমজীবিদের উপার্জিত অর্থের প্রধান অংশটাই মহাজনরা সুদ বাবদ শুষে নেয়।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয় সুদ। সুদভিত্তিক ঋণভারগ্রস্ত লোকেরা সর্বদা গভীর চিন্তা ও উদ্বেগে অতিষ্ট হয়ে থাকে। সঠিক চিকিৎসা ও খাবার তাদের ভাগ্যে জোটে না বলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বাস্থ্যও হারিয়ে ফেলে। সুদের কিস্তি আর মূলধন শোধের বিভীষিকা তাদেরকে অহোরাত্র তাড়া করে। দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা তাদের মনের শান্তি কেড়ে নেয়। নবী (স.) বলেছেন, "তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ঋণ রাতের দুঃশ্চিন্তা, দিনের অপমান।[১০১]

সুদ ঘৃণা সৃষ্টি করে। গরীব ও মধ্যবিত্তদের শোষণের পথ অবারিত রেখে সুদ শোষক জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের অপরিসীমা ঘৃণার জন্ম দেয়। শোষিতরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শেষ পরিণতিতে শোষক দলও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায় না। কেননা তাদের এই অমানবিক

---

১০০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাহ।
১০১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাহ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থপরতার দরুণ গরীব ও মধ্যবিত্তদের অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মনে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার এক বিরাট ঝঞ্ঝা তৈরি হয়। প্রতিনিয়ত তা ক্ষুব্ধ হতে ও বিক্ষোভে ফুলতে থাকে। এরপর কোনো বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে এই আগ্নেয়গিরি তখন অগ্ন্যুদগীরন করে তখন এই যালিম ধনী সম্প্রদায় ধন-সম্পদের সাথে নিজেদের সম্মান এমনকি জীবনও হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।[১০২]

ব্যবসায় সাধারণভাবেই Production ও Profit বাড়ায়। কিন্তু সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে। হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এমনিভাবে সুদের হার যদি শূন্যের কোটায় নেমে আসে তাহলে বিনিয়োগে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়। ধরাযাক পাঁচটি এমন প্রকল্প যার একটিতে লাভের হার শতকরা ২৫ ভাগ। সুদের হার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পে কেউ সুদে ঋণ নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করবে না। অর্থাৎ তাতে ৪০% ভাগ বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় প্রকল্প কেবল সুদের কারণে কোনো বিনিয়োগ পাবে না। কেননা ১০% হারে সুদ পরিশোধের শর্তে নেওয়া ঋণের টাকা কেউ ১০% বা ৫% ভাগ লাগের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না। কেননা তাতে করে ব্যবসায় লোকসান হবে। এমনকি সুদের কিস্তি শোধের মতো লাভও করা সম্ভব হবে না। তাতে করে একটি বিপুল এলাকা বিনিয়োগ সুবিধা বঞ্চিত থেকে যাবে। যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সুদ। এভাবে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধক কোনো রীতি মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

সুদ আর্থিক দিক দিয়ে অভাবনীয় বৈষম্য তৈরি করে। ধনীকে আরো ধনী বানায়। গরীবকে আরো গরীব। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও সম্প্রতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, "দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুদখোরের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।[১০৩] বাস্তবতাও তাই। সুদ কোটি মানুষের আয়ে কয়েকজন পুঁজিপতির ধন-ভান্ডারকে কেবল সমৃদ্ধ করে।

সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতিতে দরিদ্রদের ধন সম্পদ নিশ্চিতভাবে ধনীদের হস্তগত হয়। ফলে সম্পদ বন্টনে শোষণমূলক অসাম্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং এ কারণে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। এটা ইসলামের সমাজদর্শন ও সামষ্টিক স্বার্থপরিপন্থী। উপরন্তু বিষয়টি আল্লাহতা'আলারও ইচ্ছা পরিপন্থী। তিনি তো মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সুদ ও চেষ্টাকে প্রভাবহীন করে দেয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্নতর অক্যালণ ধারা সষ্টি করে।

বাংলাদেশে সুদের প্রচলন ও অবস্থা:

সুদ একটি ভয়ানক পাপাচার এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামি চেতনা বিরোধী বিষয় হলেও বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য, সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিমের এ দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদভিত্তিক অর্থনীতিই প্রচলিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রীয় যে চার নীতি গ্রহণ করা হয় তাতে সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণের ঘোষণা থাকলেও বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশে পুঁজিবাদের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংহত রূপ পায়। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে এদেশ পুরোপুরি

১০২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমূল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮
১০৩. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। সে হিসেবে বাংলাদেশের সরকারি লেনদেনে, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও অন্য সকল ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে সুদভিত্তিক লেনদেনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৮৩ সালে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সুদমুক্ত ব্যাংকিং শুরু করার পর ব্যাংকিং খাতে এবং পরবর্তীতে বীমা খাতেও সুদমুক্ত বীমার নবতর ধারা শুরু হয়। বর্তমানে কেবল ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার প্রত্যাশায় এইচ.এস.বি.সি'র মত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকও বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক স্বতন্ত্রভাবে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার ব্যবস্থা রেখেছে। এগুলো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিক নির্দেশনা করে এবং বাংলাদেশের মানুষ যে তা গ্রহণ করার জন্য নৈতিকভাবে সম্মত তা প্রমাণ করে কিন্তু এসবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু থাকলেও সুদী অর্থনীতি যে এদেশের মানুষকে স্বস্তিঃ দেয়নি তা বিভিন্ন সেমিনার, গবেষণা ও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিমাগার ব্যবসার আড়ালে সুদের কারবার!

নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে হিমাগারে আলু রাখেন কৃষক-ব্যবসায়ীরা। হিমাগারে রাখা কৃষকের সেই আলুই ব্যাংকে বন্ধক রেখে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোট টাকার ঋণ। এ টাকা আবার চড়া সুদে দাদন দেয়া হচ্ছে কৃষক-ব্যবসায়ীদের। আর হিমাগার থেকে আলু তুলতে গিয়ে নানা হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কৃষক-ব্যবসায়ীরা। জয়পুরহাটের পুনট কোল্ডস্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এভাবেই সুদের কারবার চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানায়, কালাইয়ে প্রতি মৌসুমে গড়ে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়। এসব আলু সংরক্ষণের জন্য এখানে রয়েছে আটটি হিমাগার। নির্দিষ্ট ভাড়ার চুক্তিতে এসব হিমাগারে বীজ ও খাওয়ার আলু পাঁচ-ছয় মাসের জন্য রাখা হয়। কৃষকদের অভিযোগ, উপজেলার বেশির ভাগ হিমাগার বেশ কয়েক বছর ধরে আলু বন্ধক রেখে ঋণ উত্তোলন করে তা দিয়ে সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চলতি মৌসুমে শুধু পুনট কোল্ডস্টোরেজ এই ব্যবসা চালাচ্ছে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) কালাই শাখা সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে এই শাখা থেকে পুনট কোল্ডস্টোরেজের অনুকূলে চার কোটি ৬০ লাখ টাকার চলতি পুঁজি (সিসি-প্লেজ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। হিমাগার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত ৬৫ হাজার বস্তা আলু তাদের বলে চালিয়ে দিয়ে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ নির্ধারিত চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে এর চাবি ব্যাংককে বুঝিয়ে দেয়। বিনিময়ে হিমাগার কর্তৃপক্ষ ঋণের চার কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেয়। ১২ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে হিমাগার কর্তৃপক্ষ ২০ থেকে ২২ শতাংশ সুদে ঋণ দেয় কৃষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে। ঋণগ্রহীতারা জানান, ঋণের জন্য ১০০ টাকায় তাদের আবেদন ফরম কিনতে হয়। মৌসুম শেষে নির্ধারিত সুদ, সার্ভিস চার্জসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য ঋণ আদায়ের ছাপানো রসিদ প্রদান করে হিমাগার কর্তৃপক্ষ। কেউ পরিশোধে ব্যর্থ হলে হিমাগারে রাখা তার আলু বাজেয়াপ্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চলতি মৌসুমে ভাড়া পরিশোধ করে কৃষকেরা আলু তুলতে গেলে হিমাগার কর্তৃপক্ষ তাদের ঘোরাতে থাকে। এক পর্যায়ে ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। কৃষকেরা জানতে পারে, তাদের আলুভর্তি চেম্বারের চাবি ব্যাংকের জিম্মায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেম্বার থেকে আলু বের করতে দিচ্ছে না।[১০৪]

বাংলাদেশে সুদ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা:

সুদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও মানবতাবিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (স.) তাই অর্থনৈতিক লেনদেন সুদমুক্ত রাখার জন্যে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কঠোরভাবে সুদ নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ বলেছেন, "মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।[১০৫]

সুদ প্রতিরোধের জন্যে সুদর কারবারিদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "মুমিনগণ, যদি তোমরা সত্যিই মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো। আর যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।[১০৬]

সুদ প্রতিরোধের জন্যে সুদকে হারাম ঘোষণার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা এর ভয়াবহ পরকালীন পরিণতিও জানিয়ে দিয়েছেন, "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দাঁড়াবে যেমন দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রেয়তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। তাই যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। তার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারা জাহান্নামে যাবে।[১০৭]

সুদের ধ্বংসাত্মক পথ থেকে মুমিনদের বিরত রাখতে মহানবী (স.) সুদ এবং সুদ সংশ্লিষ্ট লোকদের ধ্বংস কামনা করেছেন। হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ (স.) যে সুদ খায়, সে সুদ দেয়, যে সুদের দলীল লেখে এবং যে দুজন সুদের সাক্ষী হয় তাদের লানত করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন, পাপী হওয়ার দিক থেকে তারা সমান।[১০৮] অর্থাৎ সুদ গ্রহীতা ও দাতাই শুধু নয় বরং এর যে কোনো পর্যায়ের সহযোগীরাও সমান অপরাধী।

সুদ অত্যন্ত জঘন্য একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সুদের গুনাহের ভয়ঙ্কররূপ আর বীভৎসতা তুলে ধরতে রাসূলুল্লাহ (স.) অন্যত্র বলেছেন, "সুদের গুণাহের তিয়াত্তরটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর স্তরটি হলো ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের মাকে বিয়ে করার সমান।[১০৯] তিনি আরো বলেন, "সুদের গুণাহের সত্তুরটি পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের পর্যায়টি হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।[১১০]

---

১০৪. আনোয়ার পারভেজ, হিমাগার ব্যবসার আড়ালে সুদের কারবার, প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৪
১০৫. আল-কুরআন, ৩:১৩০
১০৬. আল-কুরআন, ২: ২৭৮–২৭৯
১০৭. আল-কুরআন, ২:২৭৫
১০৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ।
১০৯. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
১১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী-১৪১১ হিজরি, কিতাবুল বুয়ূ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলেছেন, "জেনে-শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক পাপ।[১১১]

বাংলাদেশের ধর্মভীরু সাধারণ মুসলিমদের নিকট যদি সুদের ভয়ঙ্কর পাপের এই বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে তারা এমনিতেই সুদ থেকে দূরে থাকবে। বাংলাদেশে 'সুদখোর' একটি গালি এবং এখনো গ্রামের ধর্মভীরু কৃষক বিশ্বাস করেন, ১০জন সুদখোরের নাম লেখা কাগজ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত গরুর গলায় বেঁধে দিলে গরুর ঘা থেকে পোকা চলে যায়।

সুদের প্রতি দেশের ধর্মভীরু মানুষদের এ ঘৃণা ধর্মীয়বোধ, বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বর্তমান বাংলাদেশেও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ জন্য অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে এ উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারাবিহক সফলতা থেকে বিষয়টির ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে সুদভিত্তিক ও সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের শাখা বৃদ্ধির পাঁচ বছর মেয়াদী তথ্য[১১২]

ব্যাংক	১৯৯৮ সালে শাখা সংখ্যা	২০০২ সালে শাখা সংখ্যা	২০০৭ সালে শাখা সংখ্যা
সোনালী ব্যাংক	১৩০৬	১১৮৬	১১৮৩
অগ্রণী ব্যাংক	৯০৩	৮৭২	৮৬৬
জনতা ব্যাংক	৮৯৬	৮৪৭	৮৪৮
রূপালী ব্যাংক	৫১৩	৪৯৩	৪৯২
পূবালী ব্যাংক	৩৫০	৩৫০	৩৬১
ইসলামী ব্যাংক	১১০	১৪১	১৮৬
আল-আরাফাহ	৩৫	৪০	৪৬
এসআইবি	১২	২৪	২৪
শাহজালাল	০	৮	২৬

তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সুদভিত্তিক সরকারি ও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর বিকাশের হার সুদমুক্ত ব্যাংকগুলোর চেয়ে অনেক কম। তবে এটি প্রকৃত চিত্র নয়। কারণ সরকার সুদভিত্তিক নীতিমালার কারণেই ইসলামি ব্যাংকসমূহকে বেশি শাখা খোলার অনুমতি দেয় না। সাধারণ অনুমতি দেয়া হলে, অন্ততঃ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ ইসলামি ব্যাংকিংই গ্রহণ করে নিত। সুদের ক্ষতি এবং সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে সহজেই সুদ উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে।

১১১. আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু।
১১২. 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, Ibid, P. 377

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ও ইসলামী প্রতিবিধানঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক অনাচার সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার মধ্যে সম্ভবত ঘুষ সবচেয়ে জঘন্য এবং সর্বাধিক ক্ষতিকর। এর অর্থ উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ bribe. এর আরবি প্রতিশব্দ (রিশওয়া)। হাদীসেও ঘুষকে 'রিশওয়া' বলা হয়েছে। যে বস্তু বা বিষয় লাভের অধিকার ব্যক্তির নেই সে ব্যক্তি যদি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে কোনো কিছু দেয়ার মাধ্যমে সে অধিকার লাভ করে তাহলে তা ঘুষেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন নগদ অর্থের বিনিময়ে চাকরি নেয়া, বিচারক বা পুলিশকে টাকা দিয়ে অপরাধী হওয়ার পরও মুক্তিলাভ, উপহারের নামে টিভি, ফ্রিজ বা এ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে অন্যায় সুবিধা নেয়া প্রভৃতি। এমনিভাবে কারো বৈধ অধিকার বা কাজ প্রয়োজনীয় টাকার চেয়ে বেশি টাকা নিয়ে করাও ঘুষ। যেমন ইচ্ছে করে টেলিফোন বিল উল্টোপাল্টা করে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা আদায়, বিভিন্ন ফাইল আটকে রেখে টাকা আদায়। এমনকি অন্যায় কোনো সুবিধা দিয়ে তার বিনিময়ে অন্যায় সুবিধা নেয়াও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কারো ক্ষমতা আছে, সে তার দপ্তরে বা ক্ষমতাধীন ক্ষেত্রে কাউকে অন্যায়ভাবে চাকুরি দিল এই শর্তে যে, অন্য একজন আবার এর বিনিময়ে তার ক্ষমতাধীন এলাকায় বা দপ্তরে তার সুপারিশ রেখে একটি অন্যায় নিয়োগ প্রদান করবে।

বাংলাদেশে জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুষের প্রচলন রয়েছে। সন্তান স্কুলে ভর্তি করাতে হলে স্কুল কমিটি বা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়, সন্তানের ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে ঘুষ দিতে হয়, স্কুল-কলেজ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট বা কাগজপত্র তুলতে ঘুষ দিতে হয়, শিক্ষাবোর্ডের প্রতিটি কাজে সংশ্লিষ্ট লোককে ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না। দেশের সকল বিভাগে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাসপাতালের চিকিৎসক, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য, ব্যাংকার, ড্রাইভার, আইনবিদ, বিচারক এমনকি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগেও এদেশে ঘুষের লেনদেন হয়। দলীয় পরিচয় বা ময়দানে ভূমিকা যা-ই থাক, বড় দলের নির্বাচনী মনোনয়ন পাওয়ার জন্যও এখন দলীয় ফান্ডে অনুদানের নামে বড় অংকের ঘুষ দিতে হয়। চিকিৎসকের চিকিৎসা পেতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেবা পেতে, শিক্ষকের মনোযোগ পেতে, নিজের মালিকানাধীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দরকারি কাগজটি পেতে নামে-বেনামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘুষ আমাদের দিতেই হয়। অফিসে, আদালতে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে এমনকি খেলাধুলায় বাংলাদেশে ঘুষ লেনদেনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। ঘুষ দিলে রাস্তায় বা নদীতে চলাচলের অযোগ্য পরিবহণ ফিটনেস সার্টিফিকেট পাবে আর না দিয়ে সদ্য আমদানী করা ব্রান্ড নিউ কার বা পরিবহণও সিস্টেমে ধরা খাবে। ঘুষ না দেয় একটি ট্রাক নগরে ঢুকতে পারবে না। ঘুষ দিতে না চাইলে অযথাই হয়রানির শিকার হতে হবে। জনগণের অধিকার ফি দিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া। বাংলাদেশে তদন্তকারী পুলিশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কাউকে ঘুষ না দিয়ে বৈধ কাজও উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সবমিলিয়ে বাংলাদেশ ঘুষখোরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ঘুষের প্রভাবঃ

ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে কিছু লোক আর্থিকভাবে লাভবান হয় সত্য। কিছু কিছু লোক আলাদীনের চেরাগ এই ঘুষের প্রভাবে হঠাৎ বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যায় এটাও সত্য। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সূত্রে জানা যায়, এই ঘুষের প্রভাবেই বাংলাদেশে গ্যাস-বিদ্যুত-টেলিফোনের সাধারণ লাইনম্যান, মিটার রিটার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাজধানীতে প্রাসাদপোম একাধিক বাড়ির মালিক হয়েছেন। এসবই সত্য। কিন্তু এটি ঘুষের আর্থিক প্রভাবের একটি মাত্র দিক এবং অবশ্যই এটি প্রশংসার্হ বা গ্রহণীয় কোনো দিক নয়। অবশ্য ঘুষখোর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এটি ইতিবাচক দিকই বটে (!)। ঘুষের ইতিবাচক (?) এই একটি দিক বাদ দিলে বাংলাদেশে ঘুষের অসংখ্য নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. আমানতের খিয়ানতঃ

মানুষ যে দায়িত্বে নিয়োজিত সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতা তার নিকট আল্লাহর আমানত। ঘুষ নিলে মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সে ঘুষ দেয়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেয়। এতে তাকে দায়িত্বশীলতার যে আমানত দেয়া হয়েছে তার খিয়ানত করা হয়। আবার যে ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব নেয় তারপক্ষেও ঠিকমতো কাজ করা সম্ভব হয় না। সে খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারীর মতো কাজ করে। ঘুষের দাপটে সবকিছুকে অধীনস্থ বা আওতাধীন ভেবে নিয়ে কাজ করে। তাছাড়া ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা কাজ নেয়া হল বলে ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকে চাকুরি বা কাজটি থেকে প্রথমেই ঘুষের অর্থ তুলে নেয়া, তারপর নিয়মতান্ত্রিক মুনাফা করা। ফলে সে যথাযথভাবে কাজটি করে না। আবার ঘুষদাতার এই অনিয়মের কথা জানার পরও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তিনি নিজে ঘুষ গ্রহণ করে কাজ দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হয় না। ফলে দু পক্ষই দায়িত্ব অবহেলা করে। তারা তাদের কাছে প্রদত্ত আমানত নিদারুন অবহেলায় নষ্ট করে।

২. অধিকার হরণঃ

ঘুষ মানুষের অধিকার নষ্ট করে। ঘুষের মাধ্যমে মানুষ এমন কাজ করে বা এমন বিষয় লাভ করে স্বাভাবিকভাবে যা করার যোগ্যতা তার নেই বা যা পাওয়ার আরো বেশি যোগ্য লোক আছে। এর ফলে যোগ্য লোকদের অধিকার হরণ করা হয়। যেমন যে শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার মত মেধা রয়েছে ঘুষ না দেয়ার কারণে সে ভর্তি হতে পারছে না। যে লোকের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সেবা বঞ্চিত করা। যে লোকের দরকারি কাগজগুলো পাওয়া নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। টেন্ডারে সবচেয়ে নিম্নতম দরদাতাকে কাজ না দেয়া অথবা পূর্বাহ্নেই সংশ্লিষ্ট ঘুষদাতাকে সর্বনিম্ন দর জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে যোগ্য দরদাতাকে বঞ্চিত করা। বস্তুত ঘুষ লেনদেন একান্তভাবে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে অধিকার দেয়ার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি যোগ্য সে কখনো ঘুষ দিয়ে কোনোকিছু অর্জনের চেষ্টা করে না। সবসময় অযোগ্য লোকেই এ চেষ্টা করে। আর এভাবে তারা যখন সফল হয় তখন সাধারণভাবেই যোগ্য লোককে বঞ্চিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হয়রানিঃ

ঘুষের জন্যে কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ সাধারণ লোকদের অযথা হয়রানি করে। তারা ঘুষের জন্যে ফাইল আটকে রাখে। অসঙ্গত চাপ প্রয়োগ করে বা অন্যায় ভয় দেখায়। হয়রানি করা ছাড়া সাধারণত কেউই ঘুষের এই অন্যায় লেনদেন করে না। যে জন্য ঘুষখোর ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে সবসময় হয়রানির মধ্যে রাখে। সহজ একটি কাজও সহজভাবে করে দেয় না। ঘুরিয়ে পেচিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করে যে, মানুষ ঘুষ দেয়াকেই বেশি নিরাপদ মনে করে। বাংলাদেশে ঘুষ দিয়ে কাজের বরাদ্দ নিতে হয় এমনকি বিল নিতেও ঘুষ দিতে হয়।

৪. মানুষের ক্ষতিঃ

ঘুষ বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করে। ঘুষ নিয়ে ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চলাচলের অনুমতি দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। ভেজাল ও মানহীন পণ্য বাজারজাত করার অনুমতি দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। ঘুষ নিয়ে অযোগ্য লোককে চাকরি দিলে শিক্ষায়-প্রশাসনে অনিয়ম স্থায়ী রূপ পায়। সাধারণ বিবেক থেকেই বুঝা যায়, ভালো কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বা ভালো কোনো পণ্য বিপণনের জন্য ঘুষ দিতে হয় না। ঘুষ দিতে হয় খারাপ ও মানহীন পণ্য বা বিষয় প্রচলনের জন্য। তাই ঘুষ যখন এ সকল বিষয়ের প্রচলন অব্যাহত রাখবে তখন তা মানুষের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ না হয়ে পারবে না। সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে প্রতিদিন নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ চলাচল করছে।[১১৩] সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ লঞ্চগুলোকে সার্ভে সনদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে যা লাখ লাখ যাত্রীর জীবন সংহারের উন্মুক্ত ঘোষণাপত্র মাত্র।

৫. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিঃ

বাংলাদেশে ঘুষ সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঘুষ নিয়ে অপরাধী ও সন্ত্রাসীকে মুক্তি দিলে অপরাধ বেড়ে যায়। ঘুষ নিয়ে যা খুশি তা করতে দিলে বিত্তশালীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সমাজে মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করে অর্থ সম্পদের অন্যায় দাপট। ফলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যাদের অর্থ আছে তারা আইন-শৃঙ্খলা, মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতাকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতাপোষণ করে। কারণ ঘুষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্মকর্তাদের এমনকি রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কিনে নেয়ার দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে রয়েছে।

৬. সামাজিক অপরাধ ও অপব্যয় বৃদ্ধি :

ঘুষ নানা রকম সামাজিক অপরাধের মূল কারণ। ঘুষ গ্রহীতা প্রায় অনায়াসে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়। এই টাকা সে বেহিসেবী খরচ করে। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য অশালীন কাজে লিপ্ত হয়। ঘুষ দিয়ে কোনো দায়িত্ব বা কাজ পেলে সেই কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করে না। তার প্রথম লক্ষ্য হয় ঘুষসহ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা। ফলে একদিকে যেমন বাড়ে অপচয় অন্যদিকে তেমনি অপরাধের মাত্রাও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ঘুষ সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মূল প্রেরণা। কষ্টে মানুষ যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে সে টাকা অন্যায় পথে ব্যয় করা যায় না। সে টাকায় মদ কিনে খাওয়া বা অশালীন কাজে ব্যয় করার মানসিকতা এখনো বাংলাদেশের

---

১১৩. মোহাম্মদ আবু তালেব, নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ, ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের হয়নি। কেবল ঘুষ বা অন্যায় পথের টাকাই এ পথে ব্যয় হয়ে থাকে। এ পথের টাকাই ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো ধরনের হিসাবের ধার ধারে না। ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইচ্ছামাফিক সম্পদ লেনদেন হয়। এতে ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা করা হয় না। যে বেশি ঘুষ দেয় তার অনুকূলে থাকে প্রশাসন। এভাবে মানুষ তার প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ঘুষের কারণে সাধারণ মানুষের সম্পদ অত্যন্ত অমানবিক ও অন্যায্যভাবে ঘুষখোর আত্মসাত করে। ঘুষে অন্যের অধিকার ও সম্পদ আত্মসাতের দুটি ভয়ঙ্কর গুনাহ সংঘটিত হয়। তাছাড়া ঘুষের লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের জমি নিজের নামে, অন্যের শেয়ারে নিজের নামজারি করিয়ে নেয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ঘুষের মাধ্যমেই এসকল অপকর্ম হয়ে থাকে।[১১৪]

ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা:

বাংলাদেশে ঘুষ একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। লেনদেনের এমন কোনো পর্যায় নেই, সামাজিক আচরণের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ঘুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য একান্তভাবে ঘুষ সম্পর্কিত ইসলামি বিধান বাস্তবায়ন আবশ্যক। এজন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি বিধান কার্যকর না থাকলেও অসুবিধা নেই। কারণ ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে তা নিষিদ্ধ না হওয়ার জন্য ইসলামি বিধান কাজে লাগিয়ে সুদ নির্মূল করা অনেকখানিই অসম্ভব। কিন্তু ঘুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ ইসলামে যেমন ঘুষ নিষিদ্ধ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও তেমনি ঘুষ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে যদি যথাযথভাবে ইসলামি আবেগ তৈরি করা যায় এবং প্রচলিত আইনের সাথে সাথে ইসলাম বিধান কার্যকর করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই ঘুষ প্রতিরোধ সম্ভব। আর যদি পুরোপুরি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে ঘুষ প্রতিরোধের জন্য অন্য কোনো আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে না। বরং ইসলামে যে আইন রয়েছে সে আইনেই ঘুষ পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ঘুষ একটি পন্থা। ইসলাম এ পন্থার উপার্জনকে হারাম করেছে। একজন মুমিনের জন্য ঘুষ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে ঘুষকে হারাম করার এই নির্দেশই যথেষ্ট। কারণ হারামভাবে উপার্জিত জীবিকার যে দেহ পুষ্ট হয় তার স্থান জাহান্নাম এবং হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না।[১১৫] তার উপর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর পক্ষ থেকে ঘুষের লেনদেন না করার জন্য মুমিনদেরকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘুষ দেয়া আর ঈমান আনাকে একত্রিত না করতে বলেছে। বিভিন্নভাবে মানুষকে ঘুষ না নেয়া ও না দেয়া এবং ঘুষের বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা একে-অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না এবং জেনেশুনে মানুষের সম্পদের অংশবিশেষ (বা পুরো সম্পদ) অন্যায়ভাবে আত্মসাতের জন্য বিচারকদের কাছে পেশ করো না।[১১৬]

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণার একটি অর্থ হলো, শাসকদের ঘুষ দিয়ে অবৈধ উপায়ে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করো না। আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তোমরা নিজেরাই যখন জান যে, ইহা

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১১৫. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব।

১১৬. আল-কুরআন, ২:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

অপরের সম্পদ, তখন তার নিকট তার নিজ মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার সুযোগে কিংবা কোনো কলা-কৌশলের সাহায্যে তোমরা তা হস্তগত করতে পার; কেবল এ কারণে আদালতে উহার মোকদ্দমা নিয়ে যেয়ো না। কেননা মামলার ধারাবিবরণী অনুযায়ী বিচারক এই সম্পদ তোমাকে দিয়েও দিতে পারে কিন্তু বিচারকের এই রায় ভুল বিবরণীর ভিত্তিতে প্রতারিত হওয়ারই ফল হবে। এজন্য আদালত হতে উহার মালিকানা অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তুমি উহার সঙ্গত মালিক হতে পার না। খোদার দরবারে উহা তোমার জন্য হারাম হয়ে রয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে নবী (স.) ঘোষণা করেছেন, "আমি একজন মানুষ বইতো কিছুই নই। তোমরা হয়তো কোনো মোকদ্দমা আমার সম্মুখে পেশ করবে, আর তোমাদের মধ্যে এই একটি পক্ষ অধিকতর চতুর ও বাকপটু এবং তার যুক্তিমূলক কথাবার্তা শুনে হয়তো আমি তার পক্ষেই রায় দিতে পারে; কিন্তু এই কথা মনে রেখ যে, কোনো ভাইয়ের হক যদি এই ধরনের মোকদ্দমায় আমার ফয়সালার ভিত্তিতে হাসিল করে নাও, তবে তার ফলে দোযখের একটি খণ্ডই তোমাদের হাসিল করা।[১১৭]

ঘুষের সম্পদ হারাম ও অপবিত্র। পরিমাণে তা যতোই বেশি হোক এবং তার চাকচিক্য যতোই প্রবল হোক মুমিনদের দায়িত্ব হলো তাতে প্রভাবিত না হওয়া। তার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ না করা। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "বলুন মুহাম্মদ (স.)! হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের অধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে।[১১৮]

কিয়ামতের ঘুষ গ্রহীতার জন্যে লজ্জাজনক পরিণতি রয়েছে। তারা যে ঘুষ গ্রহণ করবে তা নিয়ে তাদেরকে কিয়ামতে দাঁড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে। যদি গাধা গ্রহণ করে থাকে গাধা চিৎকার করতে থাকবে। যদি গাভী গ্রহণ কর থাকে গাভী চিৎকার করতে থাকবে।[১১৯]

আখিরাতে ঘুষখোর চিরকালীন ব্যর্থতা বরণ করে নিতে বাধ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন, "ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামী।[১২০]

এভাবে ঘুষ হারাম করে এবং ঘুষের জন্যে পৃথিবীতে অসম্মান ও পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ঘুষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। তারপরও কেউ যদি ঘুষের লেনদেন করে তাহলে অপরাধের ধরন, প্রকৃতি ও ঘুষের পরিমাণ বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘুষখোরের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ করে, তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করেও ঘুষ বন্ধ করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ঘুষখোরের সাথে কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবে না এবং নতুন করে কোনো আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধও হবে না; তাহলে সামাজিকভাবেই ঘুষ প্রতিহত হয়ে যাবে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে বরং এর উল্টো চিত্রই দেখা যায়। কন্যাপক্ষ বা কন্যা নিজে জানেন যে, একজন প্রথম শ্রেণীর

১১৭. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৪
১১৮. আল-কুরআন, ৫:১০০
১১৯. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব।
১২০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা যে ক্যাডারগুলো বেশি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে যেখানে ঘুষের সুযোগ বেশি। ইসলাম ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা, শাস্তির ভয় এবং ধর্মীয় প্রকৃত আবেগ যথাযথভাবে জাগ্রত করা ছাড়া তাই এক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ইসলামী বিধান ও বাংলাদেশ:

চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই অর্থ সম্পর্কীয় সামাজিক সমস্যা। কিন্তু প্রায়ই চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে খুন ও জখমের ঘটনা ঘটে। শ্লীতাহানির খবরও প্রায়শ পাওয়া যায়। চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাই তাই কেবল অর্থ সম্পর্কীয় সামাজিক সমস্যা নয় বরং এগুলো হলো সমন্বিত সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশে এ তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত প্রবল ও আশঙ্কাজনকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

গোপনভাবে, অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করাই হলো চুরি। অন্যদের কথাবার্তা তাদের অজ্ঞাতসারে শ্রবণ করাকে বলা হয় চুরি করে শোনা। অন্যকে না জানিয়ে তাকে দেখা হচ্ছে চুরি করে দেখা।[১২১] সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে চুরি বলে।[১২২] শরীআতের পরিভাষায়, কোনো মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলমুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে চুরি বলে।[১২৩]

অন্যদিকে ডাকাতি ও ছিনতাই হয়ে থাকে সশস্ত্র অবস্থায়। দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয়াই ডাকাতি ও ছিনতাই। সশস্ত্র ডাকাতি ও ছিনতাই-লুণ্ঠনকে আরবিতে (হিরাবাহ) বলা হয়। আরবিতে লুটতরাজ ও ডাকাতি প্রভৃতি শব্দও ডাকাতি ও ছিনতাই বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১২৪] হিরাবাহ'র আভিধানিক অর্থ যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ।[১২৫] শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, কারো সম্পদ অর্জন করা কিংবা কাউকে হত্যা করা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো উপর চড়াও হওয়া।[১২৬] অধিকাংশ মতে, এরূপ আক্রমণ যেখানেই হোক, চাই তা শহর-নগর-গ্রাম-জনপদে হোক বা নির্জন পথে-ঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক, তা হিরাবাহ বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে।[১২৭] উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, ডাকাতি ও ছিনতাই বলে গণ্য হবে নিম্নের কাজগুলো যদি —

(ক) কারো সম্পদ ছিনতাই বা কাউকে হত্যা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া হয়; যদিও কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করতে বা কাউকে হত্যা করতে সক্ষম না হয়;

(খ) কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যা করা বা মারধর করা কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়নি;

---

১২১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইফাবা, মে-২০০৭, পৃ. ২৪৫
১২২. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-সারখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড-৯, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, পৃ. ১৩৩
১২৩. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড ২৪, ওয়াযাতুল আওকাফ ওয়াস শুয়ূন আল-ইসলামিয়া, কুয়েত-১৯৯৫, পৃ. ২৯৩
১২৪. প্রাগুক্ত
১২৫. আবূল ফযল মুহাম্মদ ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, খণ্ড-১, দারু সাদির, বৈরুত, পৃ. ৩০৪
১২৬. ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
১২৭. সুলায়মান আল-বাজী, আল-মুন্তাকা শরহুল মুয়াত্তা, খণ্ড-৭, দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যাও করেনি কিংবা মারধরও করেনি; তবে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং

(ঘ) সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কারো সম্পদও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাউকে হত্যাও করেছে কিংবা মারধর করেছে অথবা মারধর ছাড়াই শুধু সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।[১২৮]

হিরাবাহকে বড় চুরিও বলা হয়। কারণ দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা সরকারের অগোচরেই মানুষের সম্পদ নষ্ট করে। বড় চুরি বলার কারণহলো, এর অপকারিতা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সর্বসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২৯]

বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের প্রভাবঃ

চুরি করে যে সফল হয় সেই চোর আর্থিকভাবে সফলতা লাভ করে। একই ধরনের লাভবান হয় ডাকাত ও ছিনতাইকারী। কিন্তু এ লাভই খুবই স্থুল এবং সামান্য। কারণ বাংলাদেশে চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কারণে সকল মানুষের জীবনেই নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে যা থেকে এমনকি চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীরাও মুক্ত। যেমন-চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের মাধ্যমে অপরের মালিকানাভুক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা হয়। এতে সম্পদের ওপর ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ হয়। অপরের অধিকার হরণ করা হারাম এবং তা আরো অনেক ধরনের অপরাধ জন্ম নেয়ার কারণ।

চুরি-ডাকাতির জন্যে ঘরে এবং ছিনতাইয়ের জন্যে বাইরে মানুষ নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। এতে তার ধন-সম্পদ হুমকির সম্মুখীন হয়। চোর, ডাকাত বা ছিনতাইকারী অবস্থা বেগতিক দেখলে বা মালিক সম্পদ দিতে দেরী করলে নানা রকম নির্যাতন করে। ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় তারা খুনও করে। ফলে ঘরে বাইরে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং চোরেরও জীবন সংশয় ঘটে। প্রায়ই খবর দেখা যায়, গণধোলাইয়ে ছিনতাইকারী বা ডাকাত কিংবা চোর নিহত। এমনকি চোর সন্দেহে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার ঘটনাও বিরল নয়।[১৩০]

চোর যখন চুরি করে কোনোকিছুই বাছবিচার করে না। এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত বাংলা গাণ রয়েছে, "চোর যদি যায় শশুরবাড়ি, সুযোগ পাইলে করে চুরি। বাংলাদেশে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই প্রচলিত থাকায় সহকারী এটর্নি জেনারেল থেকে সাধারণ মানুষ কেউ-ই এর হাত থেকে কেউ-ই রেহাই পাচ্ছে না।[১৩১] জনগণের বৈদ্যুতিক সুবিধার জন্য সরকারিভাবে স্থাপিত ট্রান্সফরমারেরও একই রকম ভাগ্য বরণ করে নিতে হচ্ছে।[১৩২] প্রকাশ্যে দিবালোকে গুলি করে ছিনতাই করা হচ্ছে।[১৩৩] বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজনে বাংলাদেশে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই নুতন নতুন মাত্রা পায়। অজ্ঞান পার্টি মলম পার্টি নানাভাবে তাদের কার্যোদ্ধার করে।[১৩৪]

---

১২৮. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে, কেবল জনপদের বাইরে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতিই কেবল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২

১২৯. মুহাম্মদ আল-বাবরতী, আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, খণ্ড-৫, দারুল ফিকর, কুয়েত, পৃ ৪২৪—২৬

১৩০. প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১৫

১৩১. সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১

১৩২. প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১২

১৩৩. প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৩

১৩৪. নজরুল ইসলাম, ঈদ সামনে রেখে বেড়েছে অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা (দুই দিনে খপ্পরে পড়েছে ১৩ জন, প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর, ২০০৯,পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

শহরের বিভিন্ন কোম্পানির ট্যাক্সিক্যাব চালকবৃন্দ ছিনতাইকারীদের সাথে সখ্যতা গড়ে এক্ষেত্রে নানামুখী ছিনতাই কাজে অংশ নিয়ে থাকে। চোরের উপদ্রব বাড়লে মানুষ শান্তিতে ঘুমুতে পারে না। দিনে গুলি-ছিনতাই, রাতে চুরি, মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি পুরোপুরি বিনষ্ট করে।

বাংলাদেশের চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা:

চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই অত্যন্ত বড় রকমের অপরাধ। এর মধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাই চুরির চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ। পরকালীন শাস্তির অঙ্গীকার ছাড়াও এই অমানবিক অপরাধগুলো প্রতিরোধের জন্যে ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানের আদেশ দিয়েছে। বাহ্যত এ আদেশগুলো কোনো কোনো অতি মানবিক গোষ্ঠীর কাছে অমানবিক মনে হলেও-সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কেননা শরীরের কোনো অঙ্গে যদি নিরাময় অযোগ্য ক্যান্সার হয় তাহলে আক্রান্ত অঙ্গের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে তাকে না কাটা পুরো শরীরকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা মাত্র। এক্ষেত্রে শরীরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন হতে পারে আক্রান্ত হাত কেটে ফেলা। কেননা এতেই একমাত্র পুরো শরীর বাঁচানো সম্ভব হবে।

তাই চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামের দণ্ডবিধান কার্যকর করা হলে যেহেতু মানবসমাজ রক্ষা পাবে তাই এ বিধান কার্যকরা করাই হলো প্রকৃত মানবতাবোধ। আর ইসলামে প্রদত্ত শাস্তি কার্যকর করতে হলে আগে ইসলামি আইন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে চুরি বা অন্য যেকোনো দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ইসলামি আইন কার্যকর করা যাবে না। তবে বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত দেশ এবং চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই যেহেতু বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা সে কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামি আইন বলবত না থাকলেও কেবল চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন বজায় রেখে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও স্বস্তি লাভ সম্ভব।

চুরি এবং ছিনতাই ও ডাকাতির মাধ্যমে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা হয় তা হারাম। এর সাথে সাথে ত্রাস সৃষ্টি করা বা মানুষ হত্যা করার যে ঘটনা ঘটানো হয় তাও হারাম। বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে হারাম থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হলে লোকেরা নিজেদেরকে এ সকল অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতো। কারণ কুরআন মজীদে খুব স্পষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, "মুমিনগণ! তোমরা একে-অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। তবে তোমরা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসায় করো, তা করা তোমাদের জন্য হালাল হবে। তোমরা এক অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু।[১৩৫]

চুরি না করা, চুরি করতে না দেয়া, ছিনতাই ও ডাকাতি থেকে বেঁচে থাকা, নিজে ছিনতাই ও ডাকাতিতে জড়িয়ে না হওয়া মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। কোথাও ডাকাতি-ছিনতাই-চুরির ঘটনা ঘটলে ঈমানের অনিবার্য দাবি, তা প্রতিরোধ করা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যখন কোনো লোক কোনো মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নেয় আর লোকেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তখন সে আর মুমিন থাকে না।[১৩৬] তাই বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই ও ডাকাতির বিরুদ্ধে

---

১৩৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

১৩৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানী এই চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব হলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাইকৃত উপার্জন হারাম হওয়ার কারণে এ পথের উর্পাজনকারীদের ইবাদত কবূল হয় না। জীবিকা হারাম হওয়ার কারণে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্ধারিত হয় জাহান্নাম। ঈমান আনা কোনো ব্যক্তি যার আখিরাতে বিশ্বাস আছে তার মধ্যে যদি দৃঢ়তা ও সঠিক শিক্ষার সাথে এ বিষয়গুলোর চেতনা সজিব করে তোলা যায় তাহলে তারপক্ষে আর ছিনতাই, ডাকাতি ও চুরিতে লিপ্ত সম্ভব হবে না।

আখিরাতে শাস্তি এবং হারাম উপার্জনের মন্দ পরিণামের চিন্তাও যাকে চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাই থেকে দূরে রাখতে পারে না, ইসলাম সে ব্যক্তির জন্য নানা রকম পার্থিব শাস্তিরও ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন-

চুরিঃ চুরির শাস্তি হলো ত কাটা। এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সপূর্ণ একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন; "পুরুষ চোর ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এহলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি।[১৩৭] তবে হাত কতটুকু কাটতে হবে, কীভাবে কাটতে হবে এবং কোন হাত কাটতে হবে, এসকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।

চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কবজি থেকে কাটতে হবে।[১৩৮] দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে।[১৩৯] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর সে আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।[১৪০] তবে তৃতীয়বার চুরি করলে কী শাস্তি দেয়া হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও কতিপয় হাম্বলী ইমামগণের মতে, তৃতীয়বারের চুরির শাস্তি হলো কারাগারে আটক রাখা।[১৪১]

মালিকী ও শাফিঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে তাহলে তাকে তাযীরের আওতায় কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে।[১৪২] তাদের দলীল রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস, "যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দাও। ফিরে আবারো চুরি করলে তার পা কেটে দাও।[১৪৩]

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় এবং তার পরের চুরিগুলোর শাস্তি হদ্দ বা শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে নয় বরং তা তা'যীরের আওতায় কার্যকর হবে। হযরত আলী (রা.) এক চোরকে তৃতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে হাত-পা কাটার শাস্তির পরিবর্তে বেত্রাঘাত করেছিলেন।[১৪৪]

---

১৩৭. আল-কুরআন, ৫:৩৮
১৩৮. ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১৩৯. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড-৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫—০৬
১৪০. আলী দারু কুতনী, আস সুনান, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত-১৯৬৬, কিতাবুল হুদুদ।
১৪১. আস সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড-৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-৪১, আলা উদ্দিন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড-৭, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, পৃ. ৮৬—৮৭
১৪২. মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড-৮, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, পৃ. ৩৭১
১৪৩. আলী দারু কুতনী, আস সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ।
১৪৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড-৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০—৪১

Dhaka University Institutional Repository

ডাকাতি ও ছিনতাই:

ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মধ্যে কেবল অর্থ ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটিই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা ত্রাস সৃষ্টি করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের জীবন ও সম্ভ্রমহানি ঘটায়। সেজন্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের শাস্তি কার্যকর হবে। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।[১৪৫]

ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের ক্ষেত্রে আয়াতে ঘোষিত শাস্তিসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে ইমামগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। তবে শাস্তিগুলো অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে না কি বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী এ শাস্তিগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

শাফিঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তিসমূহের কোনো একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন হত্যাকাণ্ড ঘটাল, ধন-সম্পদও ছিনিয়ে নিল তাকে শূলে ছড়িয়ে হত্যা করা হবে। আর যে কেবল হত্যা করলো, সম্পদ ছিনিয়ে নিল না, তাকে কেবল হত্যা করা হবে। আবার যে হত্যা করলো না বা অর্থ-সম্পদও ছিনিয়ে নিল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে। অপরদিকে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, বিচারক এ চারটি শাস্তির যেকোনো একটি এ পর্যায়ের যেকোনো অপরাধে প্রয়োগ করতে পারবেন। কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে বিচারক তাঁর সুবিচেনা অনুযায়ী তা নির্ধারিত করবেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে হতাকাণ্ড ঘটানোর কিংবা কারো কোনো ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার আগে কোনো ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলে তাকে তাযীরের আওতায় যেকোনো উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার পর কারাবন্দি করে রাখা হবে, সে পর্যন্ত না সে বিশুদ্ধ তওবাহ করবে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যদি নিসাব পরিমাণ কারো অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া হবে। যদি কেউ নিরপরাধ কাউকে হত্যা করে কিন্তু কোনো অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়নি তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটাল এবং অর্থ-সম্পদও অপহরণ করলো, তাহলে তার ব্যাপারে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছা করলে প্রথমে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলবেন এরপর হত্যা করবেন অথবা শুধু হত্যা করবেন অথবা শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলবেন। তাঁর মতে, এ ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শুধু হত্যা করাই যথেষ্ট হবে না বরং এর সাথে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধকরণকে যোগ করতে হবে।[১৪৬]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। হাত-পা কাটা হবে না।[১৪৭] বস্তুত জাতীয় সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য যেমন তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্যও চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই থেকে বেঁচে থাকা এবং দেশকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক। ইসলামে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দেশকে বাঁচিয়ে রাখার অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছে। এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের অশেষ কল্যাণ।

---

১৪৫. আল-কুরআন, ৫:৩৩
১৪৬. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড-২৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
১৪৭. ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন

* ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের মর্মকথা
* ইসলামী নীতিমালায় সম্পদ ব্যয়ের মর্মকথা
* বাংলাদেশে উপার্জন ও ব্যয়ে দুর্নীতি ও ইসলামী বিধি-বিধান
* বাংলাদেশে হালাল উপার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের মর্মকথাঃ

পৃথিবীতে কোন কাজই উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। প্রতিটি কাজের পিছনেই একটা বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল্যাণকর-অকল্যাণকর হওয়ার পরিমাণও তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে। যদি তার পিছনে খারাপ মানসিকতা কার্যকর থাকে, তাহলে পুরো উদ্যোগটাই খারাপ বলতে হবে। আর এরূপ অবস্থায় নিঃসন্দেহে উক্ত 'ব্যবস্থা' মন্দ ব্যবস্থা। যদি কোন ব্যবস্থার পিছনে ভাল মানসিকতা কাজ করে এবং তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সবই ভাল হয়, তাহলে উক্ত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি কল্যাণকর হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করারও অবকাশ নেই।

এই নীতির প্রেক্ষিতে আমরা যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, তখন তার উদ্যোগ, উদ্দেশ্য ও পিছনে কর্মরত মানসিকতাকে দুটি অবস্থায় সীমিত দেখতে পাই। তার মধ্যে একটি হলো, অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তার মধ্যে বিনিময় ও দর কষাকষির চেতনা জাগিয়ে রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফাবাজির 'আরো চাই, আরো চাই' শ্লোগানকে কোন পর্যায়েই কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই চিন্তাধারাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং এর ছত্রছায়ায় উক্ত ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে কার্যকর অপর দিকটি হলো, এই ব্যবস্থার চেতনা ও উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং মানব জীবনের প্রয়োজন মেটানো ও অভাব দূর করাই এর লক্ষ্য। আর এজন্য শুধু ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মানসিকতাই এর পিছনে কাজ করে। তাতে অধিক মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই।[১]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিউক্ত দুটি মানসিকতা কিংবা চেতনার মধ্যে ইসলামী অর্থনীতি শুধু একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ হলো, মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানো এবং অভাব-অনটন দূর করা। ইসলাম অর্থনীতিকে বিত্তবানদের মধ্যে মুনাফা লুটার প্রতিযোগিতার মাঠে পরিণত করতে চায় না। সে এটাকে অভাব মোচন ও প্রয়োজন মেটানোর একটা কল্যাণকর মাধ্যমে রূপান্তরিত করে সবার জন্য অবারিত করার পক্ষপাতী। এ সম্পর্কে মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, (ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়) অবশ্যই অধিক উপার্জনকারী সদস্য থাকবে। কারণ রুযী-রোযগার ব্যতীত কোন মানুষই জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি যত উপার্জন করবে, সে পরিমাণ ব্যয় করতেও সে বাধ্য থাকবে। তাতে করে ব্যক্তির রোজগার যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যও সে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যোগ্য ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে উপার্জন করবে। কিন্তু তারা শুধু নিজের জন্য উপার্জন করবে না, সে উপার্জন হবে জাতির প্রতিটি লোকের জন্য। এক শ্রেণীর উপার্জন অন্য সবার জন্য দারিদ্র্যের সংবাদ বয়ে আনবে, যা বর্তমানে সাধারণত হচ্ছে, (ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায়) কখনো এরূপ পরিস্থির সৃষ্টি হবে না।[২]

---

১. মাওলানা হিফজুর রহমান (অনু. মওলানা আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৩২

২. তরজমানুল কুরআন, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩২ (সুত্রঃ মাওলানা হিফজুর রহমান) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি এমন সব সুশৃঙ্খল আইন-কানুন ভিত্তিক যা শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞান পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হে ধর্ম তথা আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে অস্তিত্ব লাভ করেছে। ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর কতকগুলো নীতি হচেছ এই ব্যবস্থার প্রেরণা শক্তি। এসব নীতির দৃষ্টিতে অর্থ ব্যবস্থা হলো অভাব-অনটন দূর করা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য; অধিক মুনাফা ও লাভ অনুসন্ধানের জন্য নয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহের আর্শীবাদ ও কল্যাণের বার্তাবহ।

জীবনোপায় অধিকারে সমতাঃ

অর্থনীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বর্ণিত নীতিমালা হলো এই যে, রিযিক ও জীবিকা সংস্থানের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। প্রতিটি মানুষের জীবিকার দায়-দায়িত্ব একমাত্র তাঁর। আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম ও কৌশলধারা হলো, পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় পরিবেশে মানুষের জীবিকায় গুণ ও মানগত পার্থক্য হতে পারে; কিন্তু ধনী-দরিদ্রের স্বভাবজাত বিভাগ সৃষ্টি সত্ত্বেও পৃথিবীতে একটি লোককেও তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলর নিকট জীবিকার অধিকার সবার জন্য সমান। এই সমতায় আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেই হস্তক্ষেপ করার অধিকার দান করেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানবের জীবিকার জিম্মাদার। শুধু তাই নয়, তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়-দায়িত্ব তাঁর। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করেছেন।"[৩]

"তোমাদের জীবিকা এবং যে বস্তুর তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো আকাশে (আল্লাহর জিম্মায়) রয়েছে।"[৪]

"(দরিদ্র্যের ভয়ে) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও।"[৫]

"আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের জীবিকা দান করে। আল্লাহ্‌র সাথে কি অপর কোন প্রভু রয়েছে?"[৬]

"আমরা তোমাদের জন্য এবং যাদের তোমরা জীবিকা প্রদান করো না, তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবিকার উপকরণ তৈরি করে রেখেছি।"[৭]

"তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৮]

---

৩. আল-কুরআন, ১১:৩
৪. আল-কুরআন, ৫১:২২
৫. আল-কুরআন, ৬: ১৫১
৬. আল-কুরআন, ২৭:৬৪
৭. আল-কুরআন, ১৫:২০
৮. আল-কুরআন, ২:২৯

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো গোত্র, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এসব বাণীর সারকথা হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনোপায় আল্লাহ্ তা'আলা চিরন্তন কোষাগারের দান। তা থেকে প্রতিটি প্রাণীর উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত বাণীর সারমর্মটি নিচের আয়াতগুলোতে আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, "এবং পৃথিবীর উপরিভাগে তিনি আকাশচুম্বী পাহাড়-পর্বত বানিয়ে দিয়েছেন। তাতে অনেক উপকারী জিনিস রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র চার দিনে তাতে সে সবের পরিমাণ মত খাবার রেখে দিয়েছেন। (জীবিকার অন্বেষণ অনুপাতে) অভাবীদের সবার জন্য এসব সমান।[৯]

"এবং আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদা দান করেছেন। যাদের বেশি দেয়া হয়েছে, তারা তা সবাই সমান হওয়ার জন্য অধীনস্থদের দিয়ে দেয় না। এটা কি আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন হচ্ছে না?"[১০]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে জীবিকার ক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরও একে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবে অস্বীকার করা।

জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে যদিও সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার সমান নয়। আর এই পার্থক্য একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত। অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য একই ধরনের জীবন-উপকরণ হওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু তা সবার জন্য অবশ্যই হতে হবে। আর এই শ্রেণীগত পার্থক্য সংযত পর্যায়ে থাকবে। কোন অবস্থায়ই তা মানুষের মধ্যে অত্যাচার-নিপীড়নের কারণ হতে পারবে না। অর্থাৎ জীবনোপায়ে শ্রেণীগত পার্থক্য একটা পর্যায় পর্যন্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই পার্থক্য মানব সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ফেলবে, এক শ্রেণীর অগ্রগতি, অপর শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত হবে- ইসলাম এটা মোটেও সমর্থন করে না। জীবিকা ও জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমরা পার্থিব জীবনে মানুষের জীবিকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। (আর তা এমনভাবে করা হয়েছে যে), জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে তাদের একদলকে অপরদলের ওপরে মর্যাদা দিয়েছি।"[১১]

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রুযী-রোযগার বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন।"[১২]

"তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের এককে অপরের স্থলবর্তী করেছেন এবং যা কিছু তোমাদের দেয়া হয়েছে তাতে পরীক্ষা করার জন্য একদলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[১৩]

---

৯. আল-কুরআন, ৪১:১০

১০. আল-কুরআন, ১৬:৭১

১১. আল-কুরআন, ৪৩:৩২

১২. আল-কুরআন, ১৩:২৬

১৩. আল-কুরআন, ৬:১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ্ রুযী-রোযগারের ক্ষেত্রে তোমাদের এক দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যাদের বেশি দেয়া হয়েছে তারা পারস্পরিক সমতার জন্য তা অধীনস্থদের দিয়ে দেয় না এটা কি আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন হচ্ছে না?"[১৪]

বস্তুত মানুষের রুযী-রোযগারে শ্রেণীগত পার্থক্য এক ধরনের পরীক্ষা বিশেষ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিত্তবানদের ধন-সম্পদ দান করে চান যে, তারা যেন এসব একমাত্র তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে না করে। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা সত্ত্বেও তারা যেন এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা যতো বেশি উপার্জন করবে, উপার্জিত সম্পদে সমাজের আর পাঁচজনের অধিকার ততো বেশি আরোপিত হবে। কারণ বিত্তবান ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যই উপার্জন করে না, সমাজের অন্য সদ্যদের জন্যও করে থাকে।

সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রেণীগত এই পার্থক্য সমাজের অন্যদের জীবনোপায় বন্ধের জন্য এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক লুটতরাজের জন্য যারা এরূপ করে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত (বা সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তারা কি আল্লাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে?" কেননা, ধন-সম্পদের উদ্দেশ্য অধিক মুনাফা ও সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা নয়; এর দ্বারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে সামাজিক প্রয়োজনেও পূরণ করতে হবে।

সে সব বিধিব্যবস্থায় মজুদদারী ও পুঁজিবাদী সুযোগ রয়েছে এবং ধন-সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ ও বন্টন হওয়ার পরিবর্তে শ্রেণী ও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে আর সাধারণ মানুষ হয় নিঃস্ব ও দরিদ্র, ইসলাম তা কোন অবস্থায়ই সমর্থন করে না। ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা ও মজুদদারীর নিষিদ্ধতা এবং তা বাধ্যতামুলকভাবে ব্যয় করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

"যারা সোনা-রূপ (ধন-সম্পদ) জমা করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন এসব ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুণে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (বলা হবে), তোমরা যা কিছু শুধু নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এগুলো তো সেসব ধন-সম্পদ। সুতরাং তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছিলে, এখন তার স্বাদ চেখে নাও।"[১৫]

"সদকাসমূহ গরীব, মিসকীন ও সদ্কা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, আর যাদের অন্তরে সত্য কালেমার আকর্ষণ সৃষ্টি করা আবশ্যক, গোলামকে মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের দায়মুক্ত, আল্লাহ্র রাহে খরচ করা (অর্থাৎ মুজাহিদ ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য) এবং মুসাফির বা ভ্রমণকারীদের জন্য-এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও মহান কুশলী।"[১৬]

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে যাকাত ও সদ্কা প্রদান এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশের প্রেরণা, সর্তকবাণী ও বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র কুরআনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। আর এ সবের সারকথা হলে,

---

১৪. আল-কুরআন, ৯:৩৪–৩৫
১৫. আল-কুরআন, ৫৯:৭
১৬. আল-কুরআন, ৯:৬০

Dhaka University Institutional Repository

ধন-সম্পদ জমা করার জন্য নয়, এসব হচ্ছে খরচ করার জন্য। ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের পরিবর্তে উপার্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা নিজের ও সমাজের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীস ও ইসলামী বিধি-বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কাউকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে জীবিকা উপার্জনের পরিশ্রম ও উদ্যোগ-আয়োজনের বেলায়ও কয়েকটি বিধান মেনে চলতে হবে। এসব নীতি বা বিধান একদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, অপরদিকে জীবিকা উপার্জনকারীকে আর্থিক সচ্ছলতার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক অগ্রগতিও দান করে। আর এ জন্যই ব্যক্তিগতভাবে জীবিকার অন্বেষণকালে সব সময় দু'টি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, উপার্জিত জীবিকা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো 'তাইয়্যেব' বা পবিত্র পথে উপার্জন করবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! পৃথিবীতে হালাল ও পাক-পবিত্র যা রয়েছে তোমরা তাই খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১৭]

" আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন তার থেকে হালাল ও পবিত্র (রিযিক) খাও।"[১৮]

"হে রসূল! তুমি পবিত্র বস্তু থেকে খাও এবং নেক কাজ কর। তোমরা যে সব কাজ কর নিশ্চয়ই আমি সেসব অবগত আছি।"[১৯]

ইসলামী গবেষকগণ পবিত্র কুরআনের আয়াতের 'হালাল' ও 'তাইয়্যেব' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আল্লামা রশীদ রেযা তাঁর গ্রন্থ 'তাফসীর আল্-মানার' এ প্রসঙ্গে বলেছেন, (কারো জন্য) কোন বস্তু তাইয়্যেব বা পবিত্র হওয়ার মানে হলো, তাতে অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত না থাকা। কেননা, পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে যেসব বস্তু হারাম বলা হয়েছে সেগুলো মূলগতভাবেই হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু। নিরুপায় বা মযবুর পরিস্থিতি ছাড়া এসব হারাম বস্তু কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। এছাড়া আর এক ধরনের হারাম বস্তু রয়েছে সেগুলো মূলগতভাবে হারাম নয়। কিন্তু বাইরের কারণে এসব বস্তুকে হারাম বলা হয়। এ জাতীয় বস্তুর বিপরীতেই 'তাইয়্যেব' বা 'পবিত্র' শব্দ বলা হয়েছে। সুতরাং যেসব বস্তু অন্যায়ভাবে উপার্জন করা হয়েছে, ন্যায়ানুগ পন্থায় করা হয়নি, যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়া, ছিনতাই, প্রতারণা, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ, চুরি ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় অর্জন করা হয়েছে, এগুলোও হারাম বস্তু। এগুলো তাইয়্যেব বা পবিত্র নয়। অতএব, প্রতিটি অপবিত্র বস্তুই হারাম। সেটা বাইরের কারণেই হোক, কিংবা মূলগতভাবেই হোক। যেমন খাবার পচে দুর্গন্ধময় হয়ে (শারীরিক ব্যাধির কারণ হওয়া)।[২০]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'হালাল' ও 'তাইয়্যেবের' বিপরীতে 'হারাম' ও 'খবীস' (অপবিত্র)-এর কিছু কিছু শ্রেণীবিভাগও উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু কিছু শুধু নীতিগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; "মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং

---

১৭. আল-কুরআন, ২:১৬৮

১৮. আল-কুরআন, ৫:৮৮

১৯. আল-কুরআন, ৪০:৫১

২০. আলমানারা (আরবী), প্রথম খন্ড, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

যেসব জন্তুতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারিত হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে ছেড়ে দেয়া হয়েছে), যেসব জন্তু গলাটিপে মারা হয়েছে কিংবা পাথর বা লাঠি দ্বারা আঘাতেরফলে অথবা নিচে পড়ে যাওয়ার ফলে, কিংবা শিংয়ের গুঁতোয় মারা গেছে-যেসব তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কিন্তু যেসব জন্তু মরার আগেই তোমরা জবাই করবে, আর জায়গা মত জবাই করবে তা আলাদা। লটারির সাহায্যে ভাগ ঠিক করা—এসব গুনাহের কাজ।"[২১]

"নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, প্রতিমা ও পাশা খেলা অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ, যেন তোমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হও।"[২২]

রসূলুল্লাহ্ (স.) পুরুষদের রেশমী পোশাক, ফুল কাটা জরীদার রেশমী বস্ত্র, মোটা রেশমের পোশাক পরা, রেশমের তৈরি গদীতে বসা এবং রক্তিম রংয়ের পোশাক পরতে নিষিদ্ধ করেছেন।[২৩]

যাইহোক, জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিধান হলো, উপার্জিত বস্তু হালাল হতে হবে, হারাম হবে না। তাইয়্যেব বা পবিত্র হতে হবে, খবীস বা অপবিত্র হতে পারবে না। 'হালাল ও তাইয়্যেব' এবং 'হারাম ও খবীস' শব্দের ব্যাখ্যা করে দেয়া হলো। তাতে করে এ ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও বিধান অনুধাবন করতে অসুবিধা ও বিভ্রান্তি হবে না। এখন যদি কেউ এসব মৌলিক নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক জীবনে পরিশ্রম করে জীবনোপকরণ উপার্জন করে; তাহলে তার এই উপার্জন ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হবে।

ইসলামী নীতিমালায় সম্পদ ব্যয়ের মর্মকথা:

জীবিকা উপার্জনের পর আসে ব্যয়ের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হলো তিনটি। প্রথমত, কি ব্যয় করা হবে। দ্বিতীয়ত, কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে এবং তৃতীয়ত, কোথায় ব্যয় করা হবে। কি ব্যয় করা হবে এ প্রশ্নের উত্তর তো উপরে জীবিকা উপার্জনের আলোচনায় দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি হালাল ও পবিত্র পন্থায় যা কিছু উপার্জন করেছে, সেটাই তার 'জীবিকার পুঁজি' এবং এটা তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী।

এখন কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে, এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি পবিত্র কুরআনের আলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশটি ব্যক্তি-জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "পানাহার কর। অপব্যয় করো না।"[২৪]

"তোমরা কখনো অযথা ব্যয় করো না। (খরচপত্রে) সীমা অতিক্রমকারীরা শয়তানের ভাই (সমতুল্য)।"[২৫]

---

২১. আল-কুরআন, ৫:৩

২২. আল-কুরআন, ৫:৯০

২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস।

২৪. আল-কুরআন, ৭:৩১

২৫. আল-কুরআন, ১৭:২৬—২৭

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত দু'টি আয়াতে নিজের হালাল ও বৈধ উপার্জন ব্যয় করার ব্যাপারে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ব্যয়ের বেলায় 'ইসরাফ' ও 'তাবযীর' যেন না হয়। আল্লাহ মাওয়ার্দী এই দুইটি শব্দের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: ব্যয়ের পরিমাণে সীমা অতিক্রম করাকে বলা হয় 'ইসরাফ'। তাতে কারো প্রতি ন্যস্ত দায়িত্বের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অচেতনতাকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করাকে তাবযীর বলা হয়। আর এর দ্বারা ব্যয়ের সঠিক ক্ষেত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে।[২৬]

মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী 'কাওয়ায়েদুল্ কুরআন' নামক গ্রন্থে 'তাবযীর' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সম্পদ অযথা ব্যয় করো না। অতিরিক্ত খরচ করার অর্থ হলো, বেহুদা ও পাপ কাজে খরচ করা কিংবা বৈধ ব্যাপারে বল্লাহীন খরচ করা। তাতে করে পরবর্তীতে নিজের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্বপালন করা সম্ভব হয় না এবং তা 'রূহুল মা'আনীর' গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের আয়াত, "(আমি তোমাদের রিযিক হিসাবে যা প্রদান করেছি, তা থেকে খাও এবং অকৃতজ্ঞ হইওনা)" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: 'লা-তাত্গাও ফীহি' বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিযিক হিসাবে যা দান করেছেন; তাতে অবাধ্য হইও না। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হইও না এবং ধন-সম্পদকে অপব্যয়, অহংকার, আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ ও নিজের কর্তব্য পালন না করার মাধ্যমে পরিণত করো না।"[২৮]

খরচপত্রে অপব্যয় ও অযথা ব্যয় ক্ষতিকর জীবন ব্যবস্থারই চিহ্ন। কারণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা উচিত নয়। কেননা এরূপ করা হলে প্রয়োজনের সময় অন্যের নিকট হাত পাততে হবে। বরং একজন বিত্তবানের ওপর আল্লাহ্ তাআলা যেসব সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন, সেসব পুরা করার পরও যাতে পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু সঞ্চয় হয়, সেদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তাআলা ধন-সম্পদ দেয়া সত্ত্বেও কৃপণতা করে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য জীবন ব্যবস্থাকে কষ্টকর করাও উচিত নয়। নবী করীম (স.) বলেছেন, "আয়-ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো সচ্ছল অর্থনৈতিক জীবনের অর্ধাংশ"[২৯]

পবিত্র কুরআন ও হাদীস জীবন-ব্যবস্থার আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মৌলিক নীতি হিসাবে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করেছে। এগুলো হলো:

(১) সম্পদ ব্যবহার বা ব্যয়ের অপব্যয়, অযথা ব্যয় এবং কৃপণতা-এ তিনটির কোন পন্থাই বৈধ নয়। এই তিনটি শব্দের অর্থ ও ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে; আভিধানিক অর্থ নেয়া যাবে না।

(২) মধ্যপন্থায়ই জীবনোপায়ের ন্যায়ানুগ পথ। এটা কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও একটা মাধ্যম।

---

২৬. তাফসীরে রূহুল মাআনী, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৫৯

২৭. মওলানা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী, ফাওয়ায়িদুল কুরআন, পৃ. ৩৬৮

২৮. তাফসীরে রুহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২১৬

২৯. উদ্বৃত: মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ব্যক্তি যেহেতু ব্যষ্টি বা সমাজেরই একটা অঙ্গ, সেজন্য তার উপার্জনে সমাজেরও অধিকার রয়েছে। সে যত বেশি উপার্জন করবে, এ অধিকার তার উপর তত বেশি ন্যস্ত হবে। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ্' বা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।

(৪) ব্যক্তিগত জীবনোপায় থেকে সর্বপ্রথম নিজের ও পরিবার-পরিজনের ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা করা সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিগত পৃষ্ঠায় যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, এরপর যেসব দায়িত্ব আসবে, সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলোঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর যদি বাধ্যতামূলক অনুদান যাকাত ইত্যাদি দেয়া ফরয হয়, তাহলে সর্বপ্রথম তাকে এসব আদায় করতে হবে। এমনকি এরূপ অবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকারের পূর্বেই এই সামাজিক অধিকার পূরণ করতে হবে।

(খ) 'সাদাকাতে ওয়াজিবা' বা বাধ্যতামূলক অনুদান দেয়ার পরও ব্যক্তির দন-সম্পদে আরো কিছু সামাজিক হক বা অধিকার রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, "ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও কিছু হক বা অধিকার রয়েছে।" যেমন বায়তুল মালের রাজস্ব দ্বারা যদি রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের জীবিকার সংস্থান না হয়, তাহলে খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান জোরপূর্বক বিত্তবানদের ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে সে ঘাটতি পূরণ করতে পারেন-এমনকি বিত্তাবানরা যদি তাদের ধন-সম্পদের বাধ্যতামূলক অনুদান যাকাত ইত্যাদি আদায় করেও থাকেন।

(গ) সাধারণ মানুষের এইদিকে দান-খয়রাত এই পরিমাণ করতে হবে যাতে পরিবারবর্গের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ অবশিষ্ট থাকে। কারণ সব সম্পদ দান করে ফেললে তাদের আবার পথে দাঁড়াতে হবে। এরূপ পরিস্থিতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কথাটা এভাবেও বলা যায়, পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে দেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (স.) এর একটি বাণীতেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ঘ) বিশেষ মানসিক অবস্থায় সর্বস্ব উৎসর্গ করা উত্তম। অর্থাৎ মানুষ যদি আত্মার নিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় সকল ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ খরচ করাই উত্তম কাজ। যেমন সাহাবাদের প্রশংসা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাঁরা (সাহাবারা) নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করে।" হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-র একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যিনি সামান্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সবই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন, তার সদকা হলো সবচেয়ে উত্তম সদকা বা দান।" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একবার তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-র খেদমতে পেশ করেন। তাঁর এই ঘটনাও আমাদের উক্ত মাসআলার প্রতি পথনির্দেশ করেছে।[৩০]

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০–৬১

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা আরো সংক্ষেপ করতে হলে এই বলা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনোপায় অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। 'ইকতেনায' বা সামাজিক অধিকার উপেক্ষা করে ধন-সম্পদ জমা করা এবং 'ইতেকার' বা অবৈধ জীবনোপকরণের মাধ্যমে সম্পদ জমা করা হারাম। তা'ছাড়া ব্যক্তির সম্পদ হবে ব্যষ্টির সম্পদের একটা উপায় বা মাধ্যম। তা কখনো প্রতিবন্ধক হতে পারবে না।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তি যেহেতু ব্যক্তিরই একটা অঙ্গ তাই ব্যক্তিগত জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত পবিত্র কুরআনও বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টির প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; জীবন ব্যবস্থায় তাকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি যাকাত ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধান ছাড়াও 'ইনফাক' বা আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অনেক বড় করে দেখিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিবারবর্গ, মিসকীন ও মুসাফিরদের তাদের অধিকার প্রদান কর।"[৩১]

"ফসল কাটার দিনই তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও।"[৩২]

ইমাম শা'বী বলেছেন, এই হক বা প্রাপ্য বলতে নির্ধারিত (ওশর) ছাড়া বুঝান হয়েছে।

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কি খরচ করব। আপনি তাদের বলে দিন, ধন-সম্পদ থেকে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন-পরিজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য যে পরিমাণ ইচ্ছে, করচ করে এবং তোমরা যা কিছু পুণ্য কাজ কর, আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই সব খবর রাখেন।"[৩৩]

কোন কোন সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথম আয়াতে উল্লেখিত 'আফ্ওয়া' শব্দটির অর্থ করেছেন, 'পুঁজি নয়, মুনাফা বা লভ্যাংশ খরচ করবে'। কিন্তু কোন অবস্থায়ই এই অর্থ সঠিক বলা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহর রাহে খরচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে খরচের পরিমাণ বলার পরিবর্তে কোথায় খরচ করতে হবে তা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াত থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তি যে অর্থ উল্লেখ করেছেন, তা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য নয় এবং জবাব থেকে এই অর্থ বোঝা যায় না। বরং এর সহজ-সরল অর্থ এই যে, প্রশ্নকারী বলছে, আমাদের আল্লাহর রাহে খরচ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু কি পরিমাণ খরচ করবে? উত্তর দেয়া হয়েছে, যদি প্রয়োজনের বেশি থাকে, তবে তা খরচ করার জন্য বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে সে একই প্রশ্নের অবতারণা করে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বার বার খরচের পরিমাণ জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এইমাত্র তোমাদের তা বলা হলো। এখন বরং এই প্রশ্ন করা দরকার যে, কোথায় খরচ করবে। তার উত্তর হলো, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ফকির-মিসকীন প্রমুখের মধ্যে খরচ করবে।

মানুষ তার উপার্জিত সম্পদ বিভিন্নভাবে ব্যয় করে থাকে। উপার্জিত সম্পদ বৈধ পথে ব্যয় করা ইবাদত। বৈধ পথগুলো হচ্ছেঃ

---

৩১. আল-কুরআন, ১৭:২৬
৩২. আল-কুরআন, ৬:১৪১
৩৩. আল-কুরআন, ২:২১৫

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা;

(খ) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষণের নিমিত্তে ব্যয় করা;

(গ) পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা;

(ঘ) ফরয, ওয়াজিব ও নফল পর্যায়ের জন্য ব্যয় করা। যেমনঃ যাকাত, কাফফারা, ফিদিয়া, দেন মোহর, সাদাকাতুল ফিতর, মানত, কুরবাণী, আকীকা এবং নফল দান-দক্ষিণা, ওয়াক্ফ ইত্যাদি;

(ঙ) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা, বিশেষত আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে ব্যয় করা;

(চ) অভাবী-দুস্থদের জন্য ব্যয় করা এবং;

(ছ) এরপরও সম্পদ থাকলে ইনতিকালের পর ইসলামী আইন অনুযায়ী উত্তরাধীকারীদের মাঝে তা ভাগ হবে।

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ইতিবাচক নীতিমালার মধ্যে অল্পেতুষ্টি, সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন অন্যতম। অপরদিকে সম্পদ ব্যয়ের নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে, অপব্যয়, কৃপণতা ও অবৈধ পতে ব্যয়। সুতরাং হালাল পথে সম্পদ উপার্জন যেমন জরুরি তদ্রূপ আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (স.) প্রদর্শিত পথেই তা ব্যয় করাও আবশ্যক।

সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা কুরআন মাজীদে এভাবে বিধৃত হয়েছেঃ "তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না (কার্পণ্য করো না) এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (অপব্যয় করো না) তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৩৪]

বাংলাদেশের সম্পদ-উপার্জন ও ব্যয়ে দুর্নীতি ও ইসলামী বিধিবিধানঃ

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক ব্যাধি হলো দুর্নীতি। পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা হলো দুর্নীতি। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি বিস্তৃত। এমনকি রাষ্ট্রের নিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বাংলাদেশের ব্যাপক দুর্নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক এম. হাফিজ উদ্দীন খান তাঁর দীর্ঘ পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন। এগুলো হল-(ক) আইনের বিধিবিধান না মানা (খ) সরকারী সম্পদের ক্ষতি এবং (গ) চুরি বা আত্মসাৎ। এ তিন ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে দুর্নীতি সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।[৩৫] 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশাল' এর মন্তব্য হল, "বাংলাদেশে দুর্নীতির রেকর্ডের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী যদি হিসেব করা হয়, তাহলে সবচাইতে খারাপ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।"[৩৬]

---

৩৪. আল-কুরআন, ১৭:২৯

৩৫. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৭ আগষ্ট, ১৯৯৯

৩৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালে দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশ এককভাবে শীর্ষে ছিল। ২০০৪ সালে দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশ হাইতির সাথে যৌথভাবে এবং ২০০৫ সালে চাদের সাথে যৌথভাবে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা উন্নতি হয়ে নিম্নক্রমানুসারে তৃতীয় স্থানে পৌছেছে। ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তালিকার উচ্চক্রমানুসারে ১৫৬ অবস্থানে গিয়েছে। অর্থাৎ সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ক্রম উন্নতির দিকে। এ বছরের জরিপে দুর্নীতির ধারণা সূচক বাংলাদেশের ৫টি প্রতিষ্ঠানের ৬টি জরিপের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-(১) বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি এন্ড ইনস্টিটিউশনাল এসেসমেন্ট-২০০৫ (২) ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক সার্ভিস এন্ড কান্ট্রি ফোরকাষ্ট-২০০৬ (৩) মার্চেন্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ পরিচালিত গ্রে এরিয়া ডাইনামিক্স-২০০৬ (৪) ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম পরিচালিত গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস রির্পোট-২০০৫ ও ২০০৬ এবং (৫) ওয়ার্ল্ড মার্কেট রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত রিস্ক রেটিংস-২০০৬।[৩৭] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে দুর্নীতি। পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান দখলের পর এবার তৃতীয় স্থানে গিয়েছে বলে আমাদের আত্মতৃপ্তির তেমন কিছু নেই। কারণ এ জনপদটির এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি প্রবেশ করেনি। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে, যা রীতিমত আশঙ্কাজনক।

বাংলাদেশ অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার ন্যায় দুর্নীতিও সামাজিক অস্থিরতার ফসল। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ চর্চার অভাব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে দুর্নীতি বিস্তারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিতিশীলতাও বহুলাংশে দায়ী। অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিতিশীলতাও বহুলাংশে দায়ী। অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচিতির সুযোগ নিয়ে ব্যাপক হারে দুর্নীতি করা হয়। সদা জাগ্রত দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। যারা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সম্পর্কে সদা সচেতন তারা দুর্নীতি থেকে যেমন নিজেরা বিরত থাকে তেমনি অন্যকেও দুর্নীতি হতে বিরত রাখে। যখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশ ও জাতির স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়, তখনই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাবেই আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, সার প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল মিশিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা হয়। নিজ সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়া দুর্নীতির অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলার পূর্ণ পরিবেশ, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ প্রভৃতি রয়েছে। মোটকথা, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই দুর্নীতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এজন্য আইনের শাসন স্থিতিশীলতা আনয়ন, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতা রোধ, জবাবদিহির ব্যবস্থাকরণ ও দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি হ্রাস করা যায়।

---

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ নভেম্বর, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনজীবনে দুর্নীতির ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবঃ

বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে সুযোগ-সুবিধাকে অবৈধভাবে কাজে লাগানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি রাজনৈতিক দুর্নীতির পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। যার প্রভাব রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ, প্রশাসনিক দায়িত্বপালনে অনীহা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। প্রশাসনিক দুর্নীতি সমাজে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে। স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে সমাজের যোগ্য ব্যক্তিরা স্বীয় স্বার্থ হতে বঞ্চিত হয়। প্রশাসনিক দুর্নীতি মানুষের ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী। কারন দুর্নীতির মাধ্যমে যদি সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তবে দায়িত্বপালনের প্রতি আগ্রহ লোপ পায়। যা পরিণামে প্রতিভা বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি জাতীয় জীবনে বিপর্যয় বয়ে আনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতির মাধ্যমে পরীক্ষা পাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, জাল সনদপত্র প্রভৃতি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থবির করে দিচ্ছে।

দুর্নীতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যথাযথভাবে না হওয়ায় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে আত্মসাৎ করার ফলে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। দুর্নীতি দারিদ্র্য প্রসারের সহায়ক। দুর্নীতির আশ্রয়ার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাবে দারিদ্র্য ও নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া দুর্নীতির প্রভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস না পেয়ে দারিদ্র্য প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। দুর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতির প্রভাবে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারে না। সমাজে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ব্যাপক দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়ে নীরবতা পালনে বাধ্য হয়। সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে। দুর্নীতি চক্রাকারে ক্রিয়াশীল আত্মঘাতী সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয়ে অন্যকে প্রতারিত করে, আবার সেও অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনিও ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। এভাবে চক্রাকারে দুর্নীতি সমাজে প্রসারিত হয়। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যকর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে সমাজের মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শ ও বিধি বিধানঃ

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবন-বিধান হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বির্নিমাণের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চাইতে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা, সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগেই

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথাচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদেরকে সচেতন করে তোলে। এর পরেও কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। দুর্নীতি অনেকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন-ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, খিয়ানত, দ্রব্যে ভেজাল, কালোবাজারী, মওজুদদারী ইত্যাদি। মহানবী (স.) এসব বিষয় থেকে সতর্ক থাকার জন্য মানব জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন।[৩৮] দুর্নীতির অন্ত র্ভুক্ত বিষয়সমূহকে হারাম ঘোষণা করা দুর্নীতি দমনে মহানবী (স.) এর প্রথম পদক্ষেপ। ইসলাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, কর্ম, উপার্জন তথা সকল বিষয়ে শুধু হালাল ও হারামের পথই নির্দেশ করেনি; বরং বৈজ্ঞানিক পন্থায় যুক্তির মাধ্যমে হারামের অপকারিতা এবং হালাল বস্তুর উপকারিতাও বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৯] মহানবী (স.) বলেছেন, "বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদাকা করে, তা কবুল করা হয় না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র।[৪০] "মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচাইতে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে।"[৪১]

এভাবে ইসলাম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদের অপকারিতা এবং স্বীয় কষ্টে উপার্জিত হালাল সম্পদের উপকারিতা বর্ণনা করে মানব জাতিকে দুর্নীতি মুক্ত জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে যেসব পাপ করা হয়, তা অধিকাংশ বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন-কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি প্রদান, পদোন্নতি প্রদান, অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান, স্বজনপ্রীতি, অন্যের সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিককে প্রত্যার্পণ করে।"[৪২] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।"[৪৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা দায়িত্বশীল। তোমারা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪৪]

ইসলাম ধনলিপ্সা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দান করেছে। যেমনঃ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদের জন্য ফিতনা। আর আল্লাহ তা'আলার নিকটে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।[৪৫] মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক

---

৩৮. ইমাম ওয়ালিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৩৯. আল-কুরআন, ২:১৬৮
৪০. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, দার আল-হাদীস, মিশর-১৯৯৫, পৃ. ৪৬০
৪১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৩০৯
৪২. আল-কুরআন, ৪:৫৮
৪৩. মুহাম্মদ মুহাম্মদী আর-রায় শাহবী, মীযানুল হিকমাহ, মাকতাবুল আলম আল-ইসলামী-১৩৪৭ হিজরী, পৃ. ৩৪৫
৪৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, পৃ. ৩৪৫
৪৫. আল-কুরআন, ৮:২৮

Dhaka University Institutional Repository

যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।"[৪৬] তিনি আরও বলেন, "পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর, তাহলে লোকজন তোমাকে ভালবাসবে।"[৪৭]

বর্তমান সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি এত নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তারা নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ-আদালত সবকিছু ফেলে রেখে অর্থকেই সব সময় বড় মনে করছে। সমাজে যার যত বেশি সম্পদ সেই বেশি সম্মানিত, তা যত দুর্নীতির মাধ্যমেই সে অর্জন করুক না কেন। মানুষের মাঝে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে পড়ায় দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এই মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং যারা দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীকে শুধু অর্থবিত্তের কারণে শ্রদ্ধা করে তাদেরকে যুলুমের সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ইসলাম অর্থ-সম্পদ নয়, তাকওয়াকে মানুষের ইজ্জত-সম্মানের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক তাকওয়াবান।"[৪৮] বস্তুত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন- যেমন সতা, ন্যায়পরায়নতা, তাকওয়া, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, দেশাত্ববোধ, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সত্যের উপর দৃঢ়তা ইত্যাদি অধুনা সমাজ সংসারে খুবই বিরল। অথচ ইসলাম দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়াকে বাধ্যবাধকতা করেছে। উল্লেখিত গুণাবলী সমাজপতি থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারের জন্যও আবশ্যক করেছে। উল্লেখিত গুণাবলী সমাজপতি থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারের জন্যও আবশ্যক করেছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "যে লোকের হৃদয়-মন আল্লাহর স্মরণশূন্য আল্লাহর আনুগত্যমূলক ভাবধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার, আর এ কারণে যার কর্মকাণ্ড বাড়াবাড়িপূর্ণ তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না।[৪৯] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে যালিম শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং আসন গ্রহণের দিক দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে।"[৫০]

অপরদিকে ইসলামে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন কাজের প্রধানত্ব-কর্তৃত্ব কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই শোভনীয় যে তার যোগ্যতা রাখে।"[৫১]

---

৪৬. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, খণ্ড-৬, পৃ. ২০

৪৭. আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, সুনান ইবন মাজা, কিতাবুয যুহদ (দারুল-আল ইহইয়া আল-কুতুব আল 'আরাবিয়া, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

৪৮. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

৪৯. আল-কুরআন, ১৮:২৮

৫০. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্-তিরমিযী, জামি' তিরমিযী, আহকাম অধ্যায় (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯৭), পৃ. ৫

৫১. উদ্বৃত: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০), পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পবেতন প্রদান দুর্নীতির প্রতি উৎসাহ বাড়ায়। তাই ইসলাম সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক তথা সকল দায়িত্ব পালনকারীর ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিক নিশ্চিত করেছে। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে। নিজে যা পারবে তাকেও তাই পরতে দিবে এবং তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। কোনভাবে তার উপর আরোপিত বোঝা বেশি হয়ে গেলে নিজেও তাকে সে কাজে সহায়তা করবে।[৫২]

দুর্নীতির শাস্তি বিধানঃ

ইসলাম একদিকে যেমন দুর্নীতি দূরীকরণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এজন্য ইসলাম সকল প্রকার দুর্নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। মিথ্যাচার, ওয়াদা খিলাফ করা, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, সরকারি অর্থ অপচয় বা অপব্যয় করা, প্রশাসনিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যুলুম বা হয়রানি করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি বিষয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা পাপ-দুর্নীতি, সীমালগজ্ঘন ও হারাম ভক্ষণ-ঘুষ গ্রহণে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তারা যা করছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।[৫৩] এছাড়া রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতিপক্ষের দুর্নাম করা, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা, তার দোষ খুঁজে বেড়ানো, গীবত করা, সুবিধা লাভের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকট চোগলখোরী করা ইত্যাদি বিষয়ও দুর্নীতির আওতায় পড়ে। এসকল বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত স্বচ্ছ। যেমন মিথ্যাচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।[৫৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে।"[৫৫] ইসলাম যে কোন ওয়াদা চুক্তি যথাযথভাবে পালন করার প্রতি জোর দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর।"[৫৬] মহানবী (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি-(১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে।"[৫৭]

মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা দখল করার প্রতি ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা জবর দখলকারীর জন্য ইসলামে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং পরকালে তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে-অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না,

---

৫২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৫৫৯০

৫৩. আল-কুরআন, ৫:৬২

৫৪. আল-কুরআন, ৩:৬১

৫৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৫

৫৬. আল-কুরআন, ৫:১

৫৭. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[৫৮] আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন, "যারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের উদরে আগুন ছাড়া আর কিছু খায় না এবং অচিরেই তারা অগ্নিতে পৌছে যাবে।"[৫৯] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।"[৬০] আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন, "পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত ছেদন করে। তা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড।"[৬১]

প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, " আল্লাহ তা'য়ালা যালিমকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ধারবেন তখন তাকে আর অবকাশ দেয়া হবে না।"[৬২] তিনি আরও বলেন, "অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আকে ভয় কর; কেননা ঐ দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৬৩]

অপরদিকে হারাম জিনিস বিক্রয়, ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয়, মজুদদারী, চোরামাল ক্রয়, বাজার স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ, মোনাফাখোরী, ধোঁকাবাজী, ওজনের কম দেওয়া, সুদ খাওয়া, ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম এবং গুনাহ্ পর্যায়ের কাজ। এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করাও হারাম। শূকর, মদ্য, হারাম খাদ্য পানীয়, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি (Statue) প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ্য, মৃতজীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৬৪] আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। "রাসূলুল্লাহ (স.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিনীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৫] পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেয়া কিংবা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেয়া ইসলামী বিধান মতে দুর্নীতির শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[৬৬]

ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলেই দ্রব্যমূল্য আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, বাজারে পণ্য আমদানি ও তার চাহিদা অনুপাতে দ্রব্যমূল্য উত্থান-পতন হতেই থাকে। নবী করীম (স.)-এর যুগে তাই দেখা যায়, যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলো লোকেরা এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। তখন নবী করীম (স.) বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন।

---

৫৮. আল-কুরআন, ৪:১০
৫৯. আল-কুরআন, ৪:২৯
৬০. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল কিসাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩
৬১. আল-কুরআন, ৫:৩৮
৬২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪২৮
৬৩. প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং-৪০০০
৬৪. প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়্যূ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৬৬. আল-কুরআন, ৮৩:১-৩

Dhaka University Institutional Repository

রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ যুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার উপর দাবিদার কেউ থাকবে না।"[৬৭]

নবী করীম (স.) এ হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চাপানো যুলুম এবং সেই যুলুম থেকে মুক্ত ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন।

ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও স্বার্থপরতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে খাদ্যপণ্য ও জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা। এ জন্যই নবী করীম (স.) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে লোক চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও সম্পর্কহীন হয়ে গেলেন তার থেকে।"[৬৮] নবী করীম (স.) আরও বলেছেন, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[৬৯]

ইসলাম ধোঁকা প্রতারণার সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছেন। তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক কোনক্রমেই তা বৈধ নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে সব ব্যাপারেই সততা ও ন্যায়পরাণতা অবলম্বন করা।

নবী করীম (স.) বলেছেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হবে। আর যদি তারা দুজন মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নির্মূল হয়ে যাবে।"[৭০]

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া বা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা গর্হিত কাজ। যেমন ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা অথবা দাম বৃদ্ধি করে দেয়া ইত্যাদি। মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।"[৭১]

পণ্য বিক্রয় পাত্র দ্বারা মাপার সময় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করতে কম দেয়াও ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সূরা আল-আন্'আমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা সুবিচার সহকারে পূর্ণ ভর্তি করে দাও। মানুষের সাধ্য-সামর্থের অধিক আমরা কোন দায়িত্বই তার উপর চাপিয়ে দেই

৬৭. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং-১২৩৫
৬৮. ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হাদীস নং-৪৬৪৮
৬৯. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম (করাচী, আসাহহুল মাতাবি-১৯৩০ খৃ.), হাদীস নং-৩০১৩
৭০. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', পৃ. ৩২৬
৭১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

না।"[৭২] সেখানে আরও বলা হয়েছে, "আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ় সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম।"[৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, "ওজনে যারা কম করে তাদের জন্যে বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরাপুরি গ্রহণ করে। আর যখন মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে।"[৭৪]

ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে-শুনে ক্রয় করা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কেননা তা করা হলে অপহণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।"[৭৫] সুদের পন্থায় 'মুনাফা' লাভ করার সকল পথকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও হারাম করে দিয়েছে। তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি, ইসলামে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সুদী কারবার ছেড়ে দাও যদি তোমরা ঈমানদার হও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। আর তোমরা যুলুম করবে না আর না তোমাদের উপর যুলুম করা হবে।"[৭৬]

এইভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল প্রকার দুর্নীতিকে হারাম ঘোষণা করে তার মূলোচ্ছেদ করেছে।

অবৈধ উপায়ে ও অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ লেনদেনের একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ। প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে। শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্য ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে-অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।"[৭৭]

---

৭২. আল-কুরআন, ৬:১৫২
৭৩. আল-কুরআন, ১৭:৩৫
৭৪. আল-কুরআন, ৮৩:১–৬
৭৫. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, ইসলামে হালাল হারামের বিধান (অনু: মাও মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭), পৃ. ৩৪২
৭৬. আল-কুরআন, ২:২৭৮ – ২৭৯
৭৭. আল-কুরআন, ২:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি হারাম উপায়ে তথা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করে ইবাদাত করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। এমনকি এ অবৈধ সম্পদ দ্বারা কোন ভাল কাজ করলে বা দান-সাদাকা করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। মহানবী (স.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে সাদাকা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎকর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।"[৭৮] প্রকৃতার্থেই দুর্নীতি ও প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন অকল্যাণকর ও অপমানজনক। ইসলাম এহেন গর্হিত কাজ হতে মানব জাতিকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ-অসৎকর্মের মাধ্যমে সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে।"[৭৯]

দুর্নীতি বাংলাদেশের রন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। দুর্নীতির কারণে দেশে অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার প্রসার বাড়ছে। চোরাচালানী ও মজুদদারীর দরুণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ কারণে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সৎ মানুষের কষ্ট করতে হচ্ছে। সুতরাং যে যে ছিদ্র পথে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করতে পারে ও করার সুযোগ পায় তার প্রতিটি পথ বন্ধ করে দিতে ইসলাম আগ্রহী এবং সচেষ্ট। এ কারণেই এ সত্য কারো অস্বীকার করার অবকাশ নেই, মানুষ সমাজের মধ্যে দুর্নীতির সর্বনিম্ন মাত্রার দিক দিয়ে এখনও ইসলামী সমাজ অনন্য ও অতুলনীয়। আর এর কারণ হচ্ছে ইসলাম চতুর্দিক দিয়েই এ লক্ষ্যে অগ্রসর হয় এবং দুর্নীতি নির্মূল বা তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করতে বাস্তব কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা:

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম'। ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের অকুন্ঠ ভালোবাসা-ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও হালাল উপায়ে আয়-উপার্জন করার বিষয়টি মোটেও সহজসাধ্য তো নয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃসাধ্যও বটে। আমাদের মতে এর প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) **ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক মেনিফেস্টো:** বাংলাদেশের প্রায় ৯০% লোক মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারাই যখন ক্ষমতার মসনদে নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়ার জন্য ইসলামের কথা ব্যানার, পোস্টার ও বক্তৃতায় ব্যবহার করলেও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম চর্চাকে জরুরি মনে করেন না। বরং বলা চলে, হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন কোন পর্যায়ে বাধা হিসেবে আবির্ভূত হন। হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ধরনের বাধা।

(২) **প্রচার মাধ্যমসমূহের ভূমিকা:** দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রসারে পরোক্ষ আবার কখনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে হালাল উপার্জনকারীরা অনুপ্রাণিত না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়।

---

৭৮. ইমাম ওয়ালিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল মাসাবীহ, পৃ. ২৪২

৭৯. আল-কুরআন, ১০:২৭

Dhaka University Institutional Repository

(৩) **শিক্ষা ব্যবস্থা:** এদেশে প্রধানত দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, যা পরস্পর বিরোধী। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা হালাল-হারাম বিষয়ের শিক্ষাদান একেবারেই উপেক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে বিষোদগারও করা হয়। এ শিক্ষা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বেশি লাভ করে বিধায় সাধারণ মানুষের মনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার ছাপ থাকলেও ইসলামী অর্থব্যবস্থার উপর সুনির্দিষ্ট উচ্চতর ডিগ্রি তথা অনার্স/এমএ/এম.ফিল/পিএইচ.ডি ডিগ্রি দানের ব্যবস্থা না থাকায় অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারামের ধারণা আশানুরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে না।

(৪) বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক: এ অর্থব্যবস্থা হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা।

(৫) সাধারণ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা এবং তা আমল করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা।

(৬) পরকালীন জীবন সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা এবং দুনিয়ার প্রতি প্রবল আর্কণ।

(৭) ব্যবসায়িক অসাধুতা এবং পরিণতি সম্পর্কে অসচেতনতা।

(৮) "সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির উচ্ছেদ" এই দুই নীতির কোনটাই বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকর হচ্ছে না। ফলে সাধুতা সাধুবাদ না পেয়ে অসাধুতা অনেক ক্ষেত্রে বাহবা পাচ্ছে।

(৯) রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের অভাব।

এক কথায় বলা যায়, পর্যায়ক্রমে দেশে ইসলামী আইন বিশেষত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে উপরে বর্ণিত বাধাসমূহ ধীরে ধীরে দূর হবে এবং হালাল উপার্জনের পথ সুগম হবে।

মোটের উপর বিশ্ব মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ ও মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ অর্থব্যবস্থায় রয়েছে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের সুষ্ঠু নীতিমালা। ইসলামী নীতি দর্শনের আলোকে যদি সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় নিশ্চিত করা যায় তাহলে পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক অর্থব্যবস্থার কোনটাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না। বরং ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার টেকসই ভিত রচিত হবে এবং মানুষের মাঝে জবাবদিহিতার অনুভূতি দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হবে।

"কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর নিকট থেকে এতটুকু করতে পারবে না: (১) জীবনকাল সম্পর্কে; সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে; (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে; (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কীভাবে উপার্জন করেছে; (৪) কীভাবে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেছিল, তদনুযায়ী সে কী কী আমল করেছে।"[৮০] কাজেই সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আমাদের এমন সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে কোন পর্যায়ে হারামের মিশ্রণ না থাকে। তাহলে একদিকে হালাল উপায়ে সম্পদ অর্জন করে বিপুল সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে এবং অপরদিকে হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনের পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে পরকালীন লাঞ্ছনাদায়ক মহাশাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

---

৮০. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. আল কুরআনুল কারীম (অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০১০

২. ইমাম আল-ফাখর আর-রাযী, আত-তাফসীর আল-কাবীর, দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বায়দাভী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, আল-কাহেরা, তা.বি. খণ্ড-১

৪. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, আল-কাহেরাঃ দারুত তাকওয়া, তা.বি., খন্ড-১

৫. আল্লামা ইমামুদ্দীন ঈসমাইল ইবন কাসীর, তাফসীর-ই-ইবন কাসীর, সুহাইল একাডেমী, লাহোর, ১৯৮৪ইং

৬. আল্লামা আবূ বকর জাসসাস, আহকামূল কুরআন (৩য় খন্ড), মিসর-১৩১২ হিজরী,

৭. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড কোয়েটাঃ আল মাকতাবা আল রাশিদিয়া, ১৯৮৫

৮. মুফতী মুহাম্মদ সফী (র.) তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, (অনুঃ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোরআনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা মোনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী

৯. আল্লামা সাবুনি, তাফসীরে আয়াতুল আহকাম, ১ম খণ্ড, দারুল যিকর, বৈরুত, ১৯৯৭

১০. ইবনে জরীর, তাফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০

১১. আবু আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী (সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ৪

১২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, সহীহ বুখারী, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০,

১৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল বুখারী, দারুস সালাম, রিয়াদ, ১৪২১ হিজরী

১৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী (অনুবাদ), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৬

১৫. ইমাম মালিক ইবন আনাস, মুয়াত্তা, কায়রো-১৯৫১

১৬. আবুল হুসাইন ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, আস-সহীহ লিল মুসলিম, করাচীঃ কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৫৬ (২য় সংস্করণ)

১৭. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, অনুবাদঃ আফলাতুল কায়সার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০২

১৮. ইমাম আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়া, কায়রো-১৮৯৫, খ. ৪

১৯. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ মুয়াস্‌সা সাত্তুর (৬ষ্ঠ খন্ড), রিসালাহ, কায়রো-১৪১০

২০. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, দার আল-হাদীস, মিশর-১৯৯৫

২১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনান আত-তিরমিযী, বৈরুত, ১৯৮৭

২২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, জামি'উত তিরমিযী, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, ১৯৯৫, ঈ/১৪১৫ হিজরী

২৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযি, সুনান আত তিরমিযী, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী

২৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্-তিরমিযী, জামি' তিরমিযী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯৭

২৫. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আস্‌সিজিস্তানী, সুনানু আবু দাউদ, বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌হ ১৯৯৪, খ. ২

২৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ, সুনান আবী দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৮ হিজরী

২৭. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, এম বাশীর হাসান এন্ড সন্স, কলকাতা, তা.বি.

২৮. আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াজীদ, সুনানু ইব্‌ন মাজাহ, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩, (১ম সংস্করণ)

২৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনু মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৮ হিজরী

৩০. আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, সুনান ইবন মাজা, দারুল-আল ইহইয়া আল-কুতুব আল 'আরাবিয়া, তাবি, ২য় খণ্ড

৩১. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০

৩২. আলী দারু কুতনী, আস সুনান, দারুল মাআরিফাহ্‌, বৈরুত-১৯৬৬

৩৩. আলা উদ্দিন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড-৭, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত

৩৪. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড-৮, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত

৩৫. মুহাম্মদ আল-বাবরতী, আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, খণ্ড-৫, দারুল ফিকর, কুয়েত

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. সুলায়মান আল-বাজী, আল-মুন্তাকা শরহুল মুয়াত্তা, খণ্ড-৭, দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত
৩৭. আবূর ফযল মুহাম্মদ ইবনু মানযূর, লিসানুন আরব, খণ্ড-১, দারু সাদির, বৈরুত
৩৮. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড ২৪, ওয়াযাতুল আওকাফ ওয়াল শুয়ূন আল-ইসলামিয়া, কুয়েত-১৯৯৫
৩৯. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-সারখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড-৯, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত
৪০. মুহাম্মদ মুহাম্মদী আর-রায় শাহবী, মীযানুল হিকমাহ, মাকতাবুল আলম আল-ইসলামী-১৩৪৭ হিজরী
৪১. আলমানারা (আরবী), প্রথম খন্ড
৪২. ইবন হাযম, আল মুহাল্লা, মুয়াস সাতুর রিসালাহ, কায়রো, ১৪১০ হিজরী
৪৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, দারুল কুরআন ওয়া উলুমিল ইসলাম, লাহোর, ১৯৮৬
৪৪. ইমাম মুহাম্মদ (র.), কিতাব আল-আসাল, দায়েরায়ে মাযারিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য।
৪৫. আবু ওবায়িদ আল-কাসিম, কিতাব আল আমওয়াল অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৯
৪৬. ইমাম আল মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, কায়রো, মিশর-১৯৬৫
৪৭. ইবন মানযূর, লিসানুল আরাব, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৩
৪৮. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও হামিদ সাদিক, মু'জামুলুগাতিল ফুকাহা, করাচী-১৯৭৮
৪৯. আল-হায়সামী, মাজমাউজ জাওয়ায়ীদ, দারুল কুতুব, আল ইলনিয়া, বৈরূত, ১৪০৮ হিজরী, ৪র্থ খণ্ড
৫০. ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৩য় খন্ড, কিতাবুল ওয়াক্ফ আল মাকতাবা আলা মাজিদিয়া, কোয়েটা, ১৩৯৯ হি.
৫১. আল্লামা কাসানী, বাদায়েউস সানীয়ে, ২য় খন্ড, মিসর
৫২. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী, (১ম খন্ড), কিতাবুল হুজ্জাত আলা আহলিল মাদানী, ১৩৮৫ হি. হায়দ্রাবাদ, ভারত
৫৩. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারায (উর্দু), করাচী-১৯৬৫
৫৪. আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাবী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত-১৯৮৫।
৫৫. আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয, আদ-দুররুল মানছুর, দারু ইবনিল আছীর, রিয়াদ-২০০১
৫৬. ইবনে জারীর তাবারী, আত-তাবারী, তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক, বৈরুত ১৯৬৪
৫৭. ইবনে হিশাম, আস-সীরাত আন-নববীয়াহ, ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত-১৯৮৫, খ. ২
৫৮. আবুল হাসান বুরহান উদ্দীন আলী, আল-হিদায়া, কালাম কোম্পানী, করাচী, খন্ড-৩
৫৯. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.) (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ), আল-হিদায়া (১ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৮ইং
৬০. আবুল হুসাইন আহামাদ (অনু. মাওলানা বদিউল আলম), আল-মুখতাছারুল কুদুরী মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯৫ইং
৬১. সম্পাদনা পরিষদ, ফারাইজ বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা, মাসায়েল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫
৬২. বুরহানউদ্দীন আলী ইবন আবুবকর (অনুবাদ আবূ তাহের মিছবাহ), আল হিদায়া, ২য় খন্ড ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০০
৬৩. ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, বাংলা একাডেমী কর্তৃক অনুদিতঃ ১৯৭৭
৬৪. আব্দুল গাফফার হাসান নদভী, এন্তেখাবে হাদীস, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০১
৬৫. হুমায়ন খান অনূদিত, ফারিশতা জ.দ. যায়াস, যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং
৬৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, (মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত), ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-১৯৮৬ইং
৬৭. সায়্যিদ আহামাদ উরুজ কাদেরী, উশর ও যাকাত আউর সুদকে চান্দ মাসায়েল, মারকাযী মাকতাবায়ি ইসলামী, দিল্লী
৬৮. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (অনু. মাও. আব্দুর রহীম), যাকাতের হাকিকত, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৪
৬৯. ইউসুফ আল-কারজাভী (অনু. আব্দুল কাদির), ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২
৭০. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, ইসলামে হালাল হারামের বিধান (অনুঃ মাও মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৭১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, অনুঃ কারামত আলী নিজামী, ঢাকাঃ শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৯৪

৭২. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামর অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫

৭৩. সংকলন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

৭৪. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০

৭৫. মাওলানা আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১

৭৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০

৭৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০

৭৮. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

৭৯. আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০

৮০. সৈয়দ শওকতউজ্জামান, সমাজ কল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রুহেল পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০৪

৮১. আব্দুস সামাদ, আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুঁথিঘর, ঢাকা-১৯৮৬

৮২. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯০

৮৩. সম্পাদাস, সমাজকর্মঃ প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫

৮৪. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৮৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৪০৯/১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড

৮৬. সম্পাদনা পরিষদ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭

৮৭. ড. হাসান জামান, ইসলামে অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশ, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৭

৮৮. মোঃ নুরুল ইসলাম, ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বণ্টন, আহসান পাবলিকেশন্স ঢাকা-২০০৭

৮৯. নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত), দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-২০০৫

৯০. মাওলানা মুনতাছির আহমাদ রহমানী, যাকাত দর্পণ, ঢাকা-১৯৯৮

৯১. মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, যাকাত কী ও কেন? ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৯৫

৯২. শাহ্ আব্দুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১ইং

৯৩. হিফজুর রহমান (অনুবাদ আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ ঢাকা, ১৯৯৮

৯৪. গাজী শাছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকাঃ ল'বুক হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৭

৯৫. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, ঢাকাঃ অবণি প্রকাশনী, ১৯৯১

৯৬. অধ্যাপক লতিফুর রহমান, কারবার সংগঠন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৭, খন্ড-১

৯৭. কবির আহমদ মজুমদার, ইসলামী শ্রমনীতি কি? মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮

৯৮. এম. এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতিঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, ঢাকা-২০০২

৯৯. ডা. হাসান জামান, "ধন সম্পদ জাতীয়করণ ও ইসলাম", ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুনঃ ১৯৬৯

১০০. মোঃ আবু তাহের, ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং, তামান্না পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৬

১০১. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৩

১০২. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, লিজেন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৯

১০৩. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, 'ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণা' মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট-১৯৮৮

১০৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫

১০৬. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইসলাম কা নিযাম, নওল কিশোর, লক্ষ্ণৌ

১০৭. মুহম্মদ আবদুর রহীম, "ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ", ঢাকা-২০০৪

১০৮. ফজলুল করিম, আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৪৭

১০৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার, 'ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা', ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

১১০. মুহাম্মদ আকরাম খান (সংকলন), নুর হোসেন মজিদী, রাসূলুল্লাহ (স.) এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৯

১১১. আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, অনুবাদঃ মুসলিম চৌধুরী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬

১১২. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকাঃ ১৯৪৩

১১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৮৫

১১৪. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

১১৫. আবুল হাশিম, 'ইসলামী সংস্কৃতি', ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট-১৯৬৭

১১৬. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুঠির, বগুড়া ও ঢাকা-১৯৮৬

১১৭. মুহাম্মদ লুৎফর, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪

১১৮. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৬

১১৯. মুহাম্মদ ফজলে ইলাহী (অনু.), সহজ ভাষায় ইসলামের মূলকথা, আঞ্জুমানে হিদায়াতুল উম্মত, ঢাকাঃ ১৯৯৩

১২০. খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭

১২১. মাওঃ মনজুর নোমানী, তাসাউফ কাকে বলে? ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৯

১২২. মিয়া মোহাম্মদ সেলিম, বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, নবেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-২০০৫

১২৩. তফাজ্জল হুসাইন, হযরত মুহাম্মদ (স.), সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ঢাকা-১৯৯৮

১২৪. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ঢাকা-২০০৩

১২৫. ড. মুহাম্মদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ঢাকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা

১২৬. মহিউদ্দীন খান, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০১

১২৭. প্রফেসর মু. মনজুর আলী খান ও অন্যান্য, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকাঃ হাসান বুক হাসান-২০০১ইং

১২৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, জুয়া ও নৈতিকতা, বিআইসি, ঢাকা-২০০১

১২৯. মওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া, জুয়া ও সুদ প্রসঙ্গে আল-কুরআনঃ বিধান ও বাস্তবতা, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৮

১৩০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৭

১৩১. প্রথম আলো ১১, ১৪, ১৭, ২৯, নভেম্বর ২০০৯; ৪, ১২, ১৫, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯

১৩২. প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

১৩৩. প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১২

১৩৪. প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৩

১৩৫. সমকাল ১৪, ১৬, ১৯, ২৩ নভেম্বর ২০০৯; ১, ২২, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯

১৩৬. যুগান্তর ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

১৩৭. সংবাদ ৯ জানুয়ারি ২০১০

১৩৮. সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১

১৩৯. নয়া দিগন্ত ২, ৭, ৫, ৯, ১৬, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯, ২১, ২৭, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯

১৪০. সাপ্তাহিক ২০০০, ১৫ মার্চ ২০০৯, ৩০ মার্চ ২০০৯

১৪১. ইসলামিক ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২০০৪

১৪২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড

১৪৩. William P. Scott. Dictionary of Sociology, NASWA New York, 1977

১৪৪. S. Mahmudunnasir, Islam: Its concepts and History, New Delhi, 1981,

১৪৫. S.Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, Mullick Brother, Dacca, 1963

১৪৬. Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, New Delhi & Other: 1947

১৪৭. W.Pearson, Family-Socialization and Interaction Process, London, 1965

১৪৮. Morris Ginsberg: Sociology, London: Oxford University Press, 1987

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯. R.M. Maclver and C.H.Page: Premitive Society, London 1967
১৫০. F.H. Giddings: Principles of Sociology, 3rd end.
১৫১. P. Gisbert: Fundamentals of Sociology,
১৫২. H.R. Gibb, Whither Islam, London, 1939
১৫৩. Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987,
১৫৪. Edited by James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, , XII,
১৫৫. H.A.R. Gibb, Wheither Islam, London-1973
১৫৬. J.M. Keyenss, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936
১৫৭. Adam Smith, An Enquiary into the Nature and causes of wealth of Nations, London, 1890
১৫৮. Professor L. Robbins, The Nature and significance of Economics science, 2nd Edition-1935
১৫৯. S.M. Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Wenter, 1984,
১৬০. M. Umer Chapra, What is Islamic Economics, Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, Jeddha, 1996
১৬১. M. Nejahullah Siddiqui, "History of Islamic Economics Thought" Lectures on Islamic Economics IRT/IDB, Jeddah, 1992
১৬২. M.A. Mannan, Islamic Economics: Theory and practice, The Islamic Academy, Cambridge, 1936
১৬৩. Khurshid Ahmed, Nature and significance of Islamic Economics, Jeddha, IDB, 1992
১৬৪. S.A. Siddiqui, Public Fincance in Islam, 1962
১৬৫. M.R. Kanwar, Lecture on Economic Development and planning New Academic Publishing Company, Jullandhar, 1993
১৬৬. Alfred Marshal, Principles of Economics, London, 1890
১৬৭. M.A. Sabjwari, Economic and Fis. During the life Mohammad (Sm.), The journal of Islamic Banking and October-December, 1984
১৬৮. Nasir Jamal, The Islamic law and personal law, London, 1986.
১৬৯. Dr. Ziauddin Ahmed, Islam, Proverty and income distribution, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1991
১৭০. S.A. Hasan, The Waqfs Ordinance, Bangladesh Law Book Company: Dhaka, 1962, 1999
১৭১. Thomas patrick Highes, A Dictionary of Islam, Lahore: Premier Book House, 1964
১৭২. Mannual for General Banking Operations, Islami Bank Bangladesh Ltd
১৭৩. Mannual for Investment under Bai-Murabaha Mode, Islamic Bank Bangladesh Ltd
১৭৪. Training Materials for the Bankers, Al-Arafah Islami Bank Ltd., 3rd Edition 1999, Book-3
১৭৫. Abdul Awwal Sarkar, Islamic Banking in Bangladesh: Achievements and Challenges, Jornal of Islamic Economics and Finance, Vol-1, No.1. July-December 2005, IBTRA, Dhaka
১৭৬. Janab Syed Abdullah Mohammad Saleh, "IBBL Investment Policy & Five years Perspective Plan," IBBL Investment wing, H.O., Dhaka
১৭৭. 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh